প্রকাশক ঃ
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
তারা প্রেস
কলিকাতা

দাম ঃ ১৬ টাকা

উৎসর্গ

অমরনাথ দে

কল্যাণভাজনীয়েষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

অনুসন্ধান	ঊষা দিশাহারা
নয়াবসত	অচেনা মুখ
মেঘে ঢাকা তারা	টেনিয়া
অভয়ারণ্য	রূপবদল
বন্যা এলো	অচিন পাখীর সুর
নশীপুরের নকীব	জীবন কাহিনী
মায়া দিগন্ত	মুক্তিস্নান
রতন মণি রিয়াং	মণি বেগম
তিল থেকে তাল	গৌড়জন বধূ
নিঃসঙ্গ যৌবন	হ্যাপি ভ্যালি ফার্ম

ছোটদের

কম্পা দি গ্রেট	কোঁৎকা খেল হোৎকাদা
পটলার গঙ্গা দর্শন	বনে গেলেন গবুদা
সোনা পাহাড়ের দৈত্য	ইত্যাদি !

দিন অবসান

বাতাসে মিশেছে হাস্নুহানার মিষ্টি গন্ধ, গন্ধটা বুক ভরে নিতে বেশ ভালো লাগে, হাল্কা নেশা নেশা ভাব আনে রাধার মনে। চাঁদের আলোয় গাছগাছালিগুলো ঘুম ঘুম ভাব মাখানো।

তখনও রাসমঞ্চে কীর্তনের সুর উঠছে।

রাধারানী বাবার ওই সুরেলা গলাটা চেনে, ওই সুরের সঙ্গে মিশে আছে তার ছেলেবেলার অনেক ভালো লাগা স্বপ্ন। ভজন দাস এ অঞ্চলের নামকরা কীর্তনীয়া। চাকটার বিখ্যাত মূলগায়েন অবধৌতি বাঁড়ুয্যের নাম করা ছাত্র।

ওর সুরেলা গলার তানকর্তব, অন্তরের কাব্যরসভরা আখর যোজনার শক্তি দেখে বাঁড়ুয্যে মশাই বলতেন,—মন দিয়ে সাধনা কর ভজন, মহাপ্রভুর কৃপায় তোর হবে রে।

…রাধারানী শুনেছে বাবা প্রায় ওই বাঁড়ুয্যে মশায়ের নাম করেন আজও।

পাওব আন জনমে ঃ—

ষোলকুশী লয়ে তালে ওই মহাজনী পদাবলী যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ভজন কীর্তনীয়ার গলায়।

—এ্যাই! কার ডাকে চমকে ওঠে রাধা।

তুমি! আবছা আলো আঁধারিতে রূপেনকে দেখে চাইল। শিউলি ফুলগুলো এবার যেন আগেই ফুটেছে, ভিজে বাতাসে তার সুবাস ওঠে।

রূপেন শুধোয়—আসরে না গিয়ে এখানে কি করছো?

রাধা বলে ওঠে—কেষ্ট ঠাকুরের সন্ধানে দাঁড়িয়ে নাই গ। ঘুম আসছিল—ঘরে যাচ্ছিলাম।

রূপেন শোনায়—সে বরাত কি আমার হবে কোনদিন।

রাধা হাসে, মিষ্টি হাসির ঝিকিমিকি ওর চোখে।

রূপেন বলে, ওই কীর্তন শোননি?

রূপলালসে তনু ত্যাজব
পাওব আন্ জনমে॥

রূপেনের গলাও মিষ্টি। অবশ্য পেশায় সে মাষ্টার। এ গ্রামেরই ছেলে—এই রূপগঞ্জের মাটিতে যেন সুর রয়ে গেছে, এর সবুজে আছে স্নিগ্ধতা।

…রূপেনের গানে রাধা ওর দিকে চাইল। এ যেন তার মনের অতলের দুর্বার একটি স্বপ্ন। তার মনজুড়ে রয়েছে ব্যাকুল একটি কামনা। এ জন্মে তা সম্ভব হবে কিনা জানেনা রাধা; তবু ওই মানুষটির জন্য যেন জন্ম-জন্মান্তরও প্রতীক্ষা করে থাকবে সে।

রূপেনের বাবা ভবতোষবাবু এককালে সরকারী চাকরী করতেন, এখন রিটায়ার করে গ্রামের বাড়িতেই থাকেন আর সখ বলতে চাষ-বাস! নিজেই তদারক করে রকমারী ফল-ফুল সবজীর চাষ করান। তাঁর বাগানের আমও বিখ্যাত।

গ্রামের পঞ্চজন তাকে মানে, গণে, আর রূপেনও এম. এ. পাশ করে গ্রামের স্কুলেই রয়েছে। ভবতোষবাবু এতে মনে মনে খুশী। তবু তাঁর অবর্তমানে তাঁর বাড়িঘর জমিজায়গা এই বাগান পুকুর সবই বজায় থাকবে।

রূপেন রাতের আলো আঁধারিতে দেখছে রাধারাণীকে। অতীতের সেই ছোট কিশোরী এখন রূপে রসে পরিপূর্ণা, ওর সারা দেহে বর্ষার অজয়ের প্লাবন নেমেছে।

রাধারাণী বলে—যাই!

রূপেনও দেখছে ওকে। রাধারাণী চলে গেল।

…ঝুলনের উৎসব রূপগঞ্জে বহুকালের, পুরোনো দিন থেকেই চলে আসছে। রূপেন অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এসব লোকাচার পাল-পার্বনের ইতিহাসকে খুজতে চেয়েছে।

…অজয়তীরের এই রাঙ্গামাটিতে বহু যুগযুগান্তের ঐতিহ্য নীরব স্রোতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে আদিকাল থেকে। সেই প্রবাহে মিশেছে শাক্ত-বৈষ্ণব-বাউল-সহজিয়া-মরমীয়ার সাধন সুর, মর্মকথা।

…তাই হয়তো এখানের মাটি উর্বরা ফলপ্রসূ।

রূপেন গানের আসরের দিকে চলেছে। ওপাশে খড়ো বাড়ির সারি। দোতলা মাটকোঠা। এ যেন অতীতের সংস্কৃতির মত বিশিষ্ট একটি রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে দেখা যায় অজয়ের বন্যাবিরোধী বাঁধ। বর্ষার জলে তার বুকে গজিয়েছে সবুজ ঘন ঘাসের আস্তরণ, তার নীচেই ধানের জমি। এবার বর্ষার অভাব নেই—ফলে ধান ক্ষেতে এসেছে সবুজ পূর্ণতা। চাঁদের আলোয় দিগন্তপ্রসারী সবুজ গালিচায় বাতাসের সুর জাগে।

…অজয়ে তখনও গেরুয়া স্রোত বয়ে চলেছে।

কদমখণ্ডীর ঘাটের নীচে জলস্রোত এসে ঠেকেছে—শীতের অজয় পড়ে থাকে রূপালী বালুচরের নিঃস্বতা নিয়ে, ওদিকে ইছাই ঘোষের গড়ের শালবন সীমায় দেখা যায় শ্যামারূপার গড়ের মন্দির চূড়া। অতীতে ওখানে ছিল সমৃদ্ধি, সামন্ত রাজাদের রাজধানী। আজ জনমানবহীন অরণ্যে সেই মন্দির স্তব্ধতার গহনে হারিয়ে গেছে।

…এপারে জয়দেব-এর সিদ্ধপীঠ।

…আজও এখানের মাটিতে তাই কৃষ্ণপ্রেমের আরাধনা। পূর্ণতার প্রশান্তি।

ধীরাও এসেছিল উৎসবে। বাড়ি ফিরতে হবে তাকে। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা একা রয়েছে। কেশব মিত্তিররাও এককালে ছিল এই দিগরের জমিদার। জমিদারী চলে যাবার পর থেকেই কেশব মিত্তিরের সেই বোল

বোলাও ফুরিয়ে গেছে। রাজ্যের দেনাগুলো চেপে বসেছে। আর অনেক জমি জারাত মায় গহনা অবধি গিয়ে ঢুকেছে শ্রীধর দাস-এর খপ্পরে।

ধীরাও জানে বাবার সেই অবস্থার কথা। আজ মিত্তির বাড়ির বড় ছেলেকে তাই দুর্গাপুরের কারখানায় চাকরী করতে যেতে হয়েছে। ধীরা বাবাকে আগলে ওই জীর্ণ ধ্বংসপুরীতে পড়ে আছে।

শান্ত সুন্দর সংষত চেহারা। এককালের বনেদীআনার কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও মুছে যায় নি ধীরার মুখ থেকে।

মন্দির থেকে বের হয়েছে ধীরা।

তাদের বাড়িটা এখান থেকে একটু দূরে। মেঘগুলো ভেসে ভেসে চাঁদের আলোভরা আকাশে হারিয়ে যায়। আবার কোনটা এসে চাঁদটুকুকে ঢেকে ফেলে আলো-আঁধারির খেলা শুরু করে।

…ধীরা চলেছে হঠাৎ রূপেনকে দেখে চাইল।

তরুণ-বলিষ্ঠ একটি যুবক। বলে রূপেন—বাড়ি চল্লে!

ধীরা জানেনা এমনি একটি নিভৃত মুহূর্তেরই স্বপ্ন সে দেখছিল। সামনে রূপেনকে দেখে তার মনে অমনি আকাশের আলোছায়ার খেলার রেশ জাগে। কেন জানেনা ধীরা—এখানে আরও দু'একজনকে দেখেছে। দ্বিজেন ঘোষকেও চেনে।

ধীরার মনে চোখে আজ পুরুষের সম্বন্ধে একটা আগ্রহ জাগে, এই বয়সটাতে ওটা স্বাভাবিক। দেখেছে দ্বিজেনও কারণ অকারণে তাদের বাড়ি যায়। তার বাবার সঙ্গে এখানের ইতিহাস গড়জঙ্গলের কাহিনী এসব নিয়ে আলাচনা করে, কিন্তু চোখ থাকে ধীরার দিকেই।

ধীরাও সেদিন বলেছিল—আলোচনা করবে মন দিয়ে করো। কি সব লিখবে বলছিলে, তবে মন অন্যদিকে থাকে কেন? চোখও দেখি অন্যদিকে।

দ্বিজেন যেন ধরা পড়ে গেছে ওই মেয়েটির কাছে। বিব্রত হয়ে বলে—কই না তো!

ধীরা দেখেছে ওর ভীরুতাকে। সাহস করে সেই ভালোলাগার কথাটা জানাতেও পারে না। ধীরা এই আসল কথাটাই জানতে চেয়েছিল।

ওই দ্বিজেন-এর তুলনায় রূপেন আরও ঋজু! দ্বিজেনের মত চাপা স্বভাবের নয়। আরও স্পষ্ট ঋজু! হয়তো কঠিন!

ধীরার তাই যেন ভালো লাগে রূপেনকেই। সদ্য এম. এ. পাশ করে এসেছে, গ্রামের স্কুলেই রয়েছে। আর ব্যস্ত থাকে নানা কাজে।

ধীরা রূপেনকে দেখে এগিয়ে যায় ওর দিকে। রূপেন বলে—সহরে গেছলাম কয়েকজনের পাম্পসেট কেনার ব্যাপারে! ফিরতে দেরী হয়ে গেল!

ধীরা বলে—তাই কাকীমা বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতেই তুমি ব্যস্ত!

হাসে রূপেন।

ধীরা বলে—একটু এগিয়ে দেবে? একা একা ফিরতে ভয় লাগে!

—তবে বের হয়েছিলে কার ভরসায়? রূপেন শুধোয়।

হাসছে ধীরা। ওর নিটোল দেহে যেন বর্ষার অজয়ের ঢল নেমেছে। দুচোখের চাহনিতে মত্ত অজয়ের ঘূর্ণি।

ধীরা বলে—তোমাকে দেখে বের হয়ে এলাম! চলো—যাবে তো? রূপেন মেয়েটার দিকে চাইল! মাঝে মাঝে ওই সহজ অনেকদেখা মেয়েরাও কেমন রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। মনে হয় ওরা অচেনা-ওই হাসি-কথা-চাহনি সব বিচিত্র, অর্থবহ!

হাল্কা স্বরে ধীরা বলে—এত রাতে সঙ্গে যেতে ভরসা হয়না নাকি? তাহলে বলো, একাই যাবো!

রূপেন সেই কথাটা ভাবেনি। বলে ওঠে সে—না, না। চলো।

চাষবাস এর পালা চুকে গেছে। গ্রামের এদিক ওদিকের মাঠগুলোয় সবুজ ধান-এর বিস্তার, চাঁদের আলো বৃষ্টিধোয়া ঘনসবুজ ধানখেত-গ্রামের গাছগাছালিতে ছড়িয়ে পড়ে কি স্বপ্নের মত। রূপেন আর

ধীরা চলেছে।

ধীরা বলে ওঠে—খুব বিপদে ফেলেছি, না?

মাঠ ছেড়ে রূপেন সামনে অজয়ের বাঁধে উঠতে উঠতে বলে—কেন?

হাসছে ধীরা—কেউ যদি দেখতে পায় কি ভাববে বলো তো?

রূপেনের ওসব ব্যাপারে ভাবনা তত নেই। তার বাবা মা অনেক উদার প্রকৃতির মানুষ। রূপেনও দিনরাত পড়াশোনা নাহয় কাজ নিয়েই ব্যস্ত। মনের নিভৃতে কোথায় একটা ক্ষীণ সুরকে সেআমলই দিতে চায় না। রূপেন বলে—ভাবনাটা দেখি তোমারই বেশী।

···সামনে নদীর বাঁধের এদিকে একটু সমতলে কয়েকটা গাছগাছালি ঘেরা আশ্রম মত। ভজন দাসের আস্তানা। মন্দিরের খানিকটা দেখা যায়। আশ্রম এখন জনহীন—সবাই ওরা কীর্ত্তনের আসরে। নিঝুম পথটার ওদিকে কয়েকটা টগর-রক্তকরবী গাছের জটলা, পাশের অশ্বত্থগাছের ছায়াঘন পরিবেশে একটা চালামত। সেখানে একতারার সুর ওঠে! রূপেন বলে—কানাই বাউলের গলা না? চল একটু দেখে আসি। বোধহয় এসেছে—আবার কবে কেটে পড়বে কে জানে?

ধীরাও এগিয়ে যায় ওর সঙ্গে ওই চালার দিকে।

ওদের দেখে গান থামিয়ে কানাই বলে--অয় বাপ্! রূপ্‌দা—দিদি যি গ! তা কেত্তনের আসরে চলেছো বুঝি?

ধীরা বলে—ওখান থেকে আসছি! কবে এলে?

কানাই হাসে, জানায়--আজ বিয়েন বেলায় এলম। তা ভাবছি কালই চলে যাবো, তবু একরাত কাটিয়ে গেলাম।

রূপেন দেখছে মানুষটিকে। কিসের আনন্দে তৃপ্তিতে ও ভরপুর। কোন বাঁধন নেই! রূপেন বলে—তুমি যাবে না মন্দিরে?

হাসে কানাই—এইতো ভালো গ! হবে ভজন গায় ভালো। ভাব আছে। ওইতো আসল গ! সব কাজেই ওটি চাই! ওরই

সন্ধানে পথেপথেই ঘুরলাম! কেউ ঘরে বসে পায় কেউ—পথেপথে হাহাকার নিয়েই ঘোরে আর ঘোরে।

রিন রিন সুর তোলে একতারায়—

তারি লাগি দেশ বিদেশে

বেড়াই ঘুরে।

আমার মনের মানুষ যে রে!

…তন্ময় হয়ে যায় সেই সুরে। দিগন্তপ্রসারী অজয়ের রূপালী বালুচরের মাঝে গেরুয়া স্রোত চাঁদের আলোয় রূপালী হয়ে ওঠে। গ্রামসীমা—শালবন—সবুজ ধানখেত সব মিলে এক ঘুম-ঢাকা স্বপ্ন রাজ্যের বিস্তারে হারিয়ে গেছে তারা।

—চলি গো! রূপেন ধীরা এগিয়ে চলে।

মাথা নাড়ে কানাই। সুরের রাজ্যে তন্ময় হয়ে গেছে সে।

ধীরা বলে—কি ভাবলো ও বলোতো এমনি নিঝঝুম রাতে আমাদের দেখে?

রূপেন জানায়—এসব ভাবার কোন দরকার বা সংস্কার ওর নেই ধীরা। কানাইদা অন্য জগতের মানুষ।

ধীরার তাই মনে হয়।

এরা অনেকেই যেন অন্য পথের মানুষ। একজায়গায় ওরা নিজেদের আদর্শের কাছে স্থির। ধীরা দেখছে রূপেনকে।

রূপেন বলে—চাঁদের শোভা দেখেছো?

আকাশে চাঁদ-এর চারিপাশে একটা বলয় দেখা যায়। রূপেন বলে—বর্ষা হতে পারে, এসময় বেশী বর্ষা হলেই বিপদ। চারিদিকের বন্দীজল ধানমাঠ ডুবিয়ে দেবে!

হাসে ধীরা—তোমার ভাবনা দেখছি বেশী। ওসব ওই শ্রীধর দাসজী মাধববাবুদের ভাবতে দাও। এ্যাই, স্কুলের কথাটা মনে আছে তো? যা ভুলো মানুষ তুমি! চাকরীটার সত্যি দরকার!

রূপেন চায় ওরই দিকে। ধীরা যেন নিজের দৈন্যের কথাটা ওকে নিঃসঙ্কোচে জানাতেও দ্বিধা করেনা। রূপেন বলে—মনে আছে!

ধীরা বাড়ির কাছে এসে গেছে। রূপেন বলে—আজ চলি!

—কাল দেখা হবে তো? ধীরা কি আগ্রহ নিয়ে কথাটা জানতে চায়। রূপেন মাথা নাড়ে। মন্দিরে আসতে হবে একবার। তাই পা বাড়ালো।

ব্রজদুলালবাবু শ্যামসুন্দরের সেবাইত। অবশ্য এখন সেবাইত নাহলে ওরাই ছিলেন ইলামবাজার-গৌরবাজার এই দিগরের নামকরা জমিদার। ব্রজদুলাল ঠাকুরের পিতৃপুরুষ ছিলেন সেদিনের বিখ্যাত ব্যক্তি, শ্রীচৈতন্যদেবের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন তাঁরা।

পরবর্তীকালে এই ঠাকুর বংশে অনেক ভক্তের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা ঈশ্বরের কৃপা আর লক্ষ্মীর কৃপাও লাভ করেছিলেন। এ দিগরের সংগতিপন্ন ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন বিস্তৃত এলাকার পত্তনী নিয়ে।

আজ দিনবদলের পালায় এদের বংশধারারও রূপান্তর ঘটেছে। শরিকান সম্পত্তি, জমিদারী চলে যাবার পর এদের ছেলেরা অনেকেই লেখাপড়া শিখেছেন, কলকাতা-দুর্গাপুরে চাকরী নিয়েছেন। ন'তরফের ছেলে মাধববাবুর এখন রমরমা, কোন কোলিয়ারী, রাস্তার ঠিকেদারী করেন। ঠাকুর বংশের ওই মাধববাবু এখন যেন সেই রমরমাকে টিকিয়ে রেখেছেন। বাসরুট-কনট্রাকটারি ব্যবসা করে এখন সে যেন ফুলে উঠেছে। পুরোনো চৌহদ্দি ছেড়ে মাধববাবু এখন নোতুন বাড়ি তুলেছে।

অনেক মুখরোচক খবরই শোনা যায় তাঁর সম্বন্ধে। অবশ্য তাঁর সামনে কিছু বলার সাহস ওদের নেই।

ব্রজদুলাল কর্তা বলেন।

—বংশের কুলাঙ্গার ও। ঠাকুর বংশের অসুর ওই মাধব।

মাধববাবু বলে—জ্যেঠাবাবুর ওসব হিংসে। তার ছেলেদের মুরোদ

জানা আছে। দুর্গাপুরে এল-ডি, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, তাই এত জ্বালা, আর ছোট পুত্র তো মূর্তিমান বাঁদর—

ব্রজদুলালবাবুর অবশ্য মনের অতলে একটা ব্যর্থতার জ্বালা রয়ে গেছে, তবু লোকটা অনেক ভদ্র সজ্জন। সেই জ্বালার বহিঃপ্রকাশ নেই। সহজভাবেই সব কিছুকে মেনে নিয়ে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করেন।

ব্রজদুলালবাবুদের নাটমন্দিরে কীর্তনের আসর বসেছে। ঝুলন-রাস-দোল উৎসব এখনও হয়। দেবোত্তোর কিছু জমি কোন রকমে রয়ে গেছে। বাকী জমিদারীর টানে সব চলে গেছে। তাই আড়ম্বর আর নেই, তবু ব্রজবাবুর আন্তরিকতা আছে।

পূর্বপুরুষদের আমলের দেবমন্দির। উঁচু, ধাপেধাপে উঠে গেছে সিঁড়িগুলো—বড় বড় থাম-এ পঙ্খের কাজকরা, ঝাড়লণ্ঠন দু'একটা এখনও রয়ে গেছে। নাটমন্দিরে-চত্বরে জমেছে রূপগঞ্জের আশপাশের গ্রামের বহু মানুষজন।

ব্রজদুলালবাবু ওদের আপ্যায়ন করছেন ফাঁকে ফাঁকে। ঝুলনে ঝুলছে মন্দিরের শ্যামসুন্দর। ফুলসাজে সাজানো।

ব্রজদুলালবাবু দেখছেন গ্রামের কে কে এসেছেন। ওদিকে ভবতোষবাবু, খগেনবাবু রয়েছেন। খগেনবাবু অবশ্য ইংরেজ আমলের লোক—এখনও হাতে দুদিনের বাসি ষ্টেটসম্যান কাগজ নিয়ে ঘোরেন। বাজারে সাতকড়ি দত্তের কাপড়ের দোকানে ওদের আড্ডা বসে। খগেন বাবু, ভবতোষবাবু রবি ডাক্তার আরও দু' একজন থাকে। খগেনবাবু বলেন—ওসব আজকের বাংলা খবরের কাগজে কি জার্মালিজম-এর কিছু থাকে? কেবল কেচ্ছা আর রাজনীতির দলাদলির খবর। ও জার্ণালিজম যাকে বলে তা পাবে ষ্টেটসম্যান-এ।

ভবতোষবাবু বলেন—সাহেবরা আর ষ্টেটস্‌ম্যান-এ নেই হে খগেন! এখন বাঙ্গালীর ছেলেরাই ওসব লেখে-টেখে!

খগেনবাবু তবু দমবার পাত্র নন। তিনি বলেন—তবু ইংলিশ ইজ ইংলিশ হে। ও জাতের সম্পদ ভাষা—তার মেজাজ আলাদা।

…ওই পঞ্চপাণ্ডবের দলও এসেছেন আসরে। ভজন তার ডাইনের দোয়ার নিশিকান্তকে নিয়ে তখন কীর্তন জমিয়ে তুলেছে। তার সুরেলা গলার তানকর্তব আর আখর যোজনায় শ্রীরাধিকার বিপ্রলব্ধা রূপবর্ণন যেন রূপময় হয়ে ওঠে।

ব্যাং বাজাচ্ছে খোল। ডাইনের খোল বাজায় সে। বঙ্কিম-এর ডাকনাম কবে ব্যাং হয়েছিল জানে না কেউ, তবে অনেকে বলে বঙ্কিম নধর চেহারা নিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে খোল বাজায়, তখন দেখতে কোলাব্যাং-এর মত লাগে। তাই ওই নামটাই বহাল হয়ে গেছে।

তবে খোলের হাত ভালো, সুরেলা আর লয়কারী।

সোমে তেহাই দিয়ে আবার ষোলকুশী পড়ন ধরেছে, তানফেরতায় তার খোলের বোল স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আসরে ওঠে সাধু সাধু রব।

…ব্রজদুলালবাবু কাকে বলেন—প্রসাদ না পেয়ে যেও না হে।

এ তাদের দীর্ঘ দিনের কৌলিক। অতিথি অভ্যাগতদের উৎসবে প্রসাদ বিতরণ করতে হয়।

…চাতালে কিছু লোকজন প্রসাদ পাচ্ছে। বাইরে আবছা চাঁদের আলোয় দেখা যায় কয়েকজন বসে আছে। ওদের হাতে জ্বলন্ত বিড়ি-সিগ্রেট। আগুনের আভা দেখে রূপেন দাঁড়ালো। ইদানীং কিছু ছেলেপুলে আড়ালে আবডালে বিড়ি সিগ্রেট টানে। শিক্ষক রূপেন এ সম্বন্ধে সচেতন। একটু সরে থাকতে চেষ্টা করে। মুখোমুখি হলে উভয় পক্ষই লজ্জায় পড়তে পারে, তাই এই সতর্কতা।

এগিয়ে আসে রামলাল। এ বাড়ির ছোট ছেলে, বলিষ্ঠ চেহারা মুখে চোখে কাঠিন্য। লেখাপড়াও শেখেনি তেমন। ক'বছর স্কুলে গড়িয়ে স্কুলফাইন্যালের গণ্ডী পার হতে না পেরে এখন গ্রামেই রয়েছে। কিছু দলবল নিয়ে মেলায় ভলেনটিয়ারী করে, গ্রাম উন্নয়ন সভা গড়ে হৈ-চৈ করে, আর জমিদারী দেবোত্তোর এষ্টেটের ভগ্নাবশেষ-এর তদারক করে।

ওর দলবলরাও আজকাল নাকি অন্ধকারের কিছু ব্যবসা ধরেছে।

পাতুও রামলালের সহচর। রূপেনকে দেখে পাতু সরে গেল।

ওর চলনটা একটু টলমল গোছের। রূপেন দেখেও দেখল না। রূপেন শুধোয়—উৎসব কেমন চলছে রামু?

রামলাল বলে ওঠে—ও সব খবর বাবা আর দাদা জানে। দেখুন না—বর্ষাকাল। চাল তৈরীর ধান নাই—আর গোলার ধানও চাষের খরচায় শেষ হয়ে গেল। তবু চাল কিনে মোচ্ছব হচ্ছে। দাদাও বলেছিল।

হাসে রূপেন—এসব ব্যাপারে এখনও কেন যে কাকাবাবু এত বাড়াবাড়ি করেন জানিনা।

রামলাল বলে—ওইতো মজা। প্রথমে পূর্বপুরুষদের আমলে এঁরা ছিলেন বিগ্রহ, তারপর শুরু হলো নিগ্রহ, বর্তমানে তো এসব রূপুদা স্রেফ গলগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবাও এসব বুঝবেন না। দাদা তো সাফ্ জবাব দিয়েছে। এতে আমি নেই।

এখন আমি এসব বলতে গিয়ে বাবার চক্ষুশূল হয়েছি। আমি নাকি কাফের, বিধর্মী। বেশ আছি। ফাঁক পেলেই দুর্গাপুরে গিয়ে লোহাকাটার কাজ ধরবো।

রূপেন ওকে দেখছে। রামলাল-এর কথাবার্তাই এমনি। ওদিক থেকে কাদের উসখুস করতে দেখে রূপেন দাঁড়ালো না। নাটমন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল।

পাতু লাইন ক্লিয়ার দেখে এগিয়ে এসে বলে।—কি যে এত কতা কও মাইরি ম্যাষ্টারের সঙ্গে। ওদিকে শ্লা মাল জুইড়ে জল হয়েগেল আজ্ঞা।

…এ বাড়ির অনেকটা এলাকা এখন মেরামতের অভাবে ধ্বসে পড়ছে। একটা মহল তো আগাছায় ভরে গেছে। সেখানেই ওদের ডেরা।

পাতুর সঙ্গে রামলাল এগিয়ে যায় ওদিকে। কালো কামার মুরগীর ব্যবস্থা করেছে, আর শশী এনেছে কয়েকটা চোলাই মদের

বোতল। এতক্ষণ ধরে ওরা রামলালের জন্য অপেক্ষা করছিল। দু'-একটা মোমবাতি জ্বলছে। ছায়ামূর্তিগুলো ওদের দেখে নড়ে চড়ে বসল। রামলাল বলে—তোরা শুরু করিসনি ?

কালো বলে—গোঁসাইজী পেসাদ না করে দিলে চালাই কি করে ? শ্লা মুরগীর মাংস যা জমেছে মাইরি—অয় বাস। শ্লা যেন কর্কর কোঁ করে না ওঠে। লাও ওস্তাদ।

শশী বলে—আজ এসব খাবে গুরু ?

রামলাল অবাক হয়—কেন ?

শশী বলে—বাড়িতে ঝুলন, জ্যান্ত ঠাকুর গো। কেত্তন হচ্ছে, বোষ্টম মহান্তের বাড়ি, আজ ইসব—মুরগী, প্যাঁজ—

হাসে রামলাল—শ্লা খচ্চর কোথাকার। ভাগে দুনো মারবার তাল ! এ্যা ! মুরগী খেতে দোষ কি রে ? এতো রামপাখি—আর প্যাঁজ কিরে, বল গৌর পটল ! অশুদ্ধ কি বাবা—দে !

রামলালও নোতুন আসরে জমে যায়।

…ব্রজদুলাল বাবু কীর্তনের পর প্রসাদ পেতে বসেছেন সকলের সঙ্গে। বড় ছেলে রমেশও রয়েছে, মাধব এমন সময় এসে ঢুকলো। পরণে গিলেকরা পাঞ্জাবী—বাহান্নইঞ্চি ধুতির কোঁচা লুটিয়ে পড়েছে। আঙ্গুলে ঝকঝক করছে কোমল হীরের আংটি !

ব্রজদুলালবাবু বলেন—এসো মাধব। এত দেরী ?

মাধবের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়েছে। ও যেন এবাড়ির—এ গ্রামের দর্শনীয় বস্তু, গৌরবের ধন। তার দ্যুতির কাছে রমেশ নিতান্তই নিষ্প্রভ। রমেশও সেটা জানে।

মাধব বলে—আর বলাবেন না, কাকা, সদরে গেছলাম ডি. এম. সাহেবের কাছে। উপরে গৌরবাজারের কা[illegible] থেকে [illegible] মাইল অজয়ের বাঁধ মেরামত করা দরকার।

রূপেন বলে ওঠে—গতবছরেই তো [illegible] করলেম আপনিই, [illegible]

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA TRIPURA
73992
29/9/81

মধ্যে মেরামত করতে হবে ?

কয়েক লক্ষ টাকার কাজ ছিল ওটা, করেছিল মাধববাবুই। রূপেনের কথা শুনে মাধব যেন ইঙ্গিতটা স্পষ্টতর করেই টের পায়। তাই বলে সে—বাঁধ-এর আর্থ ওয়ার্কটা হয়েছে, ফিনিশিং করতে হবে, ড্রেসিং দরকার। ওগুলো তো ছিল না হে। এসব টার্মস্ তুমি বুঝবে না রূপেন।

রূপেন চুপ করে থাকে। মাধব ওকে যেন ধমকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে বলে—তাই নিয়েই দেরী হয়ে গেল। এদিকের এ্যাপ্রোচ রোডটাও করতে হবে। তাই সদর থেকে আসানসোলে পার্টি সেরে ফিরতে দেরী হয়ে গেল।

ব্রজদুলালবাবু বলেন—প্রসাদ খেয়ে যাও মাধব।

মাধব ওদের পাতায় খিচুড়ি আর লাবড়া ব্যঞ্জনের দিকে চাইল। দু' চারটে ভাজা ভুজিও রয়েছে। ওর কাছে এসব এমন সুখাদ্য কিছুই নয়, জানে এরপর আছে গুড়ের পায়েস হয়তো আর একমুঠ বোঁদে। আয়োজন এমনি সামান্যই।

মাধবের যেন কোথায় বাধে। তাই বলে সে,

—বাড়িতে প্রসাদ পাঠিয়েছেন তাই খেয়েছি কাকা। একবার না এলে কি ভাববেন, তাই এলাম প্রণাম করতে।

মাধব মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করে প্রণামীর থালায় একখানা একশো টাকার নোট নামিয়ে দিয়ে নেমে গেল। সকলেই দেখছে মাধবকে, মাধব ঠাকুরও সেটা জানে।

ব্রজদুলালবাবু গুম হয়ে খেতে থাকেন। এই উৎসবের সব আনন্দ যেন ম্লান হয়ে গেছে।

রমেশ বলে ওঠে —সকলকেই দেখছি রামলালকে দেখছি না ?

রূপেন দেখেছে রামলালকে ওই পাশের মহলের দিকে যেতে, সে চুপ করেই থাকে। মনে হয় ঠাকুর বংশের এতদিনের ধারায় অন্য কোন স্রোত এসে মিশেছে, তাই একাও প্রতিবাদ জানাতে চাইলেও পারেনি,

মুখ বুজে সেটাকে সহ্য করে চলেছে।

ব্রজতুলালবাবু গম্ভীরভাবে বলেন—সকলকে প্রসাদ খেয়ে নিতে বলো, সে ফিরবে যখন হোক।

রমেন বলে—মাধবদাও খেয়ে গেলেন না।

ব্রজতুলালবাবু বলেন—ওদের রুচিতে হয়তো বাধে রমেন। বৈষ্ণবের ধারা সহজ পথের ধারা ওদের জন্য নয়। ওরা আজকের মানুষ। জোর করে লাভ কি?

...খগেনবাবু মাথা নাড়েন। ভবতোষবাবুও ব্যাপারটা দেখেছেন। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য ফাটল গড়ে উঠেছে। ওদিকে বসেছিল শ্রীধর দাস। শ্রীধরের চেহারায় বৈষ্ণবী ভাব ফুটে উঠেছে। নধর গোলগাল শরীর, গলায় কয়েকফেরতা তুলসীমালা, তেলেজলে পাক ধরেছে। গোলমত মুখে নাকটা বেশ টিকলো, তাতে তিলকসেবার দাগও রয়েছে। শ্রীধর দাস বেশ কিছুদিন থেকেই নানা কারবারে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দুখানা ট্রাকে করে ওর আড়তে মাল যাতায়াত করে, ধানচালের কারবারও চলেছে মন্দ নয়। এখানে সস্তায় ধান কিনে রাতারাতি অজয় পার করে কয়েক মাইল শালবন পার হলেই দুর্গাপুর আসানসোল এলাকা, দুনো দামে চাল বিক্রী হয় সেখানে। আর ওদিকের বেশকিছু চোরাই মালও তার নিরাপদ আশ্রয়ে এনে রেখে যায় ওদিকের কৃতীপুরুষের দল। সাতে পাঁচে শ্রীধর দাস এখন ফুলে উঠেছে।

তবে ভক্তি মার্গকে সে ছাড়েনি। দেব দ্বিজে ভক্তি থেকে অর্থ ভক্তির মার্গে উন্নীত হয়েও পূর্বাশ্রমের পরিচয়টা ভোলেনি। শ্রীধর বলে ওঠে—তা যা বলেছেন বড় ঠাকুর। আজকাল ছেলেদের ওই ভক্তি টক্তি তেমন নাই, মহাপাতকেই মজেছে দেশটা। দেখবেন প্রভু এর প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। জয় গুরু!

—আর একটু পরমান্ন নাও হে শ্রীধর!

ব্রজবাবু এপ্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্তই পরমান্নের কথা তোলেন।

শ্রীধর নিমীলিত নেত্রে বলে—পরমান্ন—তা জ্ঞান। প্রসাদ যেন অমৃত। আহা? শ্রীধর সাপটে পরমান্ন খেতে খেতে চোখ বুজে ব্রজদুলালবাবুর বাকী ফর্দের টাকার হিসাবটাও কষে নেয়। ক'মাস টাকা বাকী পড়ে আছে আড়তে, তাছাড়া ঝুলনের সময়—গত পূজোর সময় নগদ টাকাও কিছু হাত হাওলাত দেওয়া আছে।

রাত্রি হয়ে গেছে। অতিথি ভক্তবৃন্দের দল বিদায় নিচ্ছে। ভজন-এর দলবল বের হয়ে আসছে, ব্রজদুলালবাবুর ডাকে চাইল ভজন। ব্রজবাবু ওর হাতে একশো একটাকা দিয়ে বলেন—যৎসামান্য সম্মান দক্ষিণা নাও ভজন, যোগ্য সম্মান দেবার সাধ্য তো নেই!

ভজন টাকাটা নিতে ইতঃস্তত করে—আবার ওসব কেন? গ্রামবাড়ির ব্যাপার, আমারও সৌভাগ্য যে আপনাদের কাছে নামগান করলাম।

ব্যাং গুম্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, টাকাটা দেখে এবার সিধে হয়েছে সে। কিন্তু মূলগায়েনকে ভনিতা করতে দেখে মনে মনে চটে উঠেছে।

ব্রজবাবু বলেন—না হে, এদের কিছু দিও। এটা রাখো।

ভজন টাকাটা অগত্যা নিয়ে প্রণাম করে বের হয়ে এল।

ব্রজবাবু বলেন—সত্যি বড় ভালো মানুষ ভজন হে।

শ্রীধর এতক্ষণে তাক্ বুঝে কথাটা বলে—তাহলে আজ উঠি ঠাকুরমশাই, মানে সামনের সপ্তাহেই আসি তাহলে?

ব্রজবাবু ওর দিকে চাইলেন। শ্রীধর এবার একটু খোলসা করে বলেন—মানে হাওলাতের চার হাজার টাকা আর জিনিষপত্রেরও ধরুন হাজার দেড়েক টাকা বকেয়া রয়েছে,

তাই ব্রজবাবুর খেয়াল হয়—বলেন এসো দেখি কি করা যায়।

…মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা নেমেছে। মন্দির চত্বর জনশূন্য। উৎসবের পর ছড়িয়ে আছে মালা, বিবর্ণ ফুল। ওদিকে ছেঁড়া কলাপাতার স্তূপ, কতকগুলো কুকুর তার মালিকানা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে।

বাতিগুলো নিভে গেছে, বিবর্ণ ম্লান শূন্যতার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রজদুলাল ঠাকুর ! আজ তিনি নিঃস্বপ্রায়, দেবতার প্রতিষ্ঠাও যেন এমনি নিঃস্বতায় বিলীন হতে চলেছে। শ্রীধর দাস-এর কাছে ঋণের অঙ্কটাও জানে সে, এ ছাড়াও অন্যত্র বেশ কিছু টাকা নিতে হয়েছে। ফেরৎ দেবার সাধ্য নেই তবু এই আয়োজন উৎসব তিনি করেন, কিন্তু আজ মনে হয় এসব অর্থহীন মাত্র।

রমেশের ডাকে চাইলেন—ভেতরে যাবেন না বাবা। কাল সকালে আমাকে দুর্গাপুরে ফিরতে হবে। দশটার ডিউটি, আমি শুতে যাচ্ছি।

ব্রজবাবু ঘাড় নাড়েন—তাই যাও। তোমার আবার চাকরী আছে। কাল ঝুলন-এর শেষদিন।

ওই উৎসব পূজা আজ তার বংশধরদের কাছে সব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। রমেনও দেখেছে সব। তাই বলে—এত সব আয়োজন, ব্যয় করার কি দরকার বাবা ? সামান্য করে করলেই হয়।

ব্রজদুলালবাবু বলেন—এতো সকলের উৎসব। এতদিন ধরে হয়ে এসেছে। যতদিন পারি চালাই, তবে মনে হয় সত্যিই আর পারা যাবে না। ঠাকুরই চান না বোধহয় !

…ব্রজবাবু ক্লান্ত পায়ে ভিতরে চলে গেলেন।

তখনও পাশের অন্ধকার মহলে রামলালদের উৎসব জোর কদমে চলেছে, আরও ক'টা বোতল এনেছে শশী। মুরগীর মাংসও এসেছে। শশী বলে—মাধবদার কাছ থেকে হাতালাম কিছু ! বলে—তা বাবা মোচ্ছবের খিচুঁড়ি না খাস এসব খাবি বৈকি !

কালো জড়িত কণ্ঠে বলে—বুঝলে রামু, তোমাদের মাধবদা গুড ম্যান ! দুহাতে টাকা কামালে কি হবে ? দিল আছে—

জ্ঞানময়ী স্বামীকে দেখে চাইল। ব্রজদুলালবাবু ঢুকছেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চেহারা। জ্ঞানময়ীকেও সারা দিন উপবাস করেই এতবড় যজ্ঞি বাড়ির সব কাজ দেখাশোনা করতে হয়েছে। বড়ছেলে রমেশের বৌ লতিকা এই বড় বাড়ির রীতিনীতির সঙ্গে ঠিক পরিচিত নয়।

বিয়ের কয়েক বছর পরেই লতিকাই বলে কয়ে রমেশের মনে ঝড় তুলে এই বাড়ি থেকে বাসার ছোট্ট পরিবেশে চলে গেছে।

জ্ঞানময়ী ব্যাপারটা বুঝেছিল, দুঃখ পেয়েছিল সে। ভেবেছিল রমেশ সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি আসবে, এখানেই থাকবে বৌমা আর তাদের নাতি। বংশের প্রদীপ।

জ্ঞানময়ী বলেছিল— গ্রামের সকলেই তো আসা যাওয়া করছে। বৌমা এখানেই থাক। প্রদীপও এখানে ভালোই থাকবে।

লতিকা আড়াল থেকে মা ছেলের কথা শুনে ইসারায় স্বামীকে কঠিন ভাবেই তার মতামত ব্যক্ত করতে বলে।

রমেন বলে—এখানে ভালো স্কুল নেই, তাছাড়া মেসে খেয়ে শরীর থাকছে না মা।

জ্ঞানময়ী তবু কি যেন বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্রজবাবু বলেন শান্ত কণ্ঠে—ওদের বাধা দিওনা রমেনের মা, ওরা যেতে চায়—যাক।

স্বামীর দিকে অসহায় চাহনি মেলে চেয়েছিল জ্ঞানময়ী। রমেন লতিকা আর প্রদীপকে নিয়েই বাসায় গিয়েছিল। সেই থেকেই বাসাতেই রয়েছে তারা।

লতিকা আড়ালে বলে—বাব্বাঃ জেলখানার ঘানি টানা থেকে বাঁচলাম। যা বাঁধন তোমাদের! ওই পাথরের ঠাকুরই সব, মানুষের কোন দাম নেই এখানে।

অবশ্য মাঝে মাঝে লতিকা রমেন আসে ছেলেদের নিয়ে। কিন্তু কোথায় শ্বাশুড়ী বৌ-এর মধ্যে নীরব ব্যবধানটা বেড়ে উঠেছে।

জ্ঞানময়ী জানে সেটা। দুঃখ হয় ছোট ছেলে রামলাল মানুষ হল না।

এতবড় সংসারে তাই জ্ঞানময়ী একাই।

আগেকার আশাভরা মন কি ব্যর্থতায় ভরে উঠেছে। উৎসবের সাড়া তাই মনকে ঠিক আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে না। কর্তব্য বলেই করে যেতে হয়। স্বামীকে ঢুকতে দেখে চাইল জ্ঞানময়ী।

ব্রজবাবু বলেন—উৎসব আর বোধহয় আসবে না বড় বৌ !

—কেন ! চমকে ওঠে জ্ঞানময়ী।

হাসলেন ব্রজবাবু, মলিন বিষণ্ণ হাসি। বলেন—না। অর্থ সামর্থের অভাবেই সব বন্ধ হয়ে যাবে এবার।

চুপ করে থাকে জ্ঞানময়ী। অন্ধকারে শোনা যায় অজয়ের ক্রুদ্ধ গর্জন—গেরুয়া স্রোত বয়ে চলেছে। রাতের বেলায় শব্দটা আরও বেড়ে উঠে। ও যেন মহাকালের পদধ্বনি—অন্তহীন যুগ-যুগান্তরেও শোনা গেছে—ভবিষ্যতেও শোনা যাবে উত্তরকালের মানুষের কাছে।

জ্ঞানময়ী বলে—ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে। শুয়ে পড় রাত হয়েছে।

ভজন দাস এই ক'টা মাস ঘরে থাকে। বর্ষার মরশুমে তাদের কীর্তন গান বাইরে বড় একটা হয় না। ঝুলনে একপালা এখানে গায়, আর দু একদিন বাইরে আশপাশেই যায়। তাদের মরশুম চলে পুজোর পর থেকে।

ব্যাং এই বাড়ির ওদিকে একটা ঘরেই থাকে। তিনকুলে তার কেউ নেই, ভজনই তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সকালে ভজন দাস পুজোয় বসে। ব্যাং-এর তখনও হুঁস নেই—বেশ দাপটের সঙ্গে নাক ডাকায় সে।

হঠাৎ কার ডাকে ব্যাং ধড়মড়িয়ে উঠলো।

রাধা হাসছে—এ্যাই ! কি নাক ডাকছিল তোর যেন ব্যান্ডেন্ বাজছে, ভোঁ ভোঁ—

ব্যাং চেয়ে দেখছে রাধাকে। সকালেই চান সেরে চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা, মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। রাধা বলে।

—চা খাবি তো ? নে।

উঠে বসল ব্যাং ! রাধার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে বলে সে,

বি য়েন বেলায় তোর মুখ দেখলাম—মহাজনী পদাবলীতে আছে—

প্ররভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজি ভালো॥

হাসে রাধা—মরণ সখ কতো? উঠে কাঠ ক'খানা চ্যালা করে দে দিকি, দেখছিস না ডাওরি আসছে, শুকনো কাঠ না থাকলে পিণ্ডি সেদ্ধ হবে কি করে? আর কাঠ কেটে একবার দাসজীর দুকান থেকে ডাল আলু এনে দে।

রাধার কথায় ব্যাং একপায়ে খাড়া। ওই বোকা বোকা ছেলেটার সরল চাহনিতে কোথায় দুরাশার আলোর ঝিলিক দেখছে রাধা। এই চাহনি সে চেনে।

পুরুষের চোখের ভাষাটাকে দেখেছে রাধা। কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে তার মনের অতলে একটা ঘৃণাই রয়ে গেছে, তারও বিয়ে দিয়েছিল ভজনদাস গৌরবাজারের কাছে মানগাঁয়ে, গৃহী বৈষ্ণব তারা। কণ্ঠিবদল অনুষ্ঠান হলেও মানগাঁয়ের সন্তোষদের বাড়িতে উৎসবের ত্রুটি হয় নি। ভজনদাস ঘটা করেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল।

ছেলে হিসেবে সন্তোষও ভালোই।

কিন্তু দু'বছরের মাথায় রাধার জীবনে নামে বিষাদের ছায়া, তার সব স্বপ্ন কোনদিকে এলোমেলো হয়ে যায়। সন্তোষের নাকি আগেকার একটা সংসারও আছে। সেই বৌ এসে এখানে দখল গেড়েছে। তাই নিয়েই রাধার মনে ওঠে ঝড়। দুঃসহ সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল সে।

সন্তোষ যে এতবড় অমানুষ হবে তা ভাবেনি, ঘৃণায় লজ্জায় নিজেকেই শেষ করতে চেয়েছিল রাধা কিন্তু পারেনি।

ভজনদাস সব শুনে এসেছিল ওকে নিয়ে যেতে। রাধার দুচোখে জল নামে। ভজনদাস বলে।

—কাঁদিস নে মা, ঘরে চল,একটা মাত্র মেয়ের খাওয়াপরার ব্যবস্থা করার সঙ্গতি ঠাকুর আমাকে দিয়েছেন। এ ভাবে এখানে থাকতে

হবে না।

রাধার ঘরের স্বপ্ন হারিয়ে গেছল অজয়ের উষার বালুচরে। এখানে ফিরে এসেছিল অসহায় মেয়েটি, ওর দেহে মনে তখন বর্ষার অজয়ের ঢল।···

তাই এখানেও পুরুষদের লোভী চাহনিটাকে সে চিনেছে, কিন্তু এড়িয়ে গেছে রাধা। ওর মনে সন্তোষের সেই আঘাতটা তীব্রতর হয়ে বাজে। তাই যেন রাধা মন দিয়ে কারোও দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি।

আকাশটা ক'দিন পরিষ্কারই ছিল, পানু ঘোষ মাঠে এসে এদিক ওদিকের ধান ক্ষেতগুলো দেখছে, রূপেনেরও সকালে রোজ মাঠে বের হওয়া অভ্যাস।

অজয়ের বন্যা বিরোধী বাঁধ থেকে ওদিকে ভোরের প্রথম আলোয় শিবপুরের গেরুয়া ডাঙ্গা শালবনের মাথায় প্রথম আলোর তুফান জাগে, পরিত্যক্ত শ্যামারূপার মন্দির চূড়ায় সেই আলোর ছোঁয়া, ঘুমন্ত পৃথিবীটা জাগছে ওই আলোর ছোঁয়ায় আর হাজারো পাখীর ডাকে। সেই-সঙ্গে মিশেছে অজয়ের জলপ্রবাহের একটানা শব্দ, গ্রামের শ্যামরায়-এর মন্দির চূড়ার কলসটা সকালের প্রথম আলোয় সোনার রং ধরে।

বাতাসে ওঠে ধান গাছের শিহরের মৃদুশব্দ।

বাতাস ওই দিগন্ত জোড়া সবুজ গালিচার উপর দিয়ে সাড়া জাগিয়ে চলেছে,···রূপেন শুধোয়

—কি পানু, ধান কেমন লেগেছে?

পানু ঘোষ বলে ওঠে—তা মন্দ লয় ম্যাষ্টার! আর আপায় কিছু না হলে মালক্ষ্মী ভালোই হবেন। থোড় গলায় আইছে।

শম্ভু ওদিকে ধান নিড়ুচ্ছিল। তামাকের লোভে পানুর কাছে এসে বলে—তা যা বলেছো! ইবার আকাল আর মালুম পাবো নাই গ।

আশ্বিনকাটা ঝুলুর ধানের বাহার দেখেছো? আর হপ্তা তিনেক পরে দেখবা কাস্তে লাগাতে হবেক।

একটু উঁচু জমিতে ওরা আউস—আশ্বিনকাটা—ঝুলুর ধানের চাষ করে। প্রথম আশ্বিনেই সে সব ধান পেকে ওঠে, এখনই ধানের গোছাগোছা শিষ বের হয়েছে। এবার বর্ষাও ভালোই।

গ্রামের লোক তাই খুশী। পানু ঘোষ বলে।

—ইবার পূজোয় একটা যাত্রা লাগাও ম্যাষ্টার, বেশ জমাটি পালা ধরো। দু'আসর গায়েন হবে। চাঁদার জন্যে ভাবনা নাই। ঘোষপাড়া থেকেই নিদেন পাঁচশো টাকা উঠবেক। ইবার দুর্গাপুর বাজারে শুধু তরিতরকারী বিচে শালোরা কি কম কামিয়েছে গ, ধানের কথা ছাড়ান দিলাম, সী দেখা যাবেক পৌষ সংকারন্তিতে!

শম্ভু মাথা নাড়ে—ঠিক কথা গ! ওই পলু, মদন উরা-তো শোনলাম ইটের পাঁজা দিবেক। পাকা দালান তুলবেক গো!

রূপেনও দেখেছে এবার চাষের কদর বেড়েছে। নদী পার হলেই বাস ট্রাক মেলে, তাতে করে এদের সবজী চালান যায় দুর্গাপুর আসানসোলে। রবি ফসলের চাষও করে এখন সবাই। আগেকার সেই নিঃস্বতা নেই। ওই মাটির কাছাকাছি মানুষগুলো এবার কি উৎসাহ নিয়ে জেগে উঠেছে।

রূপেন বলে—ভেবে দেখি, পরে জানাবো।

চীৎকার শোনা যায় শ্রীধর দাসের। গোলচেহারা নিয়ে লোকটা রোজ সকালে মাঠের দিকে আসে, উত্তরের মাঠের চককে চক জমি এখন তার দখলে। আরও জমি স্বনামে বেনামিতে ওই শ্রীধর দাসই কব্জা করেছে।

পানু বলে—লাও, সাতসকালে হাঁড়ি ফাটা দাসের মুখ দেখলম গ! শ্রীধর দাসকে গ্রামের অনেকে হাঁড়িফাটা নামেই আড়ালে ডাকে, কারণ একনম্বর কঞ্জুষ কৃপণ ওই লোকটা। আর তেমনি লোভী। শ্রীধর দাস গলা তুলে চীৎকার করছে শম্ভুর উদ্দেশ্য।

—হ্যা শালো বিয়েন বেলাতে ধান নিড়োনো ছেড়ে তামুক টানতে বসেছিস আলোর মাথায়! বেতন লিবি না?

শম্ভু পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মাঠে নামলো। দাসজীর মুনিষ মজুরের দল তখন মাঠে কাজ করে চলেছে, দাসজী ফর্দ করে।

—এদিকটা নিড়োন দিয়ে, বাকুড়ী তিনখান ধরবি। আর ভজা সার সালফেটি ছড়িয়ে যা এই সাথে।

রূপেনকে দেখে দাসজী বলে

—মাষ্টার যে। তা মাঠে আসা হয়েছে? ছাখ না ব্যাটাদের কাজের রকম! চারঘণ্টা ফাঁকি দে বলবে ন্যূনতম বেতন চাই। বলো এতে আমরা বাঁচি কি করে? তবু তোমার কথাতো ওরা শোনে, একটু বুঝিয়ে বলো ওদের! যাই ওদিকে গদিতে বসতে হবে, জয় গুরু।

দাসজীর নষ্ট করার মত সময় নেই।

রূপেন বাঁধের দিকে এগোচ্ছে। ওপাশে হঠাৎ কেশব মিত্তিরকে দেখে দাঁড়াল। সামনে ওদের ধ্বসে পড়া বাড়ি।

এককালে মিত্তিররাই ছিল এ দিগরের আদি জমিদার। ইছাই ঘোষ-এর আমলে ওরাই ছিল তাদের খাজাঞ্চী। আজ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে ধ্বসেপড়া বাড়ির ভগ্নস্তূপ রয়ে গেছে, আর কেশব মিত্তিরও যেন ওই ধ্বংসস্তূপের প্রহরী। ওর ছেলে দুর্গাপুরে হেভি মেসিনারীতে স্কিলড লেবারের কাজ করে। আর কেশব মিত্তিরের রাগটা তাই বেশী। বলে সে

—মিত্তির বংশের কুলাঙ্গার ওটা। মিত্তির বাড়ির ছেলে হয়ে হলি কিনা লেবর! মিস্তিরি! নো—ওর মুখদর্শন করবো না। নেভার।

নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকে আর ধ্বংসস্তূপের আশপাশে ঘোরে প্রেতাত্মার মত। লম্বা চুল, উস্কোখুস্কো দাড়ি, চোখদুটো লালচে। ধুলি ধুসর মূর্তি, কাপড়টাও তেমনি ময়লা এ যেন পাগলের বেশ। হয়তো তাই।

রূপেনকে দেখে কেশব মিত্তির এগিয়ে এসে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে চাপাস্বরে বলে—

নাউ আই হ্যাভ গট দি ক্লু। নিশানা আমি পেয়েছি। বুঝলে, আমার পিতামহ দিগ্বিজয় মিত্তির লায়ার ছিলেন না। এ গ্রেট ম্যান হি ওয়াজ। মহাপুরুষ ব্যক্তি, তিনিই বলেছিলেন আছে। এই ধ্বংসপুরীর অতলে ইছাই ঘোষের সব ধনসম্পদ, সব আকবরী মোহর আর সোনার তাল আছে।

এই ইডিয়ট গবা, এসবের মালিক হয়ে গেলি কিনা মিস্‌তিরি-গিরি করতে। ওকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করবো। আগে পাই এসব তারপর ওই দাসকেও দেখাবো···

—বাবা! হঠাৎ কার ডাক শুনে থেমে গেল কেশব মিত্তির।

ধীরা এগিয়ে আসে—আবার এই সব নিয়ে লেকচার দিচ্ছ? কেশব মিত্তির যেন চুপসে গেছে। বলে সে—

—কই না তো, এমনিই রূপেনকে বলছিলাম। যাই মা, পূজোর যোগাড় কর। যাচ্ছি!

কেশব মিত্তির নিজেই পায়ে পায়ে সরে গেল ওই ধ্বসেপড়া বাড়িটার দিকে। ধীরাকে দেখছে রূপেন।

ধীরা বলে—বাবার মাথাটা খারাপই হয়ে গেল।

রূপেন ওর বেদনা ভরা কণ্ঠের শব্দে ফিরে চাইল। বলারও কিছু নেই। দেখেছে রূপেন চোখের সামনে একটা ঐতিহ্যময় অতীতের নীরব সর্বনাশের ছায়া।

ধীরা বলে—দাদা বাবাকে নিয়ে যেতে চায়, গেলে আমিও এই ধ্বংসপুরী থেকে মুক্তি পাই রূপেনদা, কিন্তু বাবা একপাও নড়বে না। যক্ষের মত কি ধনসম্পদ আগলে আছে কে জানে, আমি আর পারছিনা।

ধীরার মুখচোখে ফুটে ওঠে বেদনার নীরব ছায়া।

রূপেন দেখেছে গ্রামের মেয়েদের জীবনের এই নীরব যন্ত্রণাটাকে।

ওদের সব স্বপ্ন কামনা ধীরে ধীরে কি ব্যর্থতার গ্লানিতে মলিন হয়ে ওঠে।

রূপেন বলে—দুর্গাপুরে তোমার চাকরীর কথা শুনছিলাম—সেটা হয়ে গেলে যেতেই হবে তখন কেশব জ্যাঠাকে।

ধীরা ম্লান হাসিতে ক্ষিন্নতাটুকুকে সোচ্চার করে বলে।

—আমার চাকরী! হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ মেয়ের চাকরী সেখানে কি হবে?

গ্রামেই মেয়েদের স্কুল চালু করেছে। রূপেন নিজেই উদ্যোগী হয়ে এ কাজ সুরু করেছিল এখন অবশ্য মাধববাবুও এসে জুটেছে। তাকে কমিটিতে রাখতে ঠিক চায়নি রূপেন, কারণ মেয়েদের ব্যাপারে মাধববাবুর একটু বদনাম আছে। আর ইদানীং নগদ পয়সার মুখ দেখার পর মাধব ঠাকুরও বিদ্যোৎসাহী হয়ে উঠে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মেয়েদের স্কুলের জন্য জায়গা আর বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে কিছু টাকাও দিয়েছে। কমিটিতে তাই এসে গেছে সে।

অবশ্য ব্রজদুলালবাবুই প্রেসিডেণ্ট, আর সেক্রেটারী হতে হয়েছে রূপেনকে, তবু জানে মাধব ঠাকুরের কিছু অনুগত প্রাণী, ওই খগেন বাবু, হেঁপো বিজয় রায় এরা মাঝে মাঝে মাধববাবুর অনুচ্চারিত কথাগুলো সোচ্চার করে তোলে।

রূপেন ধীরার কথার সুরে একটা বেদনাই অনুভব করেছে। শান্ত মেয়েটির জীবনের গভীরে একটি বিচিত্র অনুভূতির খবর তাকে জানাবার চেষ্টা না করলেও সেটা বুঝতে পারে রূপেন। নিজের দিক থেকে তার মনের অনুক্ত একটি স্বপ্ন হয়তো অজানাতে এই সকালের মাধুর্যকে ক্ষণিকের জন্য বর্ণময় করে তুলেছে।

রূপেন বলে—স্কুলে তোমার দরখাস্তটা দেখলাম। আমাকে তো বলোনি যে দরখাস্ত দিয়েছো?

ধীরা যেন সঙ্কোচ বোধ করে। বলে ওঠে—

তোমাকে বিব্রত করতে চাইনি। ব্রজকাকা বলেছিলেন, আমারও

এখানে যাহোক একটা কিছু হলে ভালো হয়, তাই দরখাস্তটা দিয়েছিলাম। এর জন্য তোমার কাছে আর তদ্বির করতে যেতে পারিনি।

রূপেন বলে—মাধবদাও কিন্তু তোমার কেসটা রেকমেণ্ড করেছেন।

ধীরা মাধব ঠাকুরের কথা শুনে একটু অবাক হয়। ওই লোকটিকে সেও এড়িয়ে চলে, জানে ওর স্বরূপ। তাই ধীরা বলে, এত হৈ চৈ হবে আমার স্কুলমাষ্টারী নিয়ে জানতাম না। তাই মনে হয় দুর্গাপুরে যাহোক একটা কাজ পেলে হয়তো শান্তিতে থাকতাম। মনে হয় কি জানো রূপেনদা? এই সাবেকী গ্রামগুলোর অন্তর মনে আছে শুধু জটিল প্যাঁচ আর কুটিলতা। সহজ মুক্তির আশ্বাস এখানে নেই। তাই যেন এই পরিবেশে দম বন্ধ হয়ে আসে। পালাতে চাই।

রূপেন বলে—সকলের ওপর অবিচার করোনা ধীরা! স্কুলের চাকরীটা পেলে বি-এ-টা দিতে পারবে। বি-এড করার সুযোগও থাকবে। দেখা যাক্ কি হয়। চলি।

ধীরা দাঁড়িয়ে আছে। রূপেনকে আর দেখা যায় না, গ্রামের গাছ-গাছালির আড়ালে ও মিলিয়ে গেছে।

ধীরা এই মিত্তির বাড়ির ধ্বংসস্তূপের অতলে যেন বন্দিনী কোন নারী। এককালে ছিল সম্পদ, বৈভব। আজ সব হারিয়ে গেছে—শুধু বংশমর্যাদার বোঝা নিয়ে যেন পড়ে আছে সে।

কেশব মিত্তির শুনেছে কথাগুলো। তাই এগিয়ে আসে মেয়ের দিকে। কেশব মিত্তির এখনও স্বপ্ন দেখে তার অতীতের। তখনও কিছু অবশেষ ছিল, রক্তে ছিল তুর্বার নেশা। জীবনকে সেদিন উপভোগ করেছে—তারই বিকৃতি আজ রোগজীর্ণ মনের অবচেতনে রয়ে গেছে। শুধোয় সে

—কি এত কথা হচ্ছিল ওই রূপেনের সঙ্গে? কথার যেন শেষ নাই।

ধীরা বাবার দিকে চাইল। ও জানে বাবার মনের

নোংরাটাকে।

এখনও তাকে সন্দেহ করে, মাঝে মাঝে চীৎকার করে। দুর্গাপুরে চাকরী নেবার কথা শুনে সেদিন ক্ষেপে উঠেছিল ওই লোকটা। বলেছিল—এবার নাচ উলি হয়ে যা শহরে গিয়ে। শহরে যাবার এ সখ কেন?

ধীরা চুপ করেই ছিল। ওই লোকটিকে বোঝাতে পারেনি বাঁচারও মূল্য দিতে হয়, আর তার জন্য মানুষকে রোজগার করতে হয়।

কিন্তু তার সংস্থান এ বাড়িতে নেই। কোনরকমে ভাগচাষীদের কাছ থেকে যা ধান, গম, কলাই পায় তা দিয়ে দুটো মানুষের পুরো বছরও চলে না। বড়দা সামান্য কিছু টাকা দেয়। ধীরা তবু সব সয়ে চুপ করেই থাকে।

নিজেই চেষ্টা করে দিন চালায়। কিন্তু ক্রমশঃ বাবার কথাগুলো অসহ্য হয়ে উঠেছে। কেশববাবু বলে

—টাকা! কত টাকা চাই তোদের? জানিস সোনার তাল জমানো আছে, কলসী ভর্তি আকবরী মোহর সব আছে এই ভিটের নীচে।

—থামবে বাবা! ওই সব কথা যদি বলো ভালো হবে না! তোমার পাগলামি আর সইতে পারছিনা।

ধীরাও ওই পাগলের প্রলাপগুলোকে সহ্য করতে পারছেনা।

কেশব মিত্তির চীৎকার করে ওঠে

—আমি পাগল! তোরাই সব শয়তান। ওই গবা দুর্গাপুরে তিনশো টাকার মাইনের চাকরী পেয়ে ধরাকে সরা দেখছে, আর তোরও মাথাটা বিগড়েছে। শহরে গিয়ে ঢপওয়ালী হবি না? খতম করে ওই ভিটের তলে পুঁতে রেখে দেব। মিত্তির বাড়ির মাটির তলে এমন অনেক পাপীর লাশ গুম করা হয়েছে, এখনও বেঁচে আছি আমি। ও কাজ আমিও করতে পারি! হুঁশিয়ার!

ধীরা দেখছে তার বাবাকে। লোকটা যেন এখনও সেই অতীতের স্বপ্ন যুগেই বাস করছে।

পায়ে পায়ে সরে গেল ধীরা। মনে হয় মিত্তির বাড়ির ধ্বংসস্তূপের কোন প্রেতাত্মা যেন ওই লোকটার উপর ভর করেছে। তাকে ও শেষ করে দেবে, এখান থেকে মুক্তি পেতে চায় সে।

বৃষ্টি নেমেছে। ক'দিন থেকেই আকাশ ছেয়ে মেঘগুলো জমেছে, ওদের আনাগোনার বিরাম নেই। দূরের নদীপারের শালবন সীমা শ্যামারূপার মন্দির চূড়া অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নদীর গর্জন মিশেছে ওই বৃষ্টির একটানা শব্দে আর গেরুয়া জলের ঢল ফুলে ফেঁপে উঠে ওই বন্যাবিরোধী বাঁধ-এর গায়ে এসে লাগছে, বিস্তীর্ণ বালুচর মানা বন নদীর খাতের মাথায় আউস ধানের ক্ষেতগুলোও ডুবে গেছে।

নবীন ভটচায ছাতাটা সামলাবার চেষ্টা করে, দমকা বাতাসে ছাতাটা উড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, আর নবীনের একহাতে রেকাবিতে আতপচাল কিছু ফুল। গ্রামের বাইরে বাঁধের নীচে দত্তদের শিবমন্দির। একপাশে মাঠের নির্জনে পড়ে আছে দেবতা, মাঠের এদিক ওদিকে গ্রামের কোন পরিত্যক্ত ভিটেয় এমন দু চারটা বেওয়ারিস শিবলিঙ্গ—পাথরের ধর্মরাজের চ্যাঙড় পড়ে আছে। মালিকরা দুর্গাপুর নাহয় কোলিয়ারী মুলুক কেউবা কলকাতায় গিয়ে কেরানীগিরির উপর নির্ভর করে দিন কাটাচ্ছে, তাদের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এই সব প্রস্তরীভূত দেবতাদের ভার নবীন ভটচাযের উপর। কেউ দু'একবিঘে ধানজমি দিয়ে গেছে, কেউ বা মাসে বিশ পঁচিশ টাকা পাঠায়। এই নবীন ভটচায সকালে একটা রেকাবিতে মুঠোখানেক আতপচাল আর দুচারটে ফুল বেলপাতা নিয়ে একবার রাউণ্ড দিয়ে পূজার প্রহসনটা সারে, ও বলে—মাঠখাওয়ারো সারতে হয় আমাকেও হে,

…নবীন ভটচাযের কিছু আউস ধানের জমি ছিল নদীর পাড়ে। শম্ভু লোহারকে দেখে নবীন বলে।

—ধানগুলো কেটে আন শালো। যা বর্ষা নামছে ধানে কল

বেরিয়ে যাবে।

শম্ভু অবশ্য তার জন্যেই এসেছিল। তবু দুখানা জমিতে কিছু ধান সেও ভাগ পেতো। কিন্তু এসে সব দেখে শুনে তার মাথায় হাত পড়েছে। ভটচাযের কথায় শম্ভু বলে।

—আর কাটবো কি গো ঠাকুর? ছ্যাখোসে কাণ্ড খান্! শালো নদীর কাণ্ড দেখে যাও গ!

নবীন ভটচায লম্বা টিকটিকির মত শীর্ণ মানুষটা, পায়ে ওর অসংখ্য কুল আঁটি বা কড়া, তাই লেংচে লেংচে হাঁটে। বাঁধের উপর উঠেই নবীন ভটচায নদীর রূপ দেখে চমকে ওঠে।

—অয় বাপ্‌রে! ই কি মূর্তি রে শম্ভো? শালো অজয় যে ক্ষেইপে গ্যাছে লাগছে। ধান ভর্তি ক্ষেতে কোমর ভোর জল! হেঁই বাবা অজয়, মুখের গেরাস কেড়ে নিলে বাবা!

নবীন ভটচাযের হাত থেকে পূজোর ফুল রেকাবি সব ছত্রাকার হয়ে পড়েছে। নদীর কলগর্জনে ওর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, আর্তনাদ সব চাপা পড়ে গেছে। আকুল স্বরে বলে নবীন।

—হেই শালো শম্ভো, দেকছিস কি! যা পারিস কোমর জলে নেমে গে‌্ এর শিষ কাট, পনেরো বিশ পণ ধান হতোরে।

শম্ভু অবশ্য সেই চেষ্টাই করছে। সঙ্গে নেমেছে ওর ভাইপো। গদাই, কোমর জলে নুইয়ে দু'এক মুঠো শিষ-এর নাগাল যা পাচ্ছে তাই কাটার চেষ্টা করছে। ব্যাকুল নবীন ভটচাযের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে চলেছে ওই নদী। নবীনও হুড়বড় করে নেমেছে জলে।

হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে, তীব্র স্রোতে তার শীর্ণ দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে বাইরের নদীর দিকে, শম্ভু খপ্ করে ওর হাতটা ধরে টেনে বাঁধে তুলে বলে চীৎকার করে।

—ক্ষেপে গেলা নাকি ঠাকুর, এখুনি মাঝনদীতে গেলে আর ধানের জন্য বুক চাপড়াতে হ'তনা। ওঠো দিকি। বেঁচে থাকলে ইমন ঢেক ধান হবেক! উঠে আয়রে গদা—যা তোড় ইতে ধান আর পাবি নাই। বুক

জল হই গেল !

…জল বাড়ছে। গেরুয়া জলের দিগন্তব্যাপী ঢল যেন মত্ত বেগে নেমেছে মরা অজয়ের বালুচরে। ছাপিয়ে উঠছে নদীর এলাকা।

আকাশে ওঠে মেঘের গর্জন। গুরুগুরু শব্দটা দিকপ্রসারী জলের বিস্তারে ওপারের শালবন সীমায় ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। বৃষ্টি চলেছে সমানে।

সান্নু মোড়ল, নব রায় দাসজীর গোমস্তা হরিপদ, পান্নু ঘোষ সকলেই এসে জুটেছে, নদীর মরা খাত জুড়ে ওরা আউশের সোনা ফসল ফলিয়েছিল। সব তখন ওই খরস্রোতে উপড়ে তুলে নিয়ে চলেছে, আর সান্নু ঘোষ হাহাকার করে ওঠে।

—তিন বিঘে জমিতে আই আর এইট দিছলাম গ, বিঘেতে তিরিশ মণ ফলতো, দুবিঘের বিলেতী।

নিষ্ঠুর অজয় আজ যেন এদের সব কিছু গ্রাস করে কি উন্মাদ উল্লাসে ছুটে চলেছে।

পাশেই কদমতলীর খেয়া ঘাটে রামু মাঝি নৌকোটা নিয়ে শিবপুরের দিক থেকে এপারে আসছে, বৃষ্টির ধারাস্নানে ভিজে গেছে সবকিছু, ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছে থরথরিয়ে, যাত্রী আজ বিশেষ নেই, দুচারজন লোক, দুটো গরু আর জনাতিনেক হাটুরে শূন্য বোঝা নিয়ে ফিরছে রূপগঞ্জের দিকে। ডাওরিতে লোকজনও বের হয়নি। দুদিন থেকে যেন মাতন চলেছে আকাশ বাতাসে। ধানমাঠ-এ জল জমেছে। বৃষ্টির থামার নাম নেই। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামছে।

রামু বহুদিন থেকেই কদমতলির ঘাটে নৌকো বেয়ে চলেছে। মাধব ঠাকুরের ইজারা নেওয়া ঘাট। দুখানা নৌকা চলাচল করে। রামু হালে মোচড় দিতে গিয়ে চমকে ওঠে।

ওই হালটার সব গতিপ্রকৃতি তার চেনা। নাড়িতে হাত দিলে শশী কবরেজ যেমন রোগের সব কিছু জানতে পারে, ওই হালটা রামুর

কাছে তেমনি, জলের বেগ—নদীর হৃদস্পন্দন—তার মেজাজ সবকিছুই ধরতে পারে সে।

আজ চমকে ওঠে রামু! হালটা টেনে ডাইনে আনতে পারে না, কেমন অজানা ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে, চাইল নদীর দিকে। মাঝ নদীর বারোমেসে ধারাণীর উপরই চলেছে নৌকোটা, দুদিকে গেরুয়া উন্মত্ত জলের কলকল্লোল। ওদিকে শিবপুরের বাঁধের এপাশে রূপগঞ্জের ধানখেত ছাড়িয়ে জল ঠেকেছে বড় বাঁধে। আর বাতাসে ওঠে নদীর মত্ত হুঙ্কার।

এতদিনের চেনা স্রোতের মৃদু গুঞ্জরণ আজ যেন অট্টহাসির কাঠিন্যে পরিণত হয়েছে। খল খল করে মাতাল উল্লাসে এক একটা ঘূর্ণি আছড়ে পড়ে। ওদিকে জলের বুকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে হঠাৎ ঘূর্ণি জাগে, পন্‌পনিয়ে জলটা ঘুরছে—নৌকোটাকে হালের মোচড় দিয়ে ওই ঘূর্ণির টান থেকে সরিয়ে নেবার বৃথা চেষ্টা করে গর্জে ওঠে রামু—এ্যাই শালো সুবো মদনা, দেখছিস না শালো, দাঁড় মার জোরে; খ্যাপা নদী মেতে গেছে রে।

নৌকোটার নীচে ওই ঘূর্ণির জল এসে আছড়ে পড়ে, কাৎ হয়ে যায় নৌকোটা। দমকা হাওয়া ক্ষেপে উঠেছে নদীর মাতাল বুকে।

—হেই বাবা অজয়, হেই দ্যাবতা—

কলরব আর্তনাদ ওঠে নৌকোয়। রামু এই বৃষ্টিতে ঘামছে। হাতের বুকের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, নৌকোটাকে যেন স্রোতের মুখে কুটোর মত তীরবেগে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে মত্ত অজয়।

—বৈঠা টান! জো ও রে সামাল!

দাঁত টিপে গর্জন করে রামু মাঝি। ও যুঝছে—প্রাণপণে লড়ছে স্রোতের সঙ্গে। নৌকোটা স্থির হয়ে গেছে স্রোতের মুখে। কে হারে কে জেতে অবস্থা। একবার ভাসিয়ে নিয়ে গেলে আর নৌকা রাখা যাবে না! সামনে কদমতলীর ঘাটের বটগাছটা দেখা যায়—মাটি—

আশ্বাস, আর এদিকে মৃত্যুর কঠিন স্পর্শ।

হালের কসিতে কড় কড় শব্দ ওঠে। পারমুখো করেছে নৌকাটাকে—স্রোতের মুখ থেকে এবার যেন সরে আসছে তারা।

—মামাগো! সুবো দাঁড় থেকে চীৎকার করে ওঠে—হু ছাখো!

চমকে ওঠে রামু। নৌকার লোকগুলোও আর্তনাদ করে ওঠে। একটা ঘরের চাল মত নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে আসছে, উপরে বসে আছে দু'তিনজন মানুষ।

—বাঁচাও। বাঁচাও—

নদীর বাঁধ থেকেও সানু ঘোষ নবীন ভটচায-এর দল দেখেছে ওদের। বৃষ্টি আর নদীর জলের কলকল্লোল ছাপিয়ে ভীত ত্রস্ত মানুষগুলোর চীৎকার ওঠে--হেই রেসো—সামাল, ওদের ধর।

রামু মাঝি চকিতের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নেয়। নদীর মুখ থেকে ওই মানুষগুলোকে ছিনিয়ে নেবেই সে। নৌকাটাকেও আড় করতে পারেনা, স্রোতের টানে টেনে নিয়ে যাবে মাঝ নদীতে, পারমুখ করে সে চীৎকার করে—লগি ফেল, লগি—

দশ ফিট নীচের বালিতে দুটো লগি দুদিক থেকে পুঁতে গেছে, থর-থরিয়ে কাঁপছে নৌকাটা। যাত্রীরা প্রাণের দায়ে চীৎকার করে—পাড়ে চল রামু। ছেড়ে সে ওদিকে—পারবি না।

—চোপ! রামু ধমকে ওঠে। গর্জাচ্ছে সে—মরবেক উরা --আর রামু তাই দেখবেক!

তীরবেগে ভেসে আসছে ভাঙ্গা চাল—ওর বাঁধন ছাদন খুলে এবার ছড়িয়ে পড়লেই মানুষগুলো ভেসে যাবে অকূল নদীতে। চীৎকার করছে তারা।···নৌকার কাছে চালটা আসতে দুটো লগি ধরে ফেলেছে ওরা; প্রাণপণে টানছে ওরা চালসমেত লোকগুলোকে নৌকার দিকে, তারাও মরীয়া হয়ে লগিটা ধরেছে।

এ যেন নদীর সঙ্গে লড়াই। মানুষগুলোই জয়ী হয়—চালটা কাছে আসতে ওরা তুলে নেয় জলে-ভেজা ভয়ার্ত অৰ্দ্ধঅচেতন কটি

মানুষ, একটি মহিলাকে।

...ই কি! গ!

বাচ্চাটা মায়ের বুকে জড়িয়ে ধরে আছে ভয়ে। এতক্ষণে নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে এসে মহিলাটি নৌকার কোলেই গড়িয়ে পড়ে।

...বৃষ্টি সমানে চলেছে।

রামুর নৌকাটা কদমতলীর ঘাটে এসে লাগতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত রামু মাটিতে নেমে বসে পড়ে। ...নবীন ভটচায—সানু ঘোষ হরিপদ গোমস্তারাও দৌড়ে এসেছে। কলরব ওঠে।

কয়েকজন যাত্রী ছিল ওপারে যাবার, তারা তাগাদা দেয় রামুকে—চল হে, খেয়া পার করে দাও রামু!

রামু ওদের দিকে চাইল! সামনে নদীর মারমুখি রূপ দেখে সে। সেই চরম মুহূর্তগুলোর কথা ভোলেনি। তার কাছে এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যাত্রীরা তাড়া দেয়।

-- ওঠো! পাড়ি ধরো বাপু!

রামু বলে ওঠে—খেয়া আজ বন্ধ বাবু, পাউড়ি দিতে লারবো।

গর্জে ওঠে তারা—পারের নৌকো, যাবে না মানে?

রামু বলে—ভবনদীর পারে যেতে চাও, চলে যাও নৌকা নিয়ে।

আমি পারবো নাই গ বাবুমশায়রা। লদীর ভাবগতিক ভালো লয়। ই টান আমি দেখি নাই গ!

ওই বানে ভাসা লোকেদের কে বলে ওঠে—হিংলের ড্যাম ভেঙ্গে গেছে গো। কাল রাত থেকে জল বাড়ছেই। আমাদের গেরাম—আশপাশে গেরামের চিহ্নৎও নাই! সব গেছে—গরু, বাছুর, মানুষ, ঘর সব—

ওরা কেঁদে ফেলে।

...স্তব্ধ জনতা দেখছে ওই বানে ভাসা মানুষগুলোর চোখে কি জমাট আতঙ্কের ছায়া, যেন সর্বনাশা মৃত্যুর পদধ্বনি ওঠে ওই মেঘের গর্জন আর জলের কলকল্লোলে।

সুবো বলে ওঠে—অয় বাপ। ই যে ঘোড়া বান গ!

পাহাড়ী নদীর মেজাজই আলাদা। যখন তখন উপরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রবল বর্ষণ বন্যা হয়ে নেমে আসে, তার গতিবেগও তেমনি। দেখতে দেখতে শূন্য বালুচর ছাপিয়ে জমাট দেওয়ালের মত ধেয়ে আসে জলরাশি।

এ যেন তেমনি কিছু ঘটতে চলেছে। ঘাটের ধারে নৌকার খোঁটা টা—আধঘণ্টার মত ডুবে গেছে। ভাসছে নৌকাটা। জলের সীমা বাঁধের গায়ে ঠেলে উঠছে।

রামু বলে—দেখছ কি গোমস্তা মাশায়—ও ঠাকুর। গেরামে খপর দাও। বাঁধে আসুক সম্মাই। শালো অজয় যে ক্ষেপেগেছে গ! আর জল নামছে হিংলো বাঁধের, তাতে যোগান দিয়ে চলেছেন শ্যালো দ্যাবতা। তেরাত্তির ধরে বর্ষাই চলেছে। থামার নাম নাই।

নবীন ভটচায ও ব্যাপারটা বুঝে শীর্ণ দেহ হাত পা নেড়ে বাঁধের উপর থেকে চীৎকার করে

—বান-এয়েছে—ঘোড়া-বান গ! সা মা লা বা—আ—! হেই-ই……

…একটি কণ্ঠস্বরে মিশেছে অনেক-কণ্ঠস্বর।…মুচিপাড়ার ধারে মুচি গৌর দাস-রাও দৌড়ে এসে বাঁধে উঠেছে। রবি এনেছে একটা টিকারা। ওই বৃষ্টির মধ্যে দুকূল বিস্তারী জলের প্লাবন দেখে রবি ওই টিকারা পিটছে। আর চীৎকার করছে তারা!

—বাঁধে আসবা গ—বাঁধে! হড়পা আইছে—এ—

হুঁসিয়ারি!…বাঁধ সামালাবা—আ—

নবীন ভটচাযের শীর্ণ বুকটা যেন ফেটে যাবে। পূজোর রেকাবী ফুল আতপচাল কোথায় হারিয়ে গেছে। দেবতার পূজোর পর্ব আজ চুকে গেছে! কাদামাখা জলে ভেজা অবস্থায় শীর্ণ লোকটা হাতের শাঁখটায় ফুঁ দিয়ে চলেছে প্রাণপণে। ঝড়োহাওয়ায় ওই আর্তনাদ—শঙ্খধ্বনির শব্দ সব মিশে যেন কোন আগামী সর্বনাশের

আভাস হয়ে ফুটে ওঠে।

···নদীর ধারে যাদের বাস তাদের ভাবনা বারোমাস।

এই কলরব আর্তনাদটা শুনেছে শ্রীধর দাস আড়তে বসে! লোকজন ব্যাপারীদের আনাগোনা আজ তেমন নেই। বর্ষার মেঘঢাকা আকাশে দুপুরের আগেই আঁধার নেমেছে।

দাসজী চমকে উঠেছে—কিসের শব্দ রে?···বাঁধে কারা যেন চেঁচাচ্ছে! এ্যাই যা তো রে! দেখে আয়।

···ওর হাজার হাজার টাকার চাল-গুড়-সার-এর বস্তা গুদামে ছড়ানো। সিমেন্ট-এর ডিলারসিপ নিয়ে রাতারাতি ট্রাকবন্দী চোরাই সিমেন্টও ষ্টক করেছে প্রচুর।

এসময় কিছু হয়ে গেলে ভরাডুবি হয়ে যাবে। নিজেই ছাদে উঠে গেল দাসজী, দেখেই চমকে ওঠে। সামনে গ্রামের ধোপাপাড়া দাসপাড়ার পর লোহারদের ঝুপড়ি ঘর তারপরই উঁচু বাঁধটা। তার ওদিকে চক চক করছে অজয়, দূরে ওপারের সীমান্ত দেখা যায় না। বৃষ্টি নেমেছে। কানে আসে অজয়ের গর্জন।

···এ্যাই! যতনা, ভূতো পবন তোল, বস্তা তোল ওপরে।

দাসজী সাবধানী ব্যক্তি। সে আগে থেকেই এবার সাবধান হয়েছে। হাঁক-ডাক করে গলদঘর্ম অবস্থায় যা পারে উপরে তুলছে।

রাখাল ছেলেটা ভিজে গোবর হয়ে ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে —অয় বান তানাস্ রে, কি বান এয়েচে গ! বটতলার বাঁধে ঘোঘের বাসা দিয়ে জল বেরুছে। সব্বাই দৌড়ছে ঝুড়ি কোদাল নিয়ে। শালো জল যেন ফোরা ধরে বেরচ্ছে মুনিব।

দাসজীর তখন ওসব কথা শোনার সময় নেই। গর্জাচ্ছে সে।

—মাল তোল ব্যাটা। ব্যাক্খানা করবি পরে।

···রূপেনও হাজির হয়েছে বাঁধে। ততক্ষণে গ্রামের অনেকেই এসেছে। ব্রজবাবুদের বিরাট বাড়িটার বহু ঘরই শূন্য।···ওদিকে

কাছারিবাড়িতে লোকজন সেরেস্তাপত্র আর নেই।

গ্রামে খবর রটে গেছে, ওই কজন বানভাসি লোককে তুলে এনেছে তারা। নবীন ভটচার্য এখন পগ্‌গ বেঁধে যেন দেশোদ্ধারের কাজে লেগে গেছে।

…ব্রজবাবুও নেমে এসেছেন, তিনি বলেন,

—ওদের কাছারি ঘরেই তোলো।…

ব্রজদুলালবাবু বলেন রূপেনকে দেখে।

—বাঁধের অবস্থা কি রূপেন? বানের যা হাল দেখছি ওটা রাখতেই হবে। নালে গ্রামতো যাবে!

খগেনবাবুও একটা ছেঁড়া বর্ষাতি চাপিয়ে এসেছে।

মাথা নেড়ে বলে—ইয়েস। এ গ্রেট ডেঞ্জার ব্রজবাবু। বাঁধে চলো সবাই।

রূপেন বাঁধে এসে অবাক হয়। এতকাল সে এই নদীকে দেখে আসছে। শীতে শীর্ণা, বালুচরে তখন ফসল হয়। গ্রীষ্মে এই বালুচরে ওঠে দাবদাহ, খর রৌদ্রের লেলিহান শিখা কাঁপে শূন্য বালুচরে।

আজ সেখানে জেগেছে করাল বন্যার ভয়াবহ রূপ।

ঘোলা গেরুয়া জল রুদ্ররোষে এসে বাঁকের মাথায় নদীর বাঁধে যেন ঝাপিয়ে পড়ছে, আবার বাধা পেয়ে ফিরে চলেছে নদীর খাতে। বারবার ওই দিকহীন জলরাশি দুপারের বাধন তুচ্ছ করে মুক্তির পথ খোঁজে, নিষ্ফল আক্রোশে শুধু গর্জে ওঠে।

…বাঁধটা কাঁপছে থরথরিয়ে, নদীর ধারালো সাপটে ঝরে ঝরে পড়ছে নরম মাটি। নিরু ঘোষ হাঁক পাড়ে।

—মাটি। মাটি আনো হে! ইধারে—

কে চীৎকার করে—বাঁশ, টিনের ঘের দিয়ে মাটি ফেল। শালো নদী যেন সাপটে লিছে সব।

বাঁধের উপর বেশ কিছু লোকজন ওই বৃষ্টির মধ্যেই মাটি ফেলছে।

ঝপ্‌ঝপ্‌ কোদাল চলে। শ্রীধর দাসও ছাতা মাথায় এসে ঘোষণা করে—হ্যাসাক্‌, ডেলাইট দু-তিনটে গদি থেকে এনে দে। রাতভোর বাঁধে থাকবি রে।

মাধব ঠাকুর এর মধ্যে এসে পড়েছেন। ব্রজদুলালবাবু এই বৃষ্টিতে জলে কাদায় বের হন নি। মাধববাবু জানে তাকে এবারে ভোটে দাঁড়াতে হবে। তাই এই সুযোগে সে তার ক্ষেত্র তৈরী করতে চায়। মাধববাবু বলে,

—রাতের খাবার আমিই দেব। চালাও রাতভোর। বাঁধ যেন না ভাঙ্গে। খবরদার।

···বাঁ-ধএর জিম্মাদারী যেন তার উপরই। মানুষগুলো যুঝছে প্রাণপণে, বৃষ্টিও সমানে চলেছে। চমকে ওঠে নবীন ভটচায।

—অয় বাবা বিশ্বেশ্বর, হেঁই বাবা অজয়—কি করবা গ!

ওদিকের বাঁধ-এর ধার ছুঁই ছুঁই করছে জল। কিন্তু জল কমার কোন লক্ষণই নেই। মাটিও আর নেই। এদিকে নদীর খাত, বাঁধ। অন্যদিকে ধান খেতে জল জমে জমে বুকজল ঠেলে এসে বাঁধে লেগেছে।

রতন চীৎকার করে—মাটি।

···কিন্তু কোথায় মাটি, অজয়ের মত্ত জলধারার কাছেও যেন খবরটা পোঁছে গেছে। ধারালো জিব দিয়ে সে ওই বাঁশ খোঁটা-মাটি-গুলোকে খানিকটা ধ্বসিয়ে দিয়েছে!

—হুঁসিয়ার!···বাঁধ···ভাঙ্গলো গ—

লাফ দিয়ে এদিকে এসে পড়ে ওরা, হানামুখের এদিকে এসে ভীত মানুষগুলো ত্রস্ত। চীৎকার করছে!

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে ওদের আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে দিক দিগন্তরে, অসীম মত্ত জলরাশির বুকে সেই চীৎকারটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে গেল।

গ্রাম-গ্রামান্তরের সুপ্ত মানুষ জেগে উঠেছে। অন্ধকারে দু'একটা

ভীরু আলোও দেখা যায়, তারাও চীৎকার করছে। ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই লড়াই-এর কঠিন পরাজয়ের সর্বনাশা খবরটাকে দূরে দূরান্তরে।

মানুষগুলো দৌড়চ্ছে গ্রামের দিকে।

সুপ্ত মানুষগুলো প্রাণভয়ে জেগে উঠেছে—পালাও, পালাও সবাই। ঢিবিতে-নাহয় ঠাকুরবাড়ির দিকে পালাও!

…ভজনদাসও উঠে পড়েছে। হাতের কাছে ওর পদাবলী-কীর্তন-এর পুঁথি গুলোকে হাতড়ে বগলদাবা করেছে। জীবনে এই তার সবচেয়ে আপন, রাধারাণীও বাবার ডাকে বের হয়ে আসে। তখন গ্রামের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে ওই আর্তনাদ আর অজয়ের জলরাশির বাঁধভাঙ্গা মত্ত উল্লাসধ্বনি।

রাধারাণী বলে—চলো বাবা! দেখছো না উঠোন ঠেলে জল ঘরে ঢুকছে।

…কোথায় যাবো মা! দিশেহারা হয়ে গেছে মানুষটা।

রাধারাণী শুনছে পাড়ার অন্যান্যদের চীৎকার। রূপেনবাবুর গলা শোনা যায়।

—শীগ্‌গীর বের হয়ে ঠাকুরবাড়ির ভিটেতে চলে যাও সবাই। শীগ্‌গীর।

ভজন বলে—ব্যাঙটা কোথায়?

—এই যে গো!…ব্যাং-এর মাথায় পুটুলি, আর গলায় ঝুলছে শ্রীখোল। ব্যাং বলে—ইটাকে ছাড়বো নি মূলগায়েন, চলো—

ঝপ্‌ঝপাং!…জলে কি যেন আছড়ে পড়ল সশব্দে।

—বাবা। চীৎকার করে ওঠে রাধারাণী।

সামনে দত্তদের বড় মাটকোঠাখানা প্রচণ্ড শব্দে জলে আছড়ে পড়লো। ঠাণ্ডা জল। ক্রমশঃ যেন জল বাড়ছে। স্রোতও মালুম হয়। পথ ঘাট একাকার হয়ে গেছে। সেই কোমর জল বুকজল ঠেলে গ্রামের মানুষ সব ফেলে পালাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

…হুঁসিয়ার !…দাসজীর গলা শোনা যায়।

…এর মধ্যে গুড় তৈরীর কয়েকটা কড়াইও বের হয়েছে। তাতে করেই তুজন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে দাসজীকে। ওদিকে অন্ধকারে ওঠে গরু-বাছুরগুলোর চীৎকার। বানের তোড়ে সান্নু ঘোষ-এর গোয়ালটা পড়ে গেছে। সেখানে এক বুক জল—

সান্নু ঘোষ গরুর দড়িগুলো খুলে দিতেই তারা জলে পড়ে সাঁতরে চলেছে। দামী গরুও ছিল কয়েকটা। এতকাল ধরে তাদের পুষেছে সান্নু ঘোষ। আজ তাদেরও মুক্তি দিয়েছে সে। বাঁচাবার সাধ্য নেই। বলে সে—যা তোরা, পারিস তো বাঁচ গে !

—সান্নু !

রূপেন চীৎকার করে ওঠে—চলে আয় সান্নু ! বানের জল এখানে সাঁতার হয়ে যাবে। চলে আয় !

সান্নুর খেয়াল হয়। তার বাড়ির লোকজন আগেই চলে গেছে। সান্নুর আর যেন হাতে পায়ে বল নাই। এগোতে গিয়ে ছিটকে পড়লো সামনের ডোবাটায়। সেখানে তখন অথৈ জল। ঘূর্ণিতে ছিটকে পড়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে সে।

—-মাষ্টার-মাষ্টার গ—

সান্নুর আর্তনাদটা কানে আসে কিন্তু দেখা যায় না তাকে। গ্রামের পথ দিয়ে তুর্বার স্রোতে মানুষটা খড়-কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে, সামনে একটা ডাল দেখতে পেয়ে সেইটা ধরে উঠে পড়ে গাছে

…ধীরা চমকে ওঠে ওই আকাশ ফাটানো চীৎকারে।

—বাবা ! বাবা !

কেশর মিত্তির অবশ্য রাতে ঘুমোয় না। ও যেন এই ধ্বংসপুরীর অতন্দ্র প্রহরী। মেয়ের ডাকে কেশব বলে,

—চুপ করে থাক। ডাকাত পড়েছে গাঁয়ে। ওরা এদিকেও আসতে পারে।

ধীরা বলে ওঠে—কি নিতে আসবে ? শুনছো না—বাঁধ ভেঙ্গেছে !

—বাঁধ ভেঙ্গেছে !

কাদের চীৎকার শোনা যায়—বাইরে চলে আসুন মিত্তিরকাকা ! বানের জল গাঁয়ে ঢুকছে। ঠাকুরবাড়িতে চলে আসুন !

···কেশব মিত্তির দেখছে—উঠোনে জল এসে পড়েছে।

—বাবা ! চলো। ডাকছে ধীরা।

···কেশব মিত্তির গর্জে ওঠে—বানের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাবো ? ছাদে উঠতে হয় তবু যাবো না। এখানেই থাকবো।

ধীরা জানে একতলাও ডুবে যাবে। জলের তোড় বেড়েছে। জীর্ণ দালানগুলো তোড়ের মুখে টিকবে কি না কে জানে। ধ্বংসপুরীতে সে থাকতে পারবে না। বলে সে।

—চলো বাবা ! এখানে আটকে পড়লে বাঁচা যাবে না। ঘরে জল ঢুকছে। ওই দ্যাখো।

চমকে ওঠে কেশব মিত্তির।

ধীরা কোনরকমে বাবাকে নিয়ে দোতলার ভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ঘুম আসেনি। রাত ভোর শুনেছে ধীরা চারিদিকে মানুষের আর্ত রোল, ভেসে যাওয়া গরু-বাছুরের অসহায় আর্তনাদ আর বাতাসে মেশা জলস্রোতের শব্দ।

ঘসাকাচের মত আকাশ নিয়ে সকাল সুরু হয়েছে।

চারিদিকে চেয়ে চমকে ওঠে ধীরা। জল—জল আর জল। গ্রামের সবকিছু ওই জলে ভাসছে। অজয় যেন গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে। তাদের বাড়িটার নীচের তলা ডুবেছে। আহার যদিও কিছু মেলে, খাবার জল নেই। কেশব মিত্তির রাত ভোর জেগে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ঠিক নয়—অসাড় ক্লান্তিতে হারিয়ে গেছে মানুষটা।

ধীরা ভয় পেয়েছে। এ যেন জলবন্দী কোন নির্জন দ্বীপে সে নির্বাসিত। কোন আহার্য নেই, পানীয় নেই। জলস্রোত যেন পুরোনো ভিটেটাকে এবার মুছে দেবে। ওদিককার পাঁচীল খানিকটা

ধ্বসে গেছে এর মধ্যেই।

কেউ নেই আপন জন!

মানদা ঝিও ওদিকে চুপ করে বসে আছে। হঠাৎ কিসের শব্দে চাইল ধীরা।

একটা ডিঙ্গি আসছে এই দিকেই।

স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে দাঁড় বেয়ে লগি ঠেলে কোনমতে আসছে সেটা।

—ধীরা!

দ্বিজেন ভোলেনি তাকে। ধীরাদের সন্ধানে তাই এসেছে সে ডিঙ্গি নিয়ে। মুখে চোখে ক্লান্তি তবু দ্বিজেনের ওই ডাকে চমকে ওঠে ধীরা!

—তুমি!

দ্বিজেন নৌকাটাকে কোনমতে উঠোনের এদিকে এনে নিজে পাঁচীল ধরে উঠে আসে! হাঁপাচ্ছে সে—ভালো আছো তো?

হাসল ধীরা—ভালো! সব হারিয়ে কোনমতে এখানে এসে উঠেছি। এই নাচমহলে!

জীর্ণ হলটা এখনও অতীতের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। মেজেতে গালচে পাতা, ধুলোয় বিবর্ণ ঝাড়টা ঝুলছে। কয়েকটা আয়নার পারা উঠে ছোপ ছোপ হয়ে গেছে। ওদিকে পড়ে ঘুমুচ্ছে কেশব মিত্তির।

—তোমাদের নিতে এসেছি ধীরা। চারিদিকে জল, এ বাড়িও ধ্বসে পড়তে পারে। ব্রজবাবুদের চত্বরে সবাই উঠেছে। ওখানেই চল!

ধীরা চাইল দ্বিজেনের দিকে।

ডাগর অসহায় সেই চাহনি। রাত্রিজাগরণ আর দুশ্চিন্তার ক্লান্তি হতাশার সঙ্গে সেই চাহনিতে ফুটে ওঠে অসহায় বিষণ্ণতা। ধীরাও যেন আজ একটু নির্ভর আশ্রয় খোঁজে! ধীরা ভেবেছিল রূপেন তবু আসবে। তার উপরই ভরসা কিছু ছিল, কিন্তু রূপেন পারেনি—

হয়তো খেয়ালও নেই। এসেছে দ্বিজু ঘোষ!

দ্বিজেন তাড়া দেয়—চলো। দেরী করা ঠিক হবে না। তোমাদের পৌঁছে আবার অন্যদিকে যেতে হবে। রূপেনও বের হয়েছে অন্য নৌকা নিয়ে।

কেশব মিত্তির উঠে পড়েছে। সে দেখছে অসহায় চাহনি মেলে এই সর্বনাশকে।

কেশব মিত্তির দ্বিজেনকে দেখেছে ধীরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে। হঠাৎ কেশব মিত্তির শুধোয়

তুমি! তুমি কেন এসেছো— এখানে?

ধীরা বাবার দিকে চাইল!

দ্বিজেন বলে—এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি। চারিদিকে তুফান চলেছে! এখানে থাকা ঠিক হবে না।

কেশব মিত্তির বলে ওঠে—আমি কোথাও সেলটার নিতে যাবো না!

স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা শব্দ ওঠে— ঝপাং—

সেই শব্দটা যেন এই ভাঙ্গা বাড়ির এদিক ওদিকে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে। ওদিককার পাঁচীল ধ্বসে পড়েছে। ধ্বসবে এবার মিত্র প্যালেস।

ধীরা ভীত চকিত স্বরে বলে— তোমাকে যেতেই হবে। এবাড়িও ধ্বসে পড়বে বাবা!

কেশব মিত্তিরও এবার যেন সেটা বুঝেছে। এতদিনের প্রাসাদ ওই বন্যার তোড়ে এবার মুছে যাবে। মুছে যাবে সবকিছু।

কোনরকমে ধরাধরি করে মিত্তির মশাইকে ওরা নৌকায় তুলেছে। ধীরাও নেমে আসছে। জীর্ণ পাঁচীল—পা দিতে একটা ইট খসে পড়ে ধীরা ছিটকে পড়তো। দ্বিজেন ওর হাতটা ধরে ফেলে। কাঁপছে ধীরা। এখন বাঁচার প্রশ্ন—তবু সেই আতঙ্ক ভয় ছাপিয়ে দ্বিজেনের ওই ঘনিষ্ঠ ছোঁয়াটুকু ধীরার মনে কি সাড়া আনে।

দ্বিজেন বলে—সাবধানে নামো।

ওরা নৌকায় উঠেছে।

চারিদিকে শুধু জল। মাঠে তালপুকুর আমবাগান সব ডুবে গেছে। গাছের মাথাগুলো দেখা যায়, আর ভেসে আসে দিগন্ত থেকে মানুষের আর্তচীৎকার।

ধীরা স্তব্ধ হয়ে দেখছে এই সর্বনাশকে। ওরা ঠাকুরবাড়ির চত্বরে এসে উঠেছে।

ব্রজদুলালবাবুও এগিয়ে আসে—আসুন কেশববাবু!

কেশব মিত্তির আজ সর্বহারা ভিখারীর মত প্রাণটুকু নিয়ে এখানে এসেছে। ঘোলাটে চোখ মেলে চাইল মাত্র।

আশ্রয় নিয়েছে এই বিশাল চত্বর কাছারিবাড়ি-চণ্ডীমণ্ডপ আর ইস্কুলে সারা গ্রামের মানুষ। বিনিদ্র রাত কেটেছে তাদের।

তারা এবার জেগে উঠে দিনের আলোয় দেখছে এই সর্বনাশকে!

সকাল হয় কিন্তু এই সকাল সূর্যের আলো ঝলমল সকাল নয়। আকাশে শরতের শিউলি ফোটার সুবাসও জাগেনি, ওঠেনি পাখীর কাকলি। আশা ভরা দিনের সম্ভাবনাময় সকাল এ নয়।

এ সকাল বর্ষণমুখর কোন সর্বনাশের সম্ভাবনা ভরা আতঙ্কের দিনপ্রভাত। চারিদিকে শুধু জল আর জল। গ্রামের পথ-বাড়ি-ঘর সব ভাসছে, আকাশে ওঠে সোঁ সোঁ গর্জন।

আগে এই ঠাকুরবাড়ির চাতাল থেকে চোখ মেললে দেখা যেতো সবুজ ধান ক্ষেতের সীমানা, অন্যদিকে অজয়ের বাঁধ-এর ওদিকে রূপালী বালুচর দূর দিগন্তে সবুজ গ্রামবসত। শান্ত-সুন্দর-প্রশান্তি ভরা একটি ছবি।

আজ সকালেই চমকে ওঠে রূপেন। ঠাকুরবাড়ির সীমানা এদের কাছারি বাড়ি আর লাগোয়া বাগানগুলো বেশ উঁচু ডাঙ্গার উপরই। কাছিমের পিঠের মত নেমে গেছে গ্রামবসতের এলাকা ধানক্ষেতের

সীমানা এখান থেকে।

···রূপেন এ দৃশ্য কখনও দেখেনি। সারা গ্রাম ভাসছে আর সবুজ আদিগন্ত ধানক্ষেতের কোন নিশানা নেই শুধু চকচক করছে জল, সামনে নদীর হানামুখ দিয়ে সারা অজয়-এর জলস্রোত যেন ঠেলে ঢুকছে এই জনবসতের দিকে নোতুন পথে।

ওই অজয়ের বাঁধের ঠাঁই ঠাঁই জেগে আছে জলের মধ্যে, ওখানে আশ্রয় নিয়েছে আশপাশের গ্রামের এ গ্রামের নামোপাড়ার বেশ কিছু মানুষ। তুদিকেই মারমুখী জলস্রোত মাঝে কালো রেখার মত জেগে আছে বাঁধ-এর কিছুটা আর খোলা আকাশের নীচে বৃষ্টির মাঝে ওই ঝড় তুফানের মাঝে দাঁড়িয়ে ভিজছে মানুষজন-গরুগুলো। রাত ভোর ওরা ভিজেছে—এখনও ভিজছে, কোন আশ্রয় ওদের নেই।

ঠাকুরবাড়িতে দাসজীও উঠে এসেছে। রাতভোর তার ঘুম নেই। গ্রামে তার বাড়িটা দোতলা কিন্তু আশপাশের বাড়িগুলো মাটির, তারা সবাই পালিয়ে গেছে। দাসজীও একা দোতলায় জলবন্দী হয়ে থাকতে সাহস করেনি, তাই দোতলায় মালপত্র বোঝাই করিয়ে নিজে সপরিবারে এখানে মাধববাবুর নোতুন মহলে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

দাসজী বলে ওঠে—কি দেখছো রূপেন ভাই, সব কিছু রসাতলে গেছে, সব্বোনাশের বাকী আর কিছু নাই গ।

নবীন ভটচায-এর কাজ সুরু হয় ভোর থেকেই। গ্রামের মধ্যে, গ্রামের আশপাশে ছড়ানো শিবমন্দির ধর্মরাজের মন্দিরে রাউণ্ড সুরু হয়ে যায়। আজ আর কোন কাজ তার নেই।

দেখা যায় দূরে আশপাশের গ্রামের মধ্যে জল—আর সেই জলে মন্দিরের কোনটা অর্ধেক কোনটা কার্ণিশ অবধি ডুবে আছে। বানের জলে ডুবে গেছেন দেবতারা, আর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, মন্দিরের চুড়া আর ত্রিশূলটা জেগে আছে মাত্র।

নবীন ভটচায বলে—ইকি হ'ল গো দাসমশাই। দেবতাদেরও এমনি হাল হয়ে গেল।

রূপেন বলে ওঠে—দেবতা আর নেই ভটচায কাকা।

নবীন ভটচাযের কথাটা ভালো লাগে না। তাই বলে সে,

—দেবতা থাকবেন কি করে ? সব যে দানোর রাজ্যি হয়ে উঠেছে গো। তাই এই শাস্তি।

ঠাকুরবাড়ির চত্বরের ওদিকে স্কুল, সামনে খেলার মাঠ ! এখন সেখানে গরু বাছুর ছাগল মানুষের সহাবস্থান চলেছে।

রামুর চীৎকার শোনা যায়—অ মাষ্টার !···

রামু আর দামুদের সময় নেই। ঘাটের খেয়া নৌকো ডিঙ্গিটা এনেছে সটান ঠাকুরবাড়ির পিছনে ডোবার ধারে।

রূপেনের খেয়াল হয় এখনও জলবন্দী হয়ে অনেকেই রয়ে গেছে এখানে ওখানে। রাতের অন্ধকারে অনেকেই আশ্রয় নিতে পারেনি। এরপর আছে তাদের টিকে থাকার প্রশ্ন। বাঁধের দিকে চেয়ে দেখছিল সে। তারা চীৎকার করছে। দুদিকে ওদের হানা পড়েছে। মাঝখানে ওই উঁচু টিবিটুকুকে দুদিকের নদীর তোড় গ্রাস করে চলেছে।

বাঁধে আশ্রয় নেওয়া লোকগুলোও বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব।

ভজন রাধারাণী ব্যাং-রাও তাড়াতাড়ি সামনে উঁচু নদীর বাঁধেই এসে আশ্রয় নিয়েছিল গ্রামের এদিককার কিছু লোকের সঙ্গে। তারা বুকজল আর তীব্র স্রোত ঠেলে এগোতে পারেনি গ্রামের দিকে।

···কিন্তু এখানে এসে বিপদেই পড়েছে। রাতভোর কোন আশ্রয় নেই, নদীর বাঁধ যেন স্রোতের বেগে থরথর করে কাঁপছে, যে কোন মুহূর্তেই ধ্বসে পড়বে।

···কালি বলে উঠে—ইকি হ'ল গো। "ভূতের ভয়ে ওঠলাম গাছে। ভূত বলে আমি পেলাম কাছে।" বাঁধের দুদিকে হানা পড়েছে। আর চড়·চড় করে বাঁধটুকুকে গিলে ফেলছে শালো অজয়। কুথাকে এলাম গো ! ই বাঁধতো থাকবেক নাই।

সকালের আলো ফুটতেই চমকে ওঠে ওরা ব্যাপার দেখে।

খরস্রোতে নদীর জল বেরুচ্ছে, আর তার ধারালো জিবের সাপটে দুদিকের বাঁধ ধ্বসে পড়েছে ঝপ্ ঝপাং !

…ব্যাং দেখে শুনে বলে—অ মূল গায়েন ই বাঁধ টুকুনও ভেসে যাবে আমাদের নিয়ে।

যাবার পথ আর নেই !…সামনে মৃত্যুর পদধ্বনি। ওই মানুষ-গুলি চীৎকার করছে—বাঁচাও !

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ভিজে কাদামাটির বাঁধের উপর রাধারাণী। দুদিকে তার তুফান আর মত্ত বাতাসের সর্বনাশা শব্দ ধীরে দুদিকের হানামুখ তাদের সামনে থেকে মাটির আশ্রয়টুকুকে গ্রাস করে চলেছে।

—বাঁচাও !

বাঁধ থেকে দূরে দেখা যায় ঠাকুরবাড়ির নিরাপদ আশ্রয়গুলো, ওখানে যাবার পথও নেই। ক্রমশঃ সেই বাঁধের আশ্রয়টুকুই ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে নদীর গর্ভে। গেরুয়া জল হানা দিচ্ছে, ওর মুখের সামনে আটকে পড়েছে বন্দী কয়েকটা মানুষ, তাদের যেন আর বাঁচতে দিতে চায় না ওই হিংস্র রুদ্র ভৈরব। কণ্ঠে ওর পৈশাচিক হাসি কল-কল-খল-খল শব্দ……।

ঘূর্ণিগুলো নাচতে নাচতে এসে হানা দিচ্ছে বাঁধে আর তাদের থাবায় বেশ কিছুটা করে মাটি খাবলে নিয়ে চলেছে।

—বাবা ! চমকে ওঠে রাধারাণী।

—বিরাট একটা জানোয়ারের পিঠের মত বাঁধটায় ধীরে ধীরে যেন ফাটল ধরেছে। ব্যাংও চীৎকার করে,

অ মূল গায়েন বাঁধ যে চৌফালা হই যাবেক গ ! অ নিধু খুড়ো।

—বাঁচাও ! ওদের চীৎকার কানে আসে।

জলে ভেসে ভেসে আসছে শব্দটা।

রূপেনও শুনেছে ওদের আর্তনাদ। মাধববাবুর ঘুম ভেঙ্গেছে। বৃষ্টি তখনও সমানে চলেছে। শ্রীধর দাসও বের হয়ে আসে।

তাকে যেতে হবে ওই পুরানো বাড়ির দোতলায়। লোকজন মালপত্র বেশ কিছু আছে দোকানে। মাধববাবুরও বিশেষ দ্রব্যের দরকার। দাসজী আসানসোল থেকে বিদেশী মদও এনে যোগান দেয় মাধব ঠাকুরকে।

মাধব ঠাকুর বলে—কয়েকটা বোতল এনে দাও দাসজী, আজ বাদলার দিন কি আর করবো, বেরুবারও পথ নাই। ওই সেবা করা যাক।

দাসজী একপায়ে খাড়া। মালও আনা যাবে আর বাড়িঘর মালপত্রের তদারক করা হবে। শ্রীধর তাই সামনে রামু মাঝিকে নৌকায় বসে তামাক টানতে দেখে বলে,

—একটু নিয়ে চল বাবা ওপাড়ায়।

নিতাই মাষ্টার, ভূধরবাবু, আর কিছু ছেলেরা অন্য ডিঙ্গি থেকে লোকজন উদ্ধার করে এনে নামাচ্ছে। শ্রীধর উঠেছে রামুর নৌকায়, রূপেন চীৎকার করে ওঠে।

—উঠবেন না দাসজী, নৌকা ওই বাঁধে যাবে।

—নৌকা, ডিঙ্গি সব, এখুনিই ওখানে যাবে। ওদের খুব বিপদ।

দাসজী বাধা পেয়ে চাইল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কানে আসে ওই বাঁধের মানুষগুলোর চীৎকার।

—বাঁধ উড়ে গেছে গ, বাঁচাও—

দাসজী বলে—মাধববাবুর জিনিষ আনতে যাচ্ছি, চল তুই।

রূপেন বলে—না। ওই মানুষগুলোকে না আনলে এখুনিই ওই বাঁধ উড়ে যাবে ওরা-ও ভেসে যাবে। এখন কোন কথা নয়, চল রামু ওই ডিঙ্গিটাও নিয়ে চল জলদি।

দাসজী গর্জায়—আমি বলছি, এ মাধববাবুর নৌকা, এ নৌকা ওখানে যাবে না।

রূপেন এসে টেনে নামিয়ে দেয় দাসজীকে। ও চীৎকার করে ওঠে —কভি নেই! এ নৌকো কেউ পাবেনা।...

লাফ মারছে উত্তেজনায় অপমানে গোল গোল মানুষটা। আর তারপরই পিছল কাদায় পা হড়কে ঝাপটে আছড়ে পড়েছে ওই কাদার মধ্যে আর সমবেত জনতা দাসজীর ওই কাদামাখা পানভূতের মত মূর্তি দেখে হাসিতে ফেটে পড়ে। শ্রীধর দাস গর্জে ওঠে।

—আমি দেখে নেবো। এর বিহিত আমি করবোই !

ও গর্জাচ্ছে।

রূপেনদের দাঁড়াবার সময় নেই। নৌকা দুটো তখন স্রোতের টানে ভেসে চলেছে বাঁধের দিকে। বাঁধটা যেন চোখের নিমেষে এবার ভেঙ্গে পড়বে, কোন রকমে ওই তীব্র স্রোতের মুখে নৌকাটা লগি দিয়ে ধরেছে। থর থর করে কাঁপছে নৌকাটা।

হাঁক পাড়ে রূপেন—তাড়াতাড়ি কর।

নদীও যেন ছিনিয়ে নিতে চায় ওদের। একটা বড় চাঙ্গড় ধ্বসে পড়ে সশব্দে নদীর গর্ভে !

—হাম্বা ! ···চীৎকার করে একটা গরু ছিটকে পড়ল জলে। তার মাথাটা দেখা যায়। ডাগর কালো দুচোখে মৃত্যুর ছায়া নেমেছে। বিকট একটা ঘূর্ণি নাচতে নাচতে এসে ওই গরুটাকে দুপাক ঘুরিয়ে নীচে টেনে নিল।

··· আর্তনাদ করে ওঠে রাধা--বাবা !

···নারায়ণ ! নারায়ণ ! ভজন অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে, ব্যাং গুম হয়ে বসে আছে নৌকায় !

রূপেন হাঁক পাড়ে—ও ডিঙ্গি থেকে লোক নামিয়ে সিধে এখানে ফিরবি। এখনও দু'খেপ দিতে হবে। বৈঠা মার জোরে।

মাধববাবু সাবধানী লোক। শ্রীধর দাস-এর উপর এই জুলুমটা সে দেখেছে, লোকটাকে ওরা আর একটু হলেই মারধরই করতো। গোলমাল দেখে মাধববাবুও এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করতে গিয়ে

থামলো। কারণ সে-ও শুনেছে বাঁধের বন্দী মানুষগুলোর আর্তনাদ আর দেখেছে এখানের মানুষগুলোর চোখে মুখে ওই খুশির আভা। দাসজীকে আজ আঘাত অপমান করতে পেরে ওরা খুশী হয়েছে। এই চরম দুর্যোগের মুখে এতদিনের চেনা পোষমানা মানুষগুলোর ভিতরের প্রকৃত স্বরূপটাকে যেন দেখেছে মাধববাবু।

দরকার হলে ওরা আজ তার মুখের উপরই কথা বলবে, হয়তো অপমানই করবে। তাই মাধববাবুও সাবধান হয়ে উঠেছে।

ওকে দেখে কাদামাখা অবস্থাতেই দাসজী বলে উঠে।

—দেখুন ছোটবাবু, কি করলে দেখুন। নৌকায় উঠতে গেলাম, ধাক্কা দিয়ে কাদায় ফেলে বলে কিনা—চুবিয়ে মারবো।

মাধববাবু আশপাশের লোকগুলোর দিকে চাইল। ওরা শুনতে চায় মাধববাবুর কথাগুলো। সাবধানী মাধববাবু বলে,

—ওসব কথা যেতে দাও দাসজী। এখন ওদের বাঁচানোই বড় কথা। ওসব কাজ পরে হবে।

দাসজী বলে—তাই বলে অপমান করবে?

—এখন তুচ্ছ মান-অপমানের কথা ভুলে গিয়ে দেশের সেবায় যাতে লাগো তাই করতে হবে দাসমশায়।

মাধববাবু বেশ দরদীর মতই কথাগুলো বলে। দাসজী একটু অবাক হয়। মনের রাগটা চেপে বলে ওঠে।

—ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন চুপ করছি। তবে পরে এর বিচার করতেই হবে।

রামুমাঝি জলে থেকে দিনরাত নৌকা বয়েছে, বয়স হয়েছে তার। আর বৃষ্টিতে ওই ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শরীরটা ভালো নাই। বলে সে রূপেনকে—আর পারছি না গ মাষ্টার। মাজা-গা গতর টাটাচ্ছে। জ্বর আইছে গো। নৌকা বাইতে লারবো।

চমকে ওঠে রূপেন। বাঁধের বিস্তারও কমে আসছে, দুদিক থেকে

নদী হানা দিয়ে তাকে গ্রাস করবে এবার ! জলবন্দী মানুষগুলোর চীৎকার কানে আসে।

বলে ওঠে রূপেন—এ-সময় না গেলে ওরা যে শেষ হয়ে যাবে।

রামু বলে—তোড়ে নৌকা রাখতে পারছিনা বাবু, নিজেরাই যে নৌকা সমেত ছিটকে যাবো, দেখলেন তো নদীর তোড়।

বড় গাছ একটা ছিটকে পড়েছে, তাকে গড়িয়ে গড়িয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে ওই জলস্রোত।

দ্বিজু বলে—এসময় তুই যাবি না ?···

রামু বলে—একা ভরসা পাইনা বাবু ! নদীর মেজাজ ভালো না ! ডর লাগছে।

ওরাও ভরসা পায় না। সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে তারা। রূপেন বলে—তাহলে ওদের বাঁচানো যাবে না ?

হঠাৎ এগিয়ে আসে একটি তরুণ, বলিষ্ঠ চেহারা। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো। বলে সে।

—আমি যাবো বাবু, নৌকা নিয়ে যেতে পারবো।

সকলেই চাইল ওর দিকে। ওদেরই তুলে এনেছিল রামু নদীর বুক থেকে। রূপেন বলে।

—পারবে তুমি ?

ছেলেটি বলে—আগে ভীমগড়ার ঘাটে আমিও নৌকা বাইতাম।

ওকে দেখে ভরসা হয়। পেশীবহুল দেহ, দুচোখে কঠিন চাহনি। সেইই রামুকে বলে—তুমি লায়ে যাবে গ বড়মাঝি। আমি শিরণী ধরছি, পিরোজন হলে তুমিও হাত লাগাবে।

এতক্ষণে এই জনতার মুখে একটু আশার আলো দেখা যায়। কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে বাঁধ-এ আর যাওয়া যাচ্ছে না। ওই জলবন্দী মানুষগুলোকে আর আনা যাবে না।

অনেকের আপনজন এখনও পড়ে আছে ওখানে ! তারাও ভাবনায় পড়েছিল। এবার নৌকাখানাকে ওই দিকে যেতে দেখে

ওরাও আশা পেয়েছে। সন্তোষ শক্ত হাতে হাল ধরে নৌকা নিয়ে চলেছে। আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই নদীর জল আরও বেশী পরিমাণ ঢুকেছে এদিকে আর তোড়ও বেড়েছে তেমনি।

রামু দেখছে নোতুন ছেলেটিকে। রূপেনও প্রথমে ভরসা পায়নি, কিন্তু রামু ওর হালের মোচড় দেখে বলে।

—মজবুত মাঝি গ দেখছি মাষ্টার। ডাইনে কাটা বাবা, হ্যাঁ! এ্যাই লকা শালো ঝিঁকেয় বৈঠা মার! হ্যাঁ জোরে। দুদিকে সমানে মার!

এ যেন যমে মানুষে আর নদীর টানের সঙ্গে লড়াই চলছে। স্রোতের মুখে এসে নৌকাটা কাঁপছে, এগোতে পারে না। ওদিকে দুটো বৈঠা পড়ছে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে। আর সন্তোষ-এর পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, প্রাণপণে হাল ঠেলে সে এগোবার চেষ্টা করছে। বেঁকে গেছে হালের মজবুত বাঁশটা।

রামু চীৎকার করে—হাল ভেঙ্গে যাবে সন্তোষ, বাবু এগোনো যাবে না গ!

রূপেনের সামনে ওই অসহায় লোকগুলো, বাঁধ আর টিকবে না। ওরা চীৎকার করছে—বাঁচাও, নৌকা আনো মাইরি!···

ঝপাং করে বাঁধের বেশ খানিকটা ধ্বসে পড়লো। ওদিকে নৌকা এগোচ্ছে না। একটু নীচেই রসি দুয়েক দূরে বাঁধের শেষ অংশটুকু টিকে রয়েছে, ও আর থাকবেনা। ভেসে যাবে মানুষগুলো এইবার।

সন্তোষ দেখছে বাঁধের ওই ছায়া ছায়া ভয়ার্ত মুখগুলোকে। তুলতেই হবে ওদের। বলে ওঠে সন্তোষ রামুকে।

—তুমি হাল ধরো কত্তা, আমি রসি নিয়ে লাফ দিছি, সাঁতরে বাঁধে গে টেনে নৌকা ভিড়োবো ওখানে।

চমকে ওঠে রামু—তোড়ে ভেসে যাবি মরদ! খপরদার।

সন্তোষ এর মধ্যে নৌকা বাঁধা কাছিটা কোমরে জড়িয়ে লাফ দিয়েছে স্রোতে। চমকে ওঠে রূপেন—রামু!

তীর বেগে ভেসে চলেছে সন্তোষ ওই তীব্র স্রোতে, সামনে বাঁধের মাটিটুকু তাকে পেতেই হবে। নেহাৎ একটু ঘূর্ণির ধারে পড়তে প্রবল বেগে ওই জলস্রোত তাকে ঠেলে দিয়েছে বাঁধের দিকে।

পায়ের তলে মাটিও পেয়ে যায় সন্তোষ, হাত বাড়িয়ে একটা কসাড় গাছের ডাল ধরে জলসিক্ত অবস্থায় বাঁধে উঠে পড়েছে। জলবন্দী লোকজনও এবার তার সঙ্গের কাছি ধরে টানছে নৌকাটাকে। এগিয়ে যায় নৌকাটা!

ধীরা এখানে এসে বাবাকে নিয়ে দোতলার একটা ঘরে ঠাঁই নিয়েছে। কেশব মিত্তির গজগজ করে—এ কোথায় আনলি? তুইবা কোথায় যাস্?

ধীরা দেখছে সামগ্রিক বিপদকে। সেও বসে থাকতে পারেনি। নীচের বড় হল—সেইগুলোয় লোকজন এসে জমেছে।

খগেনবাবুও ওদিকে এসেছে। লোকটা সর্দারি করে।

—সবাইকে এবার রেডি হতে হবে ফর ওয়ার! এও এক যুদ্ধ হে! ধীরা তুমিও একটু এসো। এদের খাবার কিছু দিতে হবে।

খিচুড়ির আয়োজন করা হচ্ছে। ধীরার রূপেনের উপর অভিমানটা যে অকারণ তা সে ও বুঝেছিল।

এতবড় কর্মকাণ্ডের মূলে ওই রূপেনই। কাল থেকে জলে কাদায় সে ঘুরছে বিপদের মাঝে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চেহারা। দাঁড়াবার অবকাশ তার নেই। ওই তীব্র স্রোতের মুখে সে চলেছে লোকজনদের উদ্ধার করতে। না হলে বোধ হয় অর্দ্ধেক লোকই মারা পড়তো।

রূপেন বলে—এসেছো তাহলে! দোতলায় যাও। ধীরা সকালেও দেখেছে ওই বাঁধের উপর জলবন্দী মানুষগুলোকে।

বাঁধ ধ্বসছে। তীব্র স্রোত—ওরই মাঝে এগিয়ে চলেছে ওরা। দাসজীকে নৌকা থেকে নামিয়ে জোর করে নৌকা কেড়ে নিয়ে ওরা ছুটেছে ওই বাঁধের দিকে।

চীৎকার-আর্তনাদ আর বাঁধ ধ্বসার শব্দ শুনে ধীরাও এসেছে দোতলার ছাদে।

এ যেন প্রাণপণ লড়াই চলেছে। নদী ছিনিয়ে নেবে ওই জলবন্দী মানুষগুলোকে—আর এরা কেড়ে আনবে তার মুখ থেকে ওদের। বাঁধের বেশ খানিকটা ধ্বসে পড়েছে। নোকাটা ঘুরছে স্রোতের বেগে। যে কোন মুহূর্তে উল্‌টে যাবে।

ব্রজদুলালবাবু চীৎকার করেন—ওরে সর্বনাশ হয়ে গেল!

কিন্তু করার কিছুই নেই। রূপেন—রামু মাঝি—নোতুন একটি ছেলে যেন লড়ছে প্রাণপণে। ওই স্রোতে ওরা ভেসে চলেছে বাঁধের দিকে।

রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। ধীরা দেখছে ওদের।

রূপেনের বলিষ্ঠ দেহটা যেন জলকাদায় ফুলে উঠেছে। প্রতিমা—ভবতোষবাবুও এসেছেন। প্রতিমা আর্তনাদ করে

—ওখানে কেন গেল রূপু! ও গো—

মায়ের অসহায় কান্না ঝরে পড়ে বানের জলে!

না!

ওরা তুলেছে ওদের। ওই মানুষগুলোকে। নৌকাটা ভেসে আসছে—তীব্র স্রোতে। জয়ধ্বনি ওঠে—জয় বাবা ত্রিকালনাথ! জয় ঠাকুর।

প্রচণ্ড শব্দে বাঁধ-এর বাকিটুকুও রুদ্র অজয় এবার নিঃশেষ করেছে। ততক্ষণে ওরা নৌকা নিয়ে গেছে নিরাপদ দূরত্বে!

রুদ্ধশ্বাস প্রাণীগুলো যেন এবার নিঃশ্বাস ফেলেছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস। নৌকাটা ফিরছে ওদের নিয়ে।

রাধারাণী দেখেছে মৃত্যুর স্তব্ধতা। কাল রাত থেকে দেখেছে সে নদীর ওই রুদ্র মূর্তি। চোখের সামনে একটু একটু করে পায়ের নীচের মাটি হারিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে মৃত্যুর বিভীষিকা।

বৃষ্টি মেঘের গর্জন আর ওই আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে ছিল সে।

আজ চোখের সামনে দেখেছে অজয়ের সেই সর্বনাশা রূপ!

নৌকাটা আর পৌঁছাতে পারতো না, ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত স্রোতে। গা মাথা ভিজে গেছে। কাঁপছে মেয়েটা। এতক্ষণে নৌকায় ওই যুদ্ধমান মানুষগুলোকে দেখতে পায় সে।

রূপুবাবুর কাপড় চোপড়ও ভিজে, সর্বাঙ্গে পলি কাদা মাখা, রামু মাঝি হাঁপাচ্ছে আর ওই তরুণটিই নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে দড়ি নিয়ে লাফিয়েছিল জলবন্দী বাঁধে!

চমকে ওঠে রাধা। ওকে যেন চেনে সে, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, মুখটা শীর্ণ, দুচোখের সেই চাহনি তবু চেনা। রাধা চমকে ওঠে!

যেন অতীত বর্তমান সব কিছু একাকার হয়ে গেছে তার। ব্যাং বলে—আর ডর নাই গ! চত্বরে এসে গেলাম!

রাধারও হুঁস হয়।

ব্রজদুলালবাবু—মাধববাবুদের এজমালি চত্বরে এসে গেছে তারা। অনেকেই এগিয়ে আসে। নামছে তারা। রাধাও স্বপ্নাবিষ্টের মত নেমে গেল।

ব্রজদুলালবাবু দেখছেন ওদের। রূপেন ক্লান্ত, রামু হাঁপাচ্ছে। নোতুন ছেলেটির মুখে সারা গায়ে পলিকাদা মাখা, কাপড়টা ভিজে স্যাপস্যাপ করছে। আজ ওই-ই বাঁচিয়ে এনেছে ওই লোকগুলোকে।

ব্রজবাবু শুধোন—কি নাম তোমার? নোতুন দেখছি।

সন্তোষ কাছে এসে ওকে ওই অবস্থাতে প্রণাম করতে ব্রজবাবু বলেন—থাক, থাক!

রূপেনই ওর কথা বলে—বানে ভেসে এসে এখানে উঠেছিল। নিজেই এগিয়ে এসেছে, আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সন্তোষ।

ব্রজবাবু বলেন—আজ তুমি না থাকলে সর্বনাশ হতো বাবা।

সন্তোষ বিনীতভাবে জানায়—আমার সাধ্য কি বলুন। চেষ্টা

করলাম মাত্র !

ধীরাও এসেছে—এ কি রাধা !

রাধারানী ওর দিকে চাইল। তখনও রাধা দেখছিল ওই সন্তোষকে। নামটাও চেনা ! কোথায় যেন এই বৃষ্টিনামা সর্বনাশের মাঝে রাধা নোতুন একটি স্বপ্ন দেখে।

ধীরার ডাকে এগিয়ে যায়—এলাম দিদি। বেঁচে ফিরে এলাম বলতে পারো।

ব্যাং মালপত্র মাথায় তুলতে তুলতে বলে—পুনোজম্মো গ ! চলো—মূলগায়েনকে নে ঘরে রেখে এয়েছি। ধুম জ্বর এয়েছে ওর ! যা টালমাটাল চলছে !

চারিদিকে গাছ—বাঁশ বন উপড়ে ওই বিরাট মাটির বাড়িগুলো পড়ে পড়ে এমন অবরোধ স্থষ্টি হয়েছে যে নৌকো ডিঙ্গিও ঢুকবে না। তাদেরও খবর কেউ পাবে না !

চমকে ওঠে রতন। একটা অসহায় মৃত্যু ভয় তার সব চেতনাকে গ্রাস করছে। কোন আশ্বাসই নেই।

তবু বলে সে শঙ্করীকে—আজকের রাতটা কাটুক—

—অ অতন ! খাবার কিছু নাই ? চাট্টি দে কেন্নে ?

ঘেঁংড়ে ওঠে যতীন বুড়ো। জলে ভিজে হিমে কাঁপছে সে, রতন বুড়োর দিকে চাইল !

এত বিপদে ওর খাবার চাহিদাটুকু কমেনি। বরং বেড়েই উঠেছে।

—অ অতন !

সামান্য চাল গামছায় বেঁধে তুলে এনেছিল, বৃষ্টিতে মুড়ি আর নেই। চালগুলো ভিজে ফুলে উঠেছে। রতন বিরক্তিভরে বলে।

—কত খাবে ? নাও—গেলো !

দুমুঠো চালই তুলে দেয় ওর হাতে। বুড়ো মাড়ি দিয়ে সেই ভিজে চালগুলো চিবুতে থাকে।

মাধব ঠাকুর করিতকর্মা ব্যক্তি! নিজের বুদ্ধির জোরে আর পরিশ্রমে মাধববাবু এখন এ দিগরের মধ্যে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। বড়রাস্তার ওদিকে ধানকল শহরে ব্যবসা নিজের কন্‌ট্রাকটারী কারবারও চলেছে, ট্রাক বাসও আছে।

মাধবঠাকুর জলবন্দী অবস্থাতেও খারাপ তেমন নেই।

বানে রাস্তাঘাট সাঁকো ভাঙ্গুক, তার ঠিকেদারী ব্যবসাও রম রম চলবে। তবু ভাবনা হয় ধানকলটার জন্য।

ইতিমধ্যে শ্রীনাথ দাস নৌকা নিয়ে বের হয়েছিল, সে ফিরেছে খবর নিয়ে।

—আজ্ঞে ধানকলের ওখানেও জল গেছে, তবে কলবাড়িতে জল ওঠেনি।

মাধববাবু জানলার বাইরে আদিগন্ত বিস্তৃত জলের দিকে চেয়ে বলে—ওঠে নি, উঠতে কতক্ষণ হে?

দাসজী বলে—যা বাড়ার তা বেড়েছে, আর বোধহয় বাড়বেক নাই। এত জল আর তুনিয়াতেও নাই ছোটবাবু।

মাধবঠাকুর মনে মনে খুশী হয়।

শ্রীনাথদাস এর মধ্যে খবরের কাগজ জড়ানো তুটো বোতল টেবিলে রেখে বলে—এ তুটো রইল ছোটবাবু, সেবা করবেন।

মাধববাবু বিলেতী বোতল তুটো দেখে খুশীই হয়। বাদলার দিনে জমবে ভালো। তবু মাধববাবু শুধোয়।

—কলবাড়িতে লোকজন বেশী ঢোকেনি তো হে? চালফাল যা আছে তাহলে সব যাবে। বন্যার্ত হয়ে যেন মাথা কিনেছে ওরা, সেই স্ববাদে সবই গিলবেন।

—যা বলেছেন ছোটবাবু, ওই রূপেন মাষ্টার আর তার দলবল। সেইরকম কিছুই ভাবছে। আর উড়ে এসে জুড়ে বসেছে একটা ছেলে, ওই যে নৌকা নে গেল সন্তোষ না কে, সেও দলে ভিড়েছে। আর ওই কানু শম্ভু, দত্তদের ন্যাপলা মায় নবীন ভটচায অবধি এখন

নেতা ছোটবাবু। আর হবেনা কেন ?

গলা নামিয়ে দাসজী বলে এদিক ওদিকে চেয়ে—বড়বাবু মানে ব্রজকত্তাও তলে তলে ওদের মদত দিচ্ছেন গো !

মাধববাবু কথাটা শুনে বলে

—তা জানিহে। সব গেছে কাকাবাবুর, এখন শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলেই জুটেছে।

দাসজী ছোটবাবুকে খুশী করতে জানে, আর ও জানে ওকে খুশী করতে পারলে তারই লাভ। তাই দাসজী বলে।

—ওসব হিংসা ছোটবাবু। বড়বাবু তো পেরায় ফৌত, ঠাকুরের দয়ায় আপনি এখন একটু নাম ডাক বের করেছেন আর অমনি ওর হিংসে শুরু হয়েছে।

মাধববাবু ততক্ষণে বোতলটা খুলে গেলাসে ঢেলে দু'এক চুমুক দিয়ে মেজাজটা বেশ চাগিয়ে তুলেছে, ওর কথায় বলে।

—ওই জন্যেই তো বাঙ্গালীর সব গেল হে ! হিংসে—আর মেজাজ। ওদের সবকিছু মেজাজের দাম আমি মিটিয়ে দেব !

দাসজীও খুশি হয়।

মালপত্রগুলো চড়াদামে বিক্রী করে ওই মৌকায় চারগুণ লাভ করে সেটাকে নিরাপদে রাখতে হবে। দাসজী বলে।

—তাহলে চলি ছোটবাবু, ওদিকে মালপত্তরগুলোর বিহিত করতে হবে। লুটপাট না হয়ে যায় !

মাধববাবু বলে—তাই যাও আর একটু চোখকান খুলে রেখো। এখনতো অরাজক অবস্থা।

—তা যা বলেছেন। দাসজী চুপচাপ বের হয়ে গেল।

মাধববাবুর মেজাজটাও খিঁচড়ে গেছে। সারাদিন ধান্দায় ঘোরে, নগদ বেশ কিছু আমদানী হয়, এখন সে সব বন্ধ। উলটে খেসারতই যাচ্ছে।

হঠাৎ লাবণ্যকে ঢুকতে দেখে চাইল। লাবণ্য তার সংসারের

হাল ধরে আছে, স্ত্রীকে তাই মাধব কিছুটা সমীহ করে। মাধবও আগে তেমন যুৎ করতে পারেনি। লাবণ্য ঘরে আসার পর থেকে তার কারবারের রমরমা বেড়েছে। ধানকলটা ওরই নামে।

লাবণ্য ঘরে ঢুকে মাধববাবুকে মদের গ্লাস নিয়ে বসে থাকতে দেখে বলে

—সকাল বেলাতেই শুরু করেছো ওই সব ছাই পাঁশ গেলা? ওই ভিজেবেড়ালটা দিয়ে গেল বোধ হয়?

দাসজীকে লাবণ্য একদম দেখতে পারেনা। লোকটা ভয়ানক ধূর্ত আর সুযোগসন্ধানী।

মাধববাবু বলে

—জলবন্দী হয়ে রয়েছি, করারও কিছু নাই

লাবণ্য শোনায়—তাই ওই সব নিয়ে বসেছো? একটু নীচে যাওনা, সারা গ্রামের লোক আশপাশের লোকের বিপদ, এসময় একটু দেখবে তো ওদের? কাকাবাবুও রয়েছেন ওখানে—

হাসে মাধববাবু—ওদের দেখার অনেক লোকই আছে। রূপেন মাষ্টার এখন লীডার। ওই করুক ওসব, কাকাবাবুও রয়েছেন।

আর লোকসান গুণকার তো দিচ্ছি। ধানকলের মজুত চাল কতো বের হয়ে যাবে জানো?

লাবণ্য অবাক হয়—কিছু যাক না হয়, পাপের কড়ি কিছু সৎকাজে লাগুক।

চটে ওঠে মাধববাবু—পাপের কড়ি? ওসব বাজে কথাগুলো ওরা বলতে পারে। তুমি বলবে কেন?

হাসে লাবণ্য—আমার ধানকল, আমি যদি কিছু চাল ওদের দিই?

অবাকহয় মাধবঠাকুর—তুমি বলছো কি লাবণ্য? এত চাল বরবাদ করবে?

—না করলে ওরা তো লুট করে নেবে। তার চেয়ে নিজে থেকে দিয়ে দেওয়াই ভালো নয় কি!

মাধব গর্জে ওঠে—লুট করে নেবে? মগের মুলুক নাকি! আমি থানা পুলিশ করবো।

হাসে লাবণ্য—বানের জলে ওসবও ডুবে গেছে, আর আইন? পেটের জ্বালার কাছে আইনও তুচ্ছ হয়ে যায়! তাই বলছিলাম ওদের কাছে যাও, নিজে থেকেই কিছু দেবার কথা বলো, যাতে ওই সব লুটতরাজ না হয়। নইলে সবই চলে যাবে। দেখিগে, ওদিকে কিছু মেয়েরাও এসেছে। ওখানেই যাচ্ছি।

কি ভাবছে মাধবঠাকুর।

লাবণ্যের কথাগুলো ভাবছে সে। দাসজীও ভয় পেয়েছে, আবার তারও মনে হয় লাবণ্যের কথাটা মিথ্যা নয়। ওই জলবন্দী মানুষগুলো সব হারিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষুধাও আছে ওদের, এ সময় তারা মরীয়া হয়ে উঠতে পারে।

—ধ্যাত্তেরি। মাধব ঠাকুরের সব ভাবনাগুলো গুলিয়ে যায়। কি ভেবে বোতল গ্লাস দেরাজে ঢুকিয়ে বের হয়ে এল।

নীচের চাতাল মাঠ ওদিকে কাছারী বাড়ির টানা বারান্দা সব লোকের ভিড়ে থিক থিক করছে। মাঠে এনেছে ওরা গরু বাছুর মোষ ছাগল, ওখানে যেন গোহাটার ভিড় জমেছে। আর চীৎকার কলরব কান্নার শব্দে ওঠে। এ যেন এক নরক কুণ্ডে পরিণত হয়েছে।

মাধববাবু এই জগতটাকে মেনে নিতে পারে না। মনে হয় হঠাৎ শান্তি সমৃদ্ধির দিনগুলো হারিয়ে গেল এই সর্বনাশা বন্যার তোড়ে।

তার জায়গায় যা আসছে তার রূপ আরও সর্বনাশা আরও বিধ্বংসী। তাদের এতদিনের গড়ে তোলা ইমারতের ভিতেও যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা আসবে। তার ফল কি হবে তা জানে না সে।

তবু কষ্ট করে নেমে আসতে হয় তাকে ওই দোতলার বিলাস ব্যসন ছেড়ে।

নবীন ভটচায বানের প্রথম দিকেই কোনমতে এসে আশ্রয়

নিয়েছিল এখানে। ওর গিন্নী অবশ্য অনেক সাবধানী।

বাঁধে হানা পড়ার খবর পেয়েই ও উঠে এসেছিল।

নবীন ভটচায তখন মাঠ থেকে বাঁধে উঠেছে ছড়ানো ছিটোনো মেঠো দেবতাদের মন্দিরে টহল দিয়ে। তারপর বাঁধ থেকে কোনমতে এসে হাজির হয়েছিল এখানে।

গিরিবালা তার স্বামীকে চেনে। তাই বলে—এখন খোঁজ নিচ্ছ যে কোথায় ছিলে এতক্ষণ!

নবীন ভটচায আমতা আমতা করে

—বাঁধে গেছলাম, তারপর! গিরিবালা ধমকে ওঠে—থামো দিকি। ওই ভূষণরা না থাকলে ভেসে যেতাম তা জানো? ওরাই তো তুলে আনলেক উদের ভ্যালায়!

ভূষণ ওপাড়ার বাসিন্দে, ওদের মাছের ব্যবসা। ভূষণ বেশ বিনয়ী। অনেক পুকুরে ওর মাছ ফেলা থাকে। মাছের ব্যবসাতে দুপয়সা কামিয়েছে, কিন্তু সেও বিপদে পড়েছে এখন।

ভূষণরাই তুলে এনেছিল ঠাকরুণকে আর তার ছেলেমেয়েদের। নবীনও এখন বিপদে পড়েছে। তার শালগ্রাম শিলা আর সিংহাসনটাই আনা হয় নি। চমকে ওঠে নবীন।

—বাড়ির ঠাকুর, শালগ্রাম শিলা এসব আনোনি? ভোগও হবে না?

গিরিবালা ওদিকে ছেলেমেয়েদের সামনে চাট্টি চিড়ে ভিজে দিতে পেরেছে মাত্র। পুটি আর কমল তারই ভাগ নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে।

ধমকে ওঠে গিরিবালা

—রাখো তোমার শালগেরাম। উতো পাথর গো। জ্যান্ত নারায়ণ ওই সোনার চাঁদদের মুখে কাল থেকে ভাত দিতে পারিনি আর সে ভাবনা চুলোর দোরে গেল, উনি ভাবছেন পাথরের ঠাকুরের কথা! মরণ আর কি!

নবীন ভটচায চুপ করে গেল দাবড়ানি খেয়ে।

গিরিবালা এসে আশ্রয় নিয়েছে কাছারি বাড়ির একটা এদোঁ ঘরে। ওদিকে ভজনের মেয়ে রাধারাণীও জুটেছে।

চাপাস্বরে গিরিবালা বলে—জাত জন্মোও রইল না, বোষ্টমের সঙ্গে এক ঘরে বাস করছি, আবার নারায়ণ পূজো করবে ?

নবীন বিপদে পড়েছে। ওই নারায়ণ শিলার দোহাই দিয়েই তার রোজকার হতো, পূজো আস্রায় প্রণামীও আসতো। আর সেই পাথরের নুড়িটাই কোথায় হারিয়ে গেল এ সময়।

নবীন তাই বলে গিন্নিকে—আঃ; একটু চুপ করো দিন্! ওই শালগ্রাম হারানোর কথাটা চাউর করোনা বাপু।

গিরিবালা শুধোয়—কেন ?

—আঃ। ওই দিয়েই রোজকার। এখনও মানুষ তবু ওসব মানে টানে। আমি বাপু দেখছি শালগেরাম মেলে কি না।

অবাক হয় গিরিবালা—এখানে ওসব পাবে কোথায় ? প্রতিষ্ঠা করা ছ্যাবতা !

নবীন ভটচায জবাব না দিয়েই বের হয়েছে; একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধববাবুর কনট্রাকটারি ব্যবসা, ওদিকের উঠোনের প্রান্তে নোতুন বাড়ি করার পর পাথর কুচি, রুবল মার্বেল পাথরের কিছু টুকরো গাদা করা আছে।

সেইখানেই এসে খুঁজছে নবীন, যেন অন্য কোন কাজে এসেছে ! কারণ লোকজন এখন সর্বত্রই গিশ গিশ করছে এই সামান্য জায়গাটুকুতে। গ্রামের মধ্যে এইটাই উঁচু আশ্রয়। ওদিকে কাকে দেখে নবীন কানে পৈতা জড়িয়ে প্রাকৃতিক কাজ করছে এমনি ভাব দেখিয়ে বসে পড়ে।

আর তখুনিই নজর পড়ে পাথরটার দিকে। গোলমত একটা কালো পাথরের নুড়ি, ওইতেই কাজ হবে।

বসে বসেই কাদামাখা পাথরটা তুলে জামার পকেটে পুরে নবীন ভটচায উঠে পড়ে।

ভূষণ এসেছিল এদিকে—পিছনেই খিড়কির পুকুর। এখন মাঠ পুকুর সব একাকার হয়ে গেছে। ভূষণ নবীনকে দেখে বলে, —ইখানে কি গো খুড়ো?

নবীন যেন ধরা পড়তে পড়তে রয়ে গেছে। ধূর্ত লোকটাকে বলে।

—পেটটা গড়বড় করছে রে ভূষণ, একটু এসেছিলাম। তা তুই?

ভূষণ বলে—মাছ টাছ অনেক দাপাচ্ছে গো, সব পুকুর ভেসে গেছে। ওই যে।

ভূষণ খ্যাপলা জালটাই ছুঁড়েছে ওই জলে।

নবীন এই ফাঁকে বের হয়ে এল, হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে কুড়োনো সেই কালো মড়মড়ি পাথরের টুকরোটা।

গিরিবালা অবাক হয়। নবীন ওই পাথরটাকে ধুয়ে খানিকটা তেল মাখিয়ে শূন্য আসনে লাল শালু মুড়ে বসিয়ে রাখছে। গিরিবালা শুধোয়—কি গো কানে পৈতে জড়িয়ে হাগতে গিইছিলে। ফিরে এলে কিনা নুড়ি পাথর কুড়িয়ে! আবার সেটাকে বানালে কিনা শালগেরাম!

—চুপ করো! নবীন ধমকে ওঠে!

অবাক হয় গিরিবালা—ইযে ডাঙ্গার মড়মড়ি পাথর গো, এই তোমার শালগেরাম শিলা নারায়ণ!

নবীন বিজ্ঞের মত বলে—সব শিলাই নারায়ণ, শাস্তরে বলে শিলারূপী নারায়ণ, থামো দিকি! যাও শাঁখ বার করো। দাসজী মশায় বল্লেন আজ একশো আট তুলসী চড়াবেন নারায়ণের মাথায়, —কে ছাড়ে পাওনাটা!

যাও, উদ্যোগ করো দিকি! হাঁ করে দাড়িয়ে থেকো না।

গিরিবালা তবু এটাকে মেনে নিতে পারেনা। বলে সে।

—এমনি করে ধর্মের নামে লোক ঠকাবে, ওই নুড়ি কুড়িয়ে এনে

নারায়ণ শিলা বলে চালাবে ?

নবীন বলে ওঠে

—ও ব্যাটা ছুনিয়ার লোককে ঠকাচ্ছে, হরে হম্মে নিচ্ছে, আমি ঠকালেই যত দোষ। থামো দিকি।

নবীন আজ ধর্মের অপার মহিমার সারমর্ম বুঝে নিয়েছে। তাই আজ সে এই পথই নিতে বাধ্য হয়েছে। বলে সে

—ছেলেগুলোর খিদেয় ভাত জোটাতে হবে না ?

গিরিবালাও চুপ করে গেল।

রাধারাণী সেই কাছারিবাড়ির ঘাটে নৌকা থেকে নামতে দেখেছিল বলিষ্ঠ ছেলেটাকে। এগিয়ে যায় কি ব্যাকুলতা নিয়ে।

থমকে দাঁড়িয়েছিল রাধারাণী !

ওই ছেলেটি তার খুব চেনা। কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যে কর্মব্যস্ত সন্তোষ তাকে দেখেনি। হয়তো দেখেছিল তবু না চেনার ভাণই করে আবার নৌকা নিয়ে ওই তুফানের মধ্যে এগিয়ে গেছে জলবন্দী মানুষদের উদ্ধার করতে।

ওই কাজটাই বোধহয় তার কাছে তখন বড় হয়ে উঠেছে। তুচ্ছ একটি মেয়ের দিকে চাওয়ার চেয়েও। সরে এসেছে রাধারাণী ওখান থেকে। ওর যেন চলারও শক্তি নেই।

ক'বছর আগেকার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে নদীর ধারে অর্জুন-বট-অশত্থের ছায়া ঘেরা একটি গ্রাম, ওই সন্তোষের কথা।

মোটামুটি সচ্ছল সংসার, সন্তোষ নিজেই জমিজারাতের কাজ দেখতো। ঘাটের ইজারাদারের নৌকা বাইতো বর্ষার মরশুমে, আর ছিল শাশুড়ী।

রাধারাণী নোতুন বৌ হয়ে সে বাড়ীতে গেছল। এখনও মনে পড়ে বিয়ের সেই স্মৃতিটুকু। অতীত জীবনের সেই স্মৃতির টুকরোগুলো উজ্জ্বল হয়ে থাকে মনের মণিকোঠায়, যেন তাদের কাছে

এসবগুলো অনেক দামী সম্পদ। আড়ালে শুধু একা একা এগুলোর অস্তিত্বের সংবাদে খুশী হয় রাধারাণী।

লালচেলী পরে গহনায় সেজে ওই বাড়িতে পা দিয়েছিল রাধারাণী। শাঁখ বাজায় প্রতিবেশীরা।

—ওমা এযে ধিঙি মেয়ে লা? লোতুন বৌ কি র‍্যা সন্তোষ? চমকে ওঠে রাধারাণী ওই সম্ভাষণ শুনে। বাবার ঘরে মানুষ। মা মারা যাবার পর থেকেই সংসারের বোঝা টেনেছে। মায়ের অভাবটা তার মনে ছিল। কিন্তু ভেবেছিল শাশুড়ীই হবে তার নোতুন মা।

কিন্তু তার ওই বচনে চমকে ওঠে রাধারাণী। চেয়ে দেখছে ওকে, লাল কঠিন মাটির মতই পাকানো শক্ত চেহারা, মনটাও বোধ হয় অমনি নির্মম। ওকে চাইতে দেখে ধমকে ওঠে শাশুড়ী

—গুরুজনদের পেন্নাম করতে হয় সেটাও শেখায় নি তোমার বাবা। কেত্তন গেয়েই পেট চালায়—সহবৎ কি শেখাবে?

রাধারাণী চুপ করে মাথা নুইয়ে একে একে প্রণাম করে ওদের শুকনো গলায় শাশুড়ী বলে—থাক, থাক, হয়েছে।

সন্তোষ অবশ্য তেমন নয়। রাতের বেলায় রাধারাণীর চোখে জল নামে। দিনের বেলায় জল ফেলার সুযোগ নেই। সন্তোষও দেখেছে সেটা। তাই ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে।

—মায়ের কথাবাত্তা এমনিই। তুমি কিছু মনে করোনা, দু'চার দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাধারাণীও চেষ্টা করেছিল মানিয়ে নেবার। তবু শাশুড়ীর মন পায়নি। কারণটা অবশ্য রাধারাণী ঠিক জানতো না। পরে জেনেছিল।

ওই গ্রামেই উত্তরপাড়ায় কোন ধনী চাষীর একমাত্র খোঁড়া মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজেরাই তার সবকিছু দখল করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা হয় নি।

সন্তোষই দেখে শুনে বিয়ে করেছিল মায়ের অমতে। তাই বুড়ি তাকে মেনে নিতে পারে নি। দিনরাতই বাক্যবাণে তাকে বিঁধতো!

রাধারাণীর বাবার কথা মনে পড়ে। তখন পাণ্ডবেশ্বরের ওদিকেই ছিল ভজনদাসের বাড়ি। বাবার ওখানে রাধারাণী তবু শান্তিতে ছিল। নিজের ঘর বাঁধতে এসে এমনি যন্ত্রণায় পড়বে ভাবেনি। ভজনও সেবার মেয়েকে দেখতে গিয়ে অপমানিতই হয়েছিল বুড়ির কাছে। শাশুড়ী বলে ওঠে।

—যাযাবরের মত খোলকত্তাল নে গাঁয়ে গাঁয়ে কেত্তন গাওয়া ভিখেরীর মেয়েও যেমন বাপও তেমনি। তার আবার ঘন ঘন আসা কেন! পেট পালার জায়গা নাই তাই আসা হয়।

চমকে ওঠে ভজন, ওদিকে কীর্তন গাইতে গেছল ময়নাডালে। তাই পথে মেয়েকেও দেখতে গিয়েছিল। ওরশাশুড়ীর কথায় ভজনদাস অপরাধীর মত বলে—ঠাকুরের নাম গাই বেয়ান ঠাকরুণ। একটা পেট, তার জন্য ভাবনা নাই। মেয়েটাকে দেখিনি অনেকদিন, তাই দেখতে এসেছিলাম। দেখা হল, যাচ্ছি।

রাধারাণী বাবাকে জল খেতে দিতে এসেছিল। নাড়ু মুড়কি আর জলের গ্লাশ রয়েছে হাতে। কিন্তু ভজনদাস বলে।

—ও সব থাক মা। আমি যাচ্ছি। আর দেখে গেলাম কেমন সুখে শান্তিতে আছিস তুই!

রাধারাণীর চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসে। ভজনদাস বলে ওঠে

—বেয়ান ঠাকরুণ, যদি বৌকে শান্তিতে রেখে দুমুঠো ডাল ভাত দিতে না পারেন, আমার কাছেই পাঠাবেন। নিজের মেয়েকে খেতে পরতে দেবার সাধ্য ঠাকুর আমাকে দিয়েছেন। চলি!

ভজনদাস জল গ্রহণ না করেই বের হয়ে আসে। আর তারপর বুড়ি গলা সপ্তমে তুলে চড়াও হয় রাধারাণীর উপরই।

—বাবা সোহাগীর দেমাক কত? দোব এইবার দূর করে।

সন্তোষও বাড়ি ফিরে সব কথা শুনে অবাক হয়। মাকে বলে সে—একি করলে মা?

যেন আগুনে ঘি পড়েছে। দপ্ করে আগুনটা লাফিয়ে ওঠে। মা এবার জ্বলে ওঠে

—কি আশ্চর্য্য কথা বলেছি র‍্যা? এ্যাঁ! বৌ-এর হয়ে তুইও ঝগড়া করিস আমার সঙ্গে?

তারপরই শুরু হয় আর্তনাদ। সন্তোষের বাপের আত্মাকে যেন স্বর্গলোক থেকেই নামিয়ে আনবে সে। গলা তুলে বুড়ি চীৎকার শুরু করে।

—ওগো তুমি কোথায় গেলে গ! একি শত্তুরপুরীতে ফেলে গেলে গ—

রাধারাণী নিজেকেই অপরাধী মনে করে। সন্তোষও গর্জে ওঠে এবার রাধারাণীকেই।

—থাকো ঘর সংসার নে, যেদিকে দু'চোখ যায় আমি চলে যাবো। দিনরাত এই অশান্তি ভালো লাগেনা।

কথাটা রাধারাণীই বলেছিল—তুমি কেন যাবে? যেতে হয় আমিই যাবো। আমি তো বাইরের লোক। আমার জন্যেই এত জ্বালা, আমি না হয় বিদেয় হবো।

রাধারাণীর দুচোখ ফেটে জল আসে। সন্তোষ তিতিবিরক্ত হয়ে গর্জে ওঠে

—তাই যাও, না পারো গলায় দড়ি দিয়ে, বিষ খেয়ে মরো। মরলেই শান্তি পাই।

সব কথা ভাবলে রাধারাণীর আজও দুচোখ জলে ভরে আসে। তার ক'দিন পরই রাধারাণীকে চলে আসতে হয়েছিল ও বাড়ি থেকে। আর বুড়ি এমনিই তাকে ঘর থেকে বিদেয় করেনি, চরম অপবাদ দিয়েছিল। ও নাকি নষ্টা, নষ্টা বৌকে ঘরে রাখতে সে পারবে না। আর সেই সুখবরটা

সে লোক মারফৎ পাণ্ডবেশ্বরে ভজনদাসের পাড়াতেও পাঠিয়েছিল।

চমকে ওঠে ভজনদাস—এ কখনই হতে পারে না।

কিন্তু তার পাড়ার গদাই, মতির মা, যাদব এরা আড়ালে হেসেছিল। ভজনদাসও শুনেছিল ওদের টিটকারীটা।

সেইসময় রাধা ফিরে এসেছিল তার কাছে। অব্যক্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রাধা—এসব মিথ্যে কথা বাবা।

ভজনদাস দেখছে তার মেয়েকে। সোনার প্রতিমা যেন ক'মাসেই বিবর্ণ হয়ে গেছে। মুখে চোখে দুঃখের জমাট কালো ছায়া নেমেছে। কি বেদনার্ত ওর চাহনি, কোন কলঙ্কের দাগ সেখানে সে দেখেনি।

ভজনদাস মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বলে।

—আমি জানি মা। এসব মিছে কথা। ওরা যা বলে বলুক, আমি জানি আমার রাধারাণীর কোন দোষ নেই।

ভজন বলে—দরকার হয় এখান থেকে চলে যাবো মা। রূপগঞ্জের বড়গোঁসাই আমার গান শুনে বলেন, এখানে এসো ভজন, ভিটে জমি সব দোব। ওখানেই দেবতার মন্দিরে কীর্তন গেয়ে মায়ে পোয়ে দিন কাটাবো মা। তাই চল।

ওখান থেকে ভজনদাস রাধারাণীকে নিয়ে চলে এসেছিল এখানে। ব্রজদুলালবাবুদের জমিদারী তখন যাই যাই করছে, জমি জায়গা বেহাত হয়ে যাচ্ছে। সেই সময় তিনিই ভজনদাসকে কিছু জমি ভিটেটা দিয়ে এখানের বাস কায়েম করান।

রাধারাণী এখানে এর আগে বন্যার এত জল দেখেনি, রাধারাণীও নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে আসে। ভজন বলে—চুপচাপ আছিস, শরীর খারাপ করছে নাই ত? বাদলা বৃষ্টিতে ভিজলি। তা হ্যাঁরে খাবার দাবার কিছু আছে? চাল-ডাল কিছু আনতে পেরেছিল।

রাধারাণী বলে—তা আছে। কিন্তু কাঠ-ফাট কই, সেদ্ধ করবো কিসে?

এ এক সমস্যা। এমন সময় ব্যাং কোত্থেকে দুটো ডাল এনে বলে—পেইচি গো মূল গায়েন। বানে ভেসে টেসে এসেছে।

চমকে ওঠে ভজন—এ্যা! এ যে শ্মাশানে চিতের আধপোড়া কাঠ রে?

হাসে ব্যাং—শালো আগুনে পুড়লে অগ্নিশুদ্ধ হবেক গো। এখন ইসব দেখলে চলে? সরো দিকি তুমি! আমি দেখছি।

রাধারাণীর এত দুঃখেও হাসি আসে।

ব্যাং আগুন জ্বেলেছে বাইরের দাওয়ার নীচে। চালে ডালে সেদ্ধ হচ্ছে। রাধারাণীর চোখের সামনে তখনও ফুটে ওঠে সন্তোষের কথা।

শুধোয় সে—হ্যারে ব্যাং, কারা ভিনগাঁ থেকে বানে ভেসে এসেছিল না?

ব্যাং জবাব দেয়—সারা দুনিয়ার লোক ভেসে গেল তা কোত্থেকে কে এল তার খপর কে রাখছে বলো? ই বাড়ি শ্লা হাটতলা হই গেছে গ, যেন দইদে বৈরাগীতলার মেলা লেগেছে।

তা দাসজীও খপর লিচ্ছিল লোতুন লোকটার, শোনলাম ভীমগাড়ার উদিক থেকে চালে থেকে লোক বাঁচাতে যেয়ে সটান ভেসে এসেছে উরো।

চমকে ওঠে রাধারাণী, তার হিসাব যেন সঠিক মিলে যাচ্ছে।

শুধোয় সে—ভীমগাড়া থেকে এসেছে ওরা?

ব্যাং উনুনে ফুঁ দিতে দিতে নাজেহাল হয়ে গেছে। ভিজে কাঠ জ্বলবার নাম নেই। বিরক্ত হয়ে ব্যাং শুধোয়—এত বেত্তান্তে তুমার কি দরকার বলো দিন!

রাধারাণী যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে, তাই ব্যাপারটাকে হাল্কা করবার জন্য বলে—এমনিই শুধোচ্ছিলাম।

কথাটা চাপবার চেষ্টা করে তবু মন থেকে ব্যাপারটা মুছে ফেলতে পারেনা। দাসজী মশায়কে চেনে সে। লোকটাকে ওর খোঁজ নিতে

শুনে শুধোয় রাধারাণী—তা দাসজী ওর খপর নিচ্ছিল কেন রে ?

ব্যাং বলে ওঠে—দাসজী যাবে লা নিয়ে ওর মাল সামলাতে আর রূপেন ম্যাষ্টার ওই ছেলেটা বলে আগে বাঁধ থেকে লোক আনবো তারপর তুমার মালপত্তর হে। দাসজী চেপে বসেছে লৌকায় তা ওই ছোকরা কিনা ঠেলে নামালেক, আর দাসজী কাদায় পড়ে আলুর দম হই গেল গ !

...তাই রেগে মেগে গেছে দাসজী। মাধববাবুও দেখেছে ব্যাপারটা, ও বাছাধনকে এবার ছ্যাখোনা কি করে !

রাধারাণী মনে মনে খুশী হয়। বলে সে—এত লোককে বাঁচাইছে ওরা কি করবে তার ?

বলে ব্যাং—উরা তো লোক সুবিধের লয় গো।

কেন জানে না রাধারাণীও ভাবনায় পড়ে। ওদের সেও চেনে। আর সাবধানেই থাকে ওদের নজর এড়িয়ে।

আরে হোল ডিস্ট্রিক্ট এমনি করে জলের তলে তলিয়ে যাবে। ব্যাড প্ল্যানিং !

...কেশব মিত্তির গলা তুলে চীৎকার করছে চত্বরে দাঁড়িয়ে।

লোকগুলো তুদিন ধরে এখানে আটকে পড়েছে আর বৃষ্টিও ধরেনি। ওদিকে জলের সীমানা স্কুলবাড়ির ভিতে এসে যেন জমে গেছে। এতটুকু কমেনি, বাতাসে ওঠে স্রোতের একটানা গর্জন। তার মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসে কাদের করুণ আর্তনাদ।

—বাঁচাও।

ঘাটের নৌকা মাত্র তুখানা, তাও ছোট নয়। ফলে এখন ওই নৌকা নিয়ে সর্বত্র যাওয়া যাচ্ছেনা। বিরাট বাড়ির দেওয়াল, মস্ত মস্ত তুবন্দী, চারবন্দী চালগুলো ধ্বসে পড়েছে জলে, সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আর জলও বয়ে চলেছে গ্রামের উপর দিয়ে কোথাও চার হাত—কোথাও সাত আটহাত।

ফলে অনেকেই গাছে, ওই ধ্বসে পড়া চালার উপরই বসে আছে আটক পড়ে।

সন্তোষ বলে—দু' চারটে গুড়ের ডাবা পেলে তবু তোলা যেতো কিছু লোককে! নৌকাতো যাচ্ছে না মাষ্টারবাবু।

রূপেন মাষ্টার আরও ক'জন কোত্থেকে দুটো বড় গুড় জ্বালানী কড়াই এনেছে, কিন্তু প্রবল স্রোতে সেগুলো রাখা যাচ্ছে না।

সন্তোষও এদের সঙ্গে এই উদ্ধারের কাজে এসে জুটে গেছে। রূপেন বলে—এতবড় ঝক্কি নিয়ে কাজ নাই, নৌকা ডিঙ্গিতেই যা হচ্ছে হোক সন্তোষ।

···দুদিনে ওর চেহারাটা জলে কাদায় বদলে গেছে। গালে উস্কোখুস্কো দাড়ি। রূপেন বলে—তুমি তবু এসে অনেক বড় কাজ করেছো সন্তোষ।

সন্তোষ বলে—কিই বা করলাম। এখনও অনেক জলবন্দী মানুষ পড়ে রইল, রিলিফও আসছে না। এর পর এদের খাবার কোথায়, আশ্রয়ই বা কোথায়?

রূপেনও তাই ভাবছে। ব্রজদুলালবাবুও এই বৃষ্টির মধ্যেও এসে এদের খবরাখবর নেন। বলেন তিনি—রিলিফ আসবেই। সেই দু'একটা দিন এদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

কেশব মিত্তিরও এসে পড়েছে এখানে। দুদিনে ওর চেহারাটা আমূল বদলে গেছে। মুখে এক মুখ দাড়ি। চোখদুটো যেন কোটরে জ্বলছে। কেশব মিত্তির বলে—ওরা বাঁচবে? কি লাভ এ ভাবে বেঁচে ব্রজবাবু? আমি বেঁচে আছি? নো-নেভার। এ ডেড সোল।

ওর দিকে চাইল। রূপেনদের নৌকা চলেছে ওদিকের ধানকলে। বড় রাস্তায় যদি কোন রকমে খবর পাঠাতে পারে চেষ্টা করবে ও। আর সদর থেকে শুধুমাত্র, রিলিফ-এর চাল গম হয়তো এসেছে—তাই আনতে হবে।

কেশব মিত্তির বলে—আমি যাবো।

লাফ দিয়ে উঠেছে নৌকায়। সন্তোষ অবাক হয়।

—আপনি কোথায় যাবেন ?

কেশব মিত্তির ধমকে ওঠে—সাট্ আপ! জানো আমি কে? রূপগঞ্জের মিত্তির কত্তাকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হচ্ছে? আমার বাড়িতে যাবো। এখানে এই গোয়াল ঘরে আমি থাকি না! চলো—

...সন্তোষ চাইল রূপেনের দিকে। কেশব মিত্র বলে—ওঠো নৌকায়! এ্যাই!

রূপেন বলে—নেমে আসুন মিত্তিরমশাই, বাড়ি এখনোও জলের তলায়, যাবেন কোথায়!

কেশব মিত্তির ধমকে ওঠে—মিত্তির প্যালেস জলের তলায় যাবে? এঁ্যা—মুখ সামলে কথা বল রূপেন।

ধীরাও এসে হাজির হয়েছে চীৎকার চেঁচামেচি শুনে।

বাবার পাগলামি ইদানীং বেড়েছে। ধীরা ওদের নৌকায় উঠে বাবাকে বকাবকি করতে দেখে বলে—বাবা, কি করছো? ওদের কাজে বাধা দিও না! নেমে এসো।

—সাট আপ! ধমকে ওঠে কেশব মিত্তির—আমার যথাসর্বস্ব পড়ে আছে আর এখানে আস্তাকুড়ে থাকবো আমি! ওই মেধো বলে কিনা আমি ফোত! এখনও মিত্তির বংশের সম্পদের খবর ওরা জানেনা।

কোনরকমে টেনে নামালো নৌকা থেকে লোকটাকে।

ধীরা বলে—কিছু মনে করো না রূপেনদা।

রূপেন বলে—না, দেখছি মিত্তির মশাই এমন তো ছিলেন না।

ধীরাও দেখেছে সেটা। বাবা ক'দিনেই বদলে গেছে। লোকটা বোধ হয় এবার সব হারিয়ে পাগলই হয়ে যাবে।

তখনও কেশব মিত্তির চীৎকার করছে—আমি দেখিয়ে দেব ওই রূপেনকে—ছ্যাট ননসেন্সকে। আমার মুখের উপর কথা বলে।

ধীরা চারিদিকের লোকগুলোকে দেখছে। তারা যেন এত দুঃখের

মাঝে বিমিপয়সার মজা দেখতে ভিড় করেছে। ধীরা বলে

—চলো বাবা!

—না! তোর ওই নষ্টামি দেখতে এখানে বসে থাকবো না। নেভার। এখনও মিত্তির বংশের দৈন্যদশা আসেনি।

মাধববাবু শ্রীধর দাস এসে পড়েছে। দাসজী শুধোয়—কি এত গোলমাল হচ্ছে?

মাধববাবু ধীরাকে দেখে এগিয়ে আসে। চেনে সে ধীরাকে।

কোথায় মাধব ঠাকুরের মনের অতলে একটা নীরব লোভের ছায়াও আছে। সেটা সোচ্চার না হলেও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে ধীরাও। স্কুলের সেক্রেটারী এখন মাধববাবু। তার চাকরীর জন্যও ছ'একবার এসেছে ধীরা। আজ ধীরাকে দেখে মাধববাবু বলে

—তুমি যাও। আমি মিত্তিরমশাইকে নিয়ে যাচ্ছি। ভেরী স্যাড। যাক্ কি করা যায় দেখি।

ধীরা এতখানি সাহায্য চায়নি। কিন্তু মাধববাবু যেন এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে চায়। তাই কেশববাবুর ব্যাপারে আর ধীরার ব্যাপারে একটু বেশী উৎসাহী এবং সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে।

মাধববাবু কেশববাবুকে নিয়ে ধীরাদের আশ্রয়স্থানে এসে অবাক হয়। কাছারীবাড়ির পেছনকার মহল এটা। এককালে আমলা ফৈলাদের এবং চাকরবাকরদের আশ্রয় ছিল এখানে। ঘরগুলো যত্নের অভাবে এখন ধ্বংসপুরীতেই পরিণত হয়েছে। দেওয়ালের চুণ পলেস্তারা নেই—মেঝেতে কারা গরু বেঁধে বেঁধে খাল ডোবা করে দিয়েছে।

মাধববাবু অবাক হয়—এখানে রয়েছো ধীরা?

ধীরা বলে—ক'টাদিন কোনরকমে চালিয়ে নেব। ভাবছি বান কমলে বাবাকে নিয়ে দুর্গাপুরে দাদার ওখানে চলে যাবো।

মাধববাবু বলে—আমি বরং অন্য ঘরের ব্যবস্থা করছি। আমার

নীচেকার ওদিকের ঘর তো খালিই আছে। এখানে থাকলে মিত্তির মশাই আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

বাবাকে নিয়ে ধীরা ভাবনায় পড়েছে। বলে সে—ক'দিনের মধ্যেই বাবার মাথাটা যেন খারাপ হয়ে গেছে।

মাধববাবু ওকে দেখছে। ধীরাও নিজেকে অসহায় বোধ করে। নিজের জন্য নয়, বাবার জন্যই তার সব ভাবনা। এসময় করারও কিছু নেই। আর ওই বাড়ি থেকে আসার সময় চাল-টাকাপয়সাও কিছু আনতে পারে নি তারা।

কাল থেকে বাবাকে তেমন কিছু খেতে দিতেও পারেনি। এসব কথা জানাতে পারেনি ধীরা।···তবু মাধববাবুর কাছে কোন কৃতজ্ঞতা নিতে বাধে।

বলে ধীরা—না। অসুবিধা তেমন কিছু হয় নি। রূপেনদারা দেখছেন সব।

—অ। মাধববাবু রূপেনের নাম শুনে একটু ক্ষুব্ধ হয়।

হঠাৎ কেশব মিত্তিরকে জল কাদায় ভিজে অবস্থায় ঢুকতে দেখে চাইল। মিত্তির বলে

—ছ্যাখ চাল নেই তোর। আমি নে এলাম খাবার। কচু!···কচু সেদ্ধ কর!

—বাবা! ধীরা বাবাকে দেখে চাইল।

লোকটাকে এখন ওই দাড়ি গোঁফ ঢাকা জল কাদা মাখা অবস্থায় ঠিক পাগলের মতই দেখাচ্ছে। কেশব মিত্তির হঠাৎ মাধববাবুকে দেখে থেমে গেল। বিড় বিড় করে সে—তুমি! মাধব বাবু!···এখানে?

মাধববাবুও ওর চাহনির সামনে ঘাবড়ে গেছে। লোকটা যেন ধ্বংসস্তূপের মতই দাঁড়িয়ে আছে মাধববাবুর সামনে। বন্যা অতীতের অনেক কিছুকেই এমনি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

মাধববাবু ধীরার দিকে চেয়ে বলে—আমি যাই ধীরা। কথাটা ভেবে পরে জানিও। অবশ্য রূপেনরা দেখ ভাল করছে, ভালোই!

কেশব মিত্তির দেখছে লোকটাকে চলে যেতে। ধীরার দিকে চেয়ে থাকে সে। মাধববাবুকে এখানে দেখে যেন জ্বলে ওঠে কেশব মিত্তির!

—ও কেন এসেছিল? ওই শয়তানটা?

ধীরা লজ্জা পায়। বোধহয় মাধববাবুও কথাটা শুনেছে। ধীরা বলে।

—তোমার উপকার করতে চান আর ওদের নামে যা তা বলো তুমি!

কেশব মিত্তির ধমকে ওঠে—এমন উপকারে দরকার নাই। কেন আসে তা জানি। তাই তোকেও সাবধান করছি। আই ওয়ার্ন ইউ!

ধীরা লোকটার কথায় চটে ওঠে। কোন মুরোদ নেই—আজ সব হারিয়ে উপবাস দিয়ে চলেছে তবু যেন এতটুকু বোধ তার নেই। এই মেজাজের জন্য নিজের ছেলেকেও পর করেছে, বিষয় আশয় সব হারিয়েছে, আজ ধীরাকেও বন্দী করে রেখেছে অনাহার আর যন্ত্রণার মাঝে। ও যেন ধীরার জীবনের একটা গ্রহ, যে তার সামনে এনেছে বঞ্চনা—যন্ত্রণা আর দুর্ভোগ!

ধীরা কঠিন স্বরে বলে—ওসব বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। এতবড় বিপদের মাঝে বাঁচার পথ কিছু দেখাতে পারো নি, মরবার পথটাই আমাকে বেছে নিয়ে নিষ্কৃতি দাও বাবা!

ধীরার কণ্ঠস্বর কি দুঃসহ বেদনায় বুজে আসে। কেশব মিত্তিরও চমকে উঠেছে। দেখছে সে ধীরার ডাগর দুচোখে জলের ধারা।

উত্তেজিত লোকটা যেন অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করে কি বলতে চায়।

মাধববাবু, শ্রীধর দাস, এককড়ি দে, গৌর হালদাররা এতদিন গ্রামের সব ব্যাপারেই কর্তৃত্ব করেছে। আজ রূপেনকে এ ভাবে

এগিয়ে এসে এই বিপদের মোকাবিলা করতে দেখে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছে তারা। সাধারণ মানুষ—ওই বন্যার্ত লোকগুলো আজ রূপেনকেই জেনেছে তাদের আপনজন বলে।

নাহলে দাসজীকে প্রকাশ্য অপমান করতে সাহস করে রূপেন।

মাধবও দেখেছে ব্যাপারটা। ধীরার ব্যাপারে তাই মাধববাবু আজ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মেয়েটার ডাগর চোখ নিটোল স্বাস্থ্য মাধববাবুর মনে একটা নেশা জাগায়। এসব অনুভূতিগুলো তার নিজস্ব। আর বাইরে তার কোন প্রকাশও থাকে না। সাবধানী মাধববাবু তাই হিসাব করে এগোতে চায়।

দাসজীকে বলে—ইস্কুলটাকে তুলতে হবে। আর রিলিফ-এর জন্য সদরে খবর পাঠিয়েছি। তোমাকেই এসবের ভার নিতে হবে দ্বিজেন।

দ্বিজেনকে ডেকে এনেছে শ্রীধর দাসই, অবশ্য মাধববাবুর কথাতেই। মাধববাবু জানে রূপেন-এর ওই বন্ধুমহলে কর্মীমহলে দ্বিজেনই অন্যতম। সেও স্কুলের শিক্ষক। আর রূপেনের মত কঠিন ধাতের নয় দ্বিজেন।

চতুর মাধববাবু বলে—অবশ্য এবার বন্যার পর স্কুল চালু হলে তুমি বি-এড পড়ার ব্যবস্থা করো। আমিই ছুটির ব্যাপারটা করে দেব। ফিরে এলে তুমিই হেডমাষ্টার হবে।

দ্বিজেন কি ভাবছে।

রূপেনই এখন ওই পদটাতে অস্থায়ীভাবে কাজ করছে স্কুলে। দ্বিজেন মনে মনে খুশী হয়। তবু বলে—রূপেন তো রয়েছে।

হাসে মাধববাবু—গার্লস স্কুলটাও এবার মাধ্যমিক হবে। সেটার ভার নেবে তুমি। অবশ্য রূপেন হেডমাষ্টার থাকছে না—নোতুন হেডমাষ্টার আনা হবে।

দ্বিজেন চুপ করে থাকে।

শ্রীধর দাস বলে—সেদিক থেকে দ্বিজুবাবু আমাদের যোগ্য ছেলে। ভদ্র নম্র শিক্ষিত!

দ্বিজেনও ভেবেছে কথাটা। এতদিন সে বহুকষ্টে পড়াশোনা করেছে। অভাবের সংসার। আজ কোনরকমে পাশ করে সে মাধববাবুকে ধরে স্কুলের মাষ্টারিটা পেয়েছিল। তাও তাকে সই করতে হয় পাঁচশো টাকা—হাতে পায় সাড়ে তিনশো টাকা। সেটা অবশ্য দাসজীও জানে।

দ্বিজেন আজ হেডমাষ্টারীর স্বপ্ন দেখছে। নগদ সাতশ টাকা আন্দাজ পাবে, আর তাতে কোন কাটাকাটি থাকবে না। তবে মাধববাবুদের মতেই চলতে হবে।

রূপেনকে দেখেছে ধীরে ধীরে মাথা তুলতে।

দ্বিজেনেরও কোথায় যেন হিংসা হয় রূপেনের এই জনপ্রিয়তার জন্য। তবু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারেনা দ্বিজেন। রূপেনের নির্দেশ মেনে তাকেও চলতে হয়।

সামনে একটা সুযোগ। দ্বিজেন বুঝেছে চেষ্টা করলে সে উপরে উঠতে পারবে। আর দাসজী মাধববাবুদের কাছ থেকে সেই মদতও পাবে সে।

দ্বিজেন নেমে আসছে কি নোতুন ভাবনা নিয়ে।

হঠাৎ রূপেনকে ওদিকে দেখে থামল সিঁড়ির মাথায়। মাধববাবুর মহল থেকে পুরোনো বাড়ির ওই গিঞ্জি মানুষের ভিড়েভরা জায়গাটা দেখা যায়। রূপেনকে ধীরাদের ওখানে ঢুকতে দেখে দ্বিজেন থমকে দাঁড়ালো।

রূপেন খবরটা শুনেছে। মিত্তিরমশাইকে দেখেছে বিভ্রান্তের মত ঘুরতে। তাছাড়া এখানে আসার পর রূপেনও তেমন খবর নিতে পারেনি ধীরাদের। নানা কাজে ব্যস্ত। এখনও দুচার জায়গায় লোকজন গাছে ঘরের চালে আটকে আছে। তাদের আনতে হচ্ছে। রিলিফের ব্যবস্থা হিসেবে নোঙরখানা চালু করেছে। তার জন্যে চাল ডাল চাই। রিলিফের ব্যাপারেও এই জল বান ঠেলে সদরে গেছল সে।

ফিরে এসেই মিত্তিরমশাই-এর খবর শুনে উঠে আসে।

ধীরা বাবাকে নিয়ে বিপদে পড়েছে। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে। এদিক ওদিকে চলে যায়। যাকে তাকে যা তা বলে। আবার ফিরে এসে জ্বরের উত্তাপ নিয়ে বিছানায় পড়ে।

ধীরা চাইল রূপেনকে দেখে। ধীরা বলে—কি ব্যাপার? মনে পড়লো এতক্ষণে আমাদের কথা?

রূপেন বলে—নানা কাজে ব্যস্ত। কেন দ্বিজু-সন্তোষ-নীরু এরা আসেনি? আমি সবে সদর থেকে ফিরে শুনলাম মিত্তিরমশাই-এর অসুখ!

ধীরা বলে—তবু ভালো যে এসেছো!

রূপেন বলে—এসময় করারও কিছু নেই। দু'চারদিন কোন রকমে কাটাতে হবে। তারপর পথঘাট চালু হলে কিছু ব্যবস্থা হবে।

বিষণ্ণ ম্লান হাসিতে মুখটাকে করুণ করে ধীরা বলে—কি ব্যবস্থা হবে জানিনা। সামনে আরও বিপদ আরও দুর্দিন তাই জানি।

রূপেনও ওকে সান্তনা দিতে পারে না। এই সামগ্রিক বিপর্যয়েব মুখে সে দিশাহারা হয়ে গেছে।

তবু রূপেন বলে—পথ একটা হবেই ধীরা।

ওদিকে সামান্য আয়োজন—চাল বলতে মোটা খুদ। কিছু কচুশাক।

রূপেন বলে—উঁান অসুস্থ। কিছু ট্যাবলেট না হয় নরেন ডাক্তারকে একবার পাঠিয়ে দিই। আর চাল ডাল কিছু—

হাসে ধীরা—ভিক্ষে দিতে চাও?

চমকে ওঠে রূপেন। ধীরা যেন তাকেও ভুল বুঝতে চায়। রূপেন বলে—একি বলছো? তোমাদের আমার ওখানেই উঠতে বললাম। তবু এই হাটের ভিড় থেকে একটু নিরিবিলিতে থাকতেন উনি শান্তিতে, তা গেলে না। আবার চাল ডাল আনার কথায় এসব কেন বলছো?

চুপ করে থাকে ধীরা। তার ওখানে এভাবে যেতে চায়নি।

হয়তো কথাই উঠতো গ্রামে। অনেক রকম কথা। ধীরার মনের অতলের সেই দুর্বলতাটাই অন্তরায় হয়েছিল। রূপেনের কথার স্বরে সেই আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। হয়তো ও নীরবে দূরে থেকেও ধীরাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। ধীরার তা নেবার অধিকার নেই, কোথায় একটা লজ্জা এসে বাধা দিয়েছিল দুহাত ভরে সেই প্রসাদটুকু নিতে।

ধীরা বলে—না। তা বলছি না। তুমি ভুল বুঝো না। তবে বাবা এসব অবস্থার মধ্যে কোনদিন পড়েননি কিনা।

রূপেন তা জানে। দেখেছে ওদের সমৃদ্ধিটাকেও। আজ নিঃস্ব তারা।

রূপেন বলে—তবু বাঁচার জন্য অনেক কিছু কষ্ট সইতে হয় ধীরা। চলি—ওগুলো পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। দরকার হয় খবর দিও। এখনও বেশ কিছু লোক আটকে আছে—যাওয়া যাচ্ছেনা সেখানে। তাদের আনতেই হবে।

রূপেন চলে গেছে। তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে কথাটা ভাবছে ধীরা। মনে হয় রূপেন এখন অনেকের ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে ধীরার মনের মান অভিমান—তার কথা ভাবার সময় রূপেনের নেই।

হঠাৎ দ্বিজেনকে দেখে চাইল ধীরা।

দ্বিজেন এসেছে তৈরী হয়েই। জানে সে এসময় কিসের দরকার। ধীরা-রূপেনের সম্পর্কটা সে জানে। তবু আজ দ্বিজেনের মনে হয় কোথায় যেন ওদের মধ্যে অদৃশ্য একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। নাহলে রূপেনদের বাড়িটা এখনও ডোবেনি। সেখানেই উঠতো ধীরা। কিন্তু তা যায় নি।

ধীরা বলে—ওসব কি এনেছো ?

দ্বিজেন মাধববাবুর ভাঁড়ার থেকে কিছু সরু চাল, আলু, পিয়াজ, দুটো পেঁপে এনেছে। আজ ওই সামান্য জিনিষই যেন মহার্ঘতম বস্তু।

দ্বিজেন বলে

—ওঁর জন্য আনলাম। এগুলো রেখে দাও।

দ্বিজেন সেই ভোররাত্রে ওদের তুলে এনে প্রাণ বাঁচিয়েছে।

ধীরা চাইল ওর দিকে। দ্বিজেন বলে—দু' একদিনের মধ্যেই ও বাড়িতে ফিরতে পারবে। তবে বাড়িটা পরিষ্কার করার ব্যাপার আছে।

ধীরা জানায়—দেখা যাক কি হয়।

দ্বিজেন দেখেছে ধীরাকে। ক'দিনেই ওর সুন্দর চেহারায় এসেছে ম্লান বিবর্ণতা। চোখের কোলে এসেছে কালির দাগ। তবু ওই রুক্ষতার মাঝে যেন একটি ক্লিষ্ট সুন্দর ভাব ফুটে ওঠে।

দ্বিজেনের বলার অনেক কিছুই ছিল। আশ্বাস দিতেও যেন ভরসা পায় সে। মাধববাবুরা স্কুল চালু করলে ধীরার চাকরী হবে। এসব সন্ধান দিতে চায় দ্বিজেন।

কিন্তু পারে না। চুপ করে থাকে!

কাশির শব্দ ওঠে! কেশব মিত্তির জেগে উঠেছে। ধীরা বলে।

—বাবার ঘুম ভেঙ্গেছে। যাই, ওসুধটা খাওয়াতে হবে।

দ্বিজেনও বের হয়ে এল।

নীচের চত্বরে তখন কলরব উঠছে। ক্ষুধার্ত আর্তকণ্ঠের কলরব। খিঁচুড়ি নিয়ে যেন দাঙ্গা বাঁধার উপক্রম হয়েছে। ওরা জনতাকে শান্ত করে বসাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারাও মরীয়া।

দ্বিজেনের মনে হয় যেন ওই মূর্তিমান হতাশা বুভুক্ষার প্রতিমূর্তি-গুলোকে সে গলাটিপে শেষ করে দেবে।

রূপেনের ডাকে চাইল।

রূপেন বলে—কোথায় ছিলি দ্বিজু? একটু ছাখ ওদের। আমরা রতনদের আনতে যাচ্ছি। ওরা কদিন আটকে আছে। ওদিকে যাওয়া যাচ্ছেনা। কে জানে ক'জন বেঁচে আছে না নেই!

দ্বিজেন এগিয়ে যায় বিরক্তিভরা মন নিয়ে।

ভাঙ্গা চালের উপর বসে আছে ক'টা মানুষ? দিনরাত্রির হিসেব

ওদের নেই। এ বৃষ্টি আর রাত্রির যেন শেষ নেই। বৃষ্টির রোখ মাঝে মাঝে আকাশ কাঁপিয়ে নেমে আসে।

রতন গুম হয়ে বসে আছে। মাথায় জড়ানো একটা কাপড়, বৃষ্টির হাত থেকে ওতে বাঁচা যায় না। ছেলেটার সেই জোরাল কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন মাঝে মাঝে থেমে যায়! রতনের বৌ—শঙ্করী কাঁপছে শীতে। দুদিন দুরাত্রি পড়েছে, খাওয়া জোটেনি। আর বুকের দুধও শুখিয়ে গেছে, ছেলেটা ওই নিষ্ফলা মাই দুটো থেকে শেষ জীবনী-শক্তিটুকু আহরণ করার জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা করছে, আর ব্যর্থ হয়ে কঁকিয়ে ওঠে। ও ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদছে—আর্তনাদ করছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে শঙ্করী! না, ছেলেটা চুপ করে গেছে। ওই চীৎকারটা উঠছে গাছের মাথা থেকে। শকুনটা ওই গাছ ছেড়ে যায় নি।

ওখানে বসেই সেটা ককাঁচ্ছে!···

—ঘং ঘং!···ফাটা কাসরের মত আওয়াজ বের হয় রতনের বুড়ো বাবা যতনের গলা থেকে। ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে অনাহারে বুড়োর চীৎকার থেমে গেছে, ঝিমুচ্ছে সে। বিড় বিড় করে মাঝে মাঝে।

—টপ্ করে পড়ে গেলেই ভালো রে, বানে ডুবে মরা ছিল এর থেকে ঢেক ভালো। আর বাঁচবো নাই রে অতন—হেঁই বাপ। হাত পা গুলান কালিয়ে আইছে রে!

রতন বাবাকে শান্ত করার চেষ্টা করে—রাতটা কাটাও, কাল ঠিক উরো আসবেক গ!

বুড়োর চোখের সামনে অস্বচ্ছ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

কাঁপছে হাতপাগুলো। শঙ্করী বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে ওর দেহের উত্তাপে ছেলেটার হিম দেহটাকে উত্তপ্ত করে রাখতে চায়।

রতন ওই জমাট অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। সর সর শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে, দেখতে পায় না অন্ধকারে! শঙ্করী উৎকর্ণ হয়ে ওঠে—সাপ গো!

অন্ধকারে মনে হয় পিছনের ডাল বেয়ে সেটা উঠছে,...পাতায় পাতায় শব্দ ওঠে। মৃত্যুর পদধ্বনি যেন শুনেছে তারা। বিষাক্ত সাপের ছোবলে এখুনি নেমে আসবে মৃত্যুর যবনিকা। ক'দিনের প্রাণপণ সংগ্রামও শেষ হয়ে যাবে।

রতন বলে—চুপ করে বসে থাক্ বৌ ; নড়িস না—

ভীত সাপটা ডালের উপরের দিকে উঠে গেল। আবার স্তব্ধতা নামে। স্তব্ধ রাত্রির বুক ছাপিয়ে তখনও উঠছে জলস্রোতের মত্ত উল্লাস।

সোনারোদে শিশির ভেজা সোনালী ধানগুলো চকচক করে। রতনের বুক ভরে যায় কুয়াসা মাখা ধানের মিষ্টি বাসে,...কোথায় একটা দোয়েল পাখী কলরব করে ওঠে। ধান কাটছে সে নয়ানজলির মাঠে, এর পর নামো বাদার আখ কেটে মাড়াই করতে হবে। সোনা ধানের মঞ্জরীগুলোয় ঝুম্‌ঝুম্ সুর ওঠে। বাতাসে মাথা নাড়ে সবুজ আখ ক্ষেতের সীমানা।

—এবার ধান ফলেছে চারপো কিরে অতন ?

রতন নিমু পরাই-এর ডাকে চাইল। নিমুও ওদিকের ক্ষেতে ধান কাটছে। দেখা যায় শঙ্করীকে গ্রামসীমার বটগাছ-এর নীচু দিয়ে মাঠে আসছে জলখাবার নিয়ে। নিটোল পুরুষ্ট দেহে একটা ছন্দ জাগে। শঙ্করীকে দেখছে রতন।

খাবে কাচা কাপড় দিয়ে ওর বলিষ্ঠ দেহটাকে কি সুন্দর ছন্দে বেঁধেছে—তাতে ওর যৌবন যেন বাধা মানেনি। চোখের কালো তারায় শিশির মাখা ধানের বুকে রোদের ঝলকানির আভা ফুটে ওঠে। শঙ্করী আলের মাথায় এসে মুড়ি কলাই সেদ্ধ ভরা বাটিটা নামিয়ে বলে।

—এত হাঁ করে দেখছ কি গ ? ধান কাটতে গিয়ে ইবার হাতই কাটবে লাগছে !

হাসে রতন—তুকে দেখছিলাম। কি সোন্দর লাগছে তুকে।

হাসে মেয়েটা—ইস্ ! লুভ কত গ ! লাও ঢেক বেলা হইছে,

জলখাবার খেয়ে লাও দিকি, ঘরে লঙ্কার কাজ বাকী।

রতন বলে—একটু বস কেন্নে! ঘরে তো তুদণ্ড দেখার সময় পাই না।

—কত সখ মরদের গ! হাসছে শঙ্করী।

হঠাৎ চমকে ওঠে রতন···ভোর হয়ে আসছে। ঘসা কাচের মত আকাশ। এখানে পাখী ডাকে না, সোনাধানের মঞ্জরীও নেই—শুধু চকচক করছে জল। আর শোনা যায় বুড়োর কাশির শব্দ। ফাটা কাঁসরের মত আওয়াজ ওঠে—খং খং···!

কঁকাচ্ছে বুড়ো—আর বাঁচবো নাই রে অতন। বুকে পিঠে ব্যাথা, কালিয়ে গেলম রে!

কাশির ধমকে জীর্ণ বুকের খাঁচাটা কেঁপে ওঠে!···হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে বুড়ো—ওই, ওই ছাখ! শ্যালো আমাকে ঠুকরে খাবেক—শ্যালো জ্বল জ্বল করে দেখছে ছাখ।

শকুনটা ডানা মেলে ঝটপট করছে। লম্বা গলার প্রান্তে ঠোঁটটা ধারালো ছুরির মত দেখায়। তুচোখে কি কুৎসিত বীভৎসতা। শঙ্করীও দেখেছে ওই শকুনটাকে। অজানা ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। বুকের মধ্যে কাঁথা জড়ানো কচি বাচ্চাটাকে ওই শকুনের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে চায়। বাচ্চা ছেলেটার গায়ে হাত পড়তে চমকে ওঠে শঙ্করী। ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে ওর ছোট্ট দেহটা। ডেকেও সাড়া পায় না। শঙ্করী চীৎকার করে ওঠে।

—ওগো, খোকনের যে সাড়া সান্ নাই গ! ওগো—

চমকে ওঠে রতন। ভিজে গেছে কাঁথা-ন্যাকড়াগুলো। ছেলেটা ওই ভিজে পুটুলির মধ্যে শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। শঙ্করী চীৎকার করে চলেছে।

—খোকন—আমার খোকন—রে—

শকুনটা দীঘল ডানা মেলে গাছের ডাল কাঁপিয়ে এবার আকাশে ঠেলে ওঠে, ওর ডানার সাঁই-সাঁই শব্দ ওঠে। যেন আকাশে পরিক্রমা

করছে মৃত্যুদূত। ওদের সামনে এসেছে মৃত্যুর ছায়া।

শঙ্করীর তীক্ষ্ণ চীৎকারটা জলের বুকে ভেসে চলেছে।

দুদিনেও জল কমার নাম নেই, স্রোত যেন আরও বেগে বয়ে চলেছে। অজয়ের বাঁধ মুছে গিয়ে এখন এই দিকে বইছে পুরো নদীটা। মাঝে মাঝে জেগে আছে ধ্বংসস্তূপ! দু'একটা গাছের ডালে সাপগুলো জড়িয়ে আছে। রূপেন হুশিয়ার করে দলের ছেলেদের।

—সাবধান! মাঝ খাত দিয়ে নৌকা নিয়ে চল।

—ই যে পথগো! এখনও দ্যাখো—আটহাত জল পেরায়। শম্ভু লগিটা তুলে জানায়। চোরা শম্ভু কদিন যেন বিপদের মুখে বদলে গেছে। সেও নেমেছে এই কাজে। রূপেনের সঙ্গেই থাকে।

হঠাৎ সকালের স্তব্ধতা ভেদ করে শঙ্করীর আর্তনাদ—বুকফাটা কান্নার শব্দ ভেসে আসে।

—মাষ্টার! পানু চমকে ওঠে—কে কাঁদছে গ! হ উদিকে।

এখন কার বাড়ি কোথায় ছিল তাও বোঝার উপায় নেই। দু'একটা চেনা গাছগাছালির নিশানা করে মনে হয় কান্নাটা আসছে দড়ার আমগাছ-এর কাছ থেকে!

কালো বলে—উঁতো রতনাদের গাছ গ! চল দিন্!

—সামাল!

নৌকাটা ঠেলে গিয়ে উঠেছে একটা বিরাট ধ্বসেপড়া বাড়ির চালাতেই। কোনরকমে লগি মেরে সরিয়ে আনতে এদিকের বাঁশ ঝোপেই যেন সেঁদিয়ে যাবে নৌকাটা।

বাঁশগাছগুলো শিকড় সমেত উপড়ে পড়ে জড়াজড়ি হয়ে আটকে আছে।

—অগো—বাঁচাও গো! অ বাবুরা!

চাইল সন্তোষ। ক'টা বাঁশগাছকে একত্র বেঁধে তার উপর তিনচার জন মেয়ে পুরুষ বসে আছে। জলে ভিজে হেজে গেছে ওদের

দেহ। যেন কোন অশরীরী প্রেতাত্মার দল ওরা—বসে আছে মৃত্যুর জগতে।

—নেমে আয়। রূপেন নৌকাটা ভেড়ালো!

নামবার ক্ষমতা ওদের নেই। কে ছিটকে পড়ল নৌকার খোলে। কালো, চোরা শম্ভু ধরাধরি করে দুতিনজনকে নামিয়েছে। লোকগুলোর ভাষা নেই, বিবর্ণ বিস্ফারিত চাহনি মেলে দেখছে ওদের।

—ওই ই যে! হেই রতনা—

যতনা বুড়ো ভাঙ্গা বিকৃত গলায় চীৎকার করে ওঠে···

রূপেন নৌকাটা এনেছে ওদের গাছের নীচে। শকুনটা লোকজন দেখে এবার মুখের শিকার ফস্‌কানো বাঘের মত মরীয়া হয়ে উঠে চীৎকার করে। ডানাটা মেলে যেন ধারাল ঠোঁট দিয়ে এবার ঘা মারবে, ঠুকরে তুলবে রক্ত মাংস!

শম্ভু লগিটা তুলে গর্জায়—শালো, জ্যান্ত মানুষ খাবি না কি রে? হ্যাই শালো! উঠে এসো গ যতন খুড়ো!

রতন বাবাকে ধরে নামালো। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তার গা। আর শঙ্করী ওই ভিজে ন্যাকড়ার পুটুলিটা বুকে জড়িয়ে ধরে বলে। খোকনকে দুধ খেতে দিবে তো বাবু, তিনদিন ও না খেয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে গো! সব হরে গেল—জমির ফসল, মায়ের দুধ! বাছা না খেয়ে আছে বাবু গো!

চোখেমুখে উদ্‌ভ্রান্ত চাইনি, বুড়ো যতন ককাঁচ্ছে—কেনে নিয়ে যেছিস আমাকে অতনা, বানে ঠেলে ফেলেছে—হাই করি রে। বুকটা ফেটে গেল—আর সারছি নাই।

কাশছে সে। মনে হয় ওই জীর্ণ দেহের খাঁচাটা কাশির আবেগে এবার ভেঙ্গে চুরে ধ্বসে পড়বে, মুক্তি পাবে ওর বন্দী অসহায় প্রাণশক্তিটুকু।

নৌকাটা ফিরছে ওই ঠাকুরবাড়ির চাতালের দিকে। সেখানে তবু আশ্রয় পাবে, আহার্য কিছু পাবে, আর পাবে বাঁচার আশ্বাস।

শঙ্করী পুঁটুলিটা বুকে জড়িয়ে ধরে দোলাচ্ছে—আপন মনে গুণগুণ করে গান গেয়ে তার খোকনকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

ধীরাও বসে থাকতে পারেনি চুপ করে। চোখের সামনে দেখেছে এতবড় বিপর্যয়। ওই কচিকাচা মেয়েছেলে-বৌ-গিন্নীরা এসে ভিড় করেছে এই স্কুলবাড়ি কাছারি বাড়ির চাতালে। আর দুদিনের মধ্যেই সুরু হয় জ্বর, পেটের অসুখ। নরেন ডাক্তারও একা সামলাতে পারে না।

হেলথ্ সেন্টারের ডাক্তারবাবু নরেন রায় এখানে বেশ কিছুদিন আছে। মাঝবয়সী লোকটা এর মধ্যে ওষুধপত্র যা ছিল তাই দিয়েই কাজ শুরু করেছে। তবু হিমসিম খেয়ে যায়। কম্পাউণ্ডার একজন সেও বানে তার গ্রামের বাড়িতেই আটকে আছে কোথায়।

ধীরা বলে—আমি পারবো ডাক্তারবাবু?

নরেনবাবু ওকে দেখে বলে—ঠিক আছে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, পারতে হবে। আর ঔষধপত্র তো সামান্যই আছে। যা হয় করার চেষ্টা হোক এই দিয়ে।

ধীরা তবু একটা কাজ পেয়েছে।

ডাক্তারখানার চাতাল থেকে নৌকাটা আসতে দেখে এগিয়ে যায় নরেনবাবু, জলবন্দী অসুস্থ কাদের তুলে আনছে ওরা!

দুটো লোক নৌকায় কাৎ হয়ে পড়ে আছে। কাশছে কাঁপছে যতীন বুড়ো আর শঙ্করীর চুলগুলো খুলে পড়েছে, মুখেচোখে রুক্ষতা, ও যেন মূর্তিমান অসুস্থতার প্রতীক। বুকের কাছে ন্যাকড়ার পুঁটুলিটা চেপে ধরে বসে আছে মেয়েটা।

ওরা নামছে।

পায়ের নীচে দু'দিন দু'রাত্রির পর মাটি পেয়েছে তারা। অবশ পা দুটো কাঁপছে বুড়োর, ছিটকে পড়ল কাদায়। সন্তোষ ধরে ফেলেছে ওঠে।

চমকে ওঠে নরেন—এ কাকে এনেছিস রে ? এ্যা যতীন !

ও যেন জীবন্ত একটা প্রেতাত্মা—দুচোখ কোটরে ঢুকে গেছে, মাথার চুলগুলো জটা বাঁধার অবস্থা, চোখের কোলে পিঁচুটি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

নরেনবাবু অবাক হয়—সর্বনাশ। নিয়ে যা ডাক্তারখানায়, দেখছি, শেষ করে এনেছিস নাকি রে !

শঙ্করীর কোলে পুটুলিটার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে নরেনবাবু !

শঙ্করী বলে—আমার খোকন ! ওরও সর্দিজ্বর হয়েছে গ ! এ্যাই যে-দুদিন খেতে দিতে পারিনি বাছাকে ! ধীরাদি একটু দুধ দেবে বাছাকে ?

নরেনবাবু বাচ্চাটার কচি হাতটা তুলেই চমকে ওঠে !

ঠাণ্ডা হিমদেহ, কখন ওইটুকু বাচ্চাটা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে কি তৃষ্ণা ক্ষুধা নিয়ে কেউ জানেনা। দেহটা হিম ! কাঠ হয়ে গেছে।

—খোকন ! আমার খোকন, সোনা ! দুধ খাবে—

নরেন ডাক্তার বলে রতনকে—ছেলেটা আর বেঁচে নেই রে !··· পচতে সুরু হবে এইবার !

চমকে ওঠে রতন—ডাক্তারবাবু গ—খোকন আর নাই—

···চমকে ওঠে শঙ্করী, দু'চোখ জ্বলে ওঠে, মরা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চীৎকার করে।

—না, না ! মিছে কথা গ ! খোকন—এইতো আমার খোকন সোনা ! ···খোকন-

কোন সাড়া নেই। ভিজে কাপড়ের আবরণ খসে গিয়ে নগ্ন মৃত এক মানব শিশুকে বুকে জড়িয়ে উদভ্রান্তের মত চীৎকার করে ওঠে শঙ্করী !

—না-না। ও মরে নাই গ—

ওর ভবিষ্যৎ—ওর শেষ সম্বলটুকুকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে

মেয়েটা, ওর চীৎকার—বুকফাটা কান্নার স্বর সারা বসতটাকে কি বেদনায় ভরে তুলেছে।

স্তব্ধ নির্বাক চাহনি মেলে অসহায় মানুষগুলো তাদের ভবিষ্যৎ অপমৃত্যুকে যেন নগ্নরূপে প্রত্যক্ষ করেছে।

ব্রজদুলালবাবুও ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন। তিনিও সব শুনে বলেন—ওকে থামা রতন, ওকে থামা।

চারিদিকে উৎকণ্ঠিত মুখের ভিড়। ক'দিনে তারা দেখেছে অনেক সর্বনাশ—অবক্ষয় আর ধ্বংসকে। অনেক কিছু হারিয়ে গেছে তাদের। আজ গ্রামকে গ্রাম নিঃস্ব সর্বহারার ভিড়ে ভরে গেছে আর জমায়েত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে এই চাতালে। এত ধ্বংসের মাঝেও মৃত্যুকে দেখেনি। এ মৃত্যু এসেছে নীরবে—চুপিসাড়ে তার লোভী হাত বাড়িয়ে এদের ভবিষ্যৎকে যেন গ্রাস করেছে। হয়তো এই সুরু, এরপর কি হবে জানে না এরা।

আকাশ বাতাসে ওরা শুনেছে মৃত্যুর পদধ্বনি।

কদম ঠাকুরুণ-এর ছানিপড়া চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

শঙ্করী কাঁপছে, তখনও বুকে ধরে আছে কঠিন বিবর্ণ শিশুর শবদেহ। চীৎকার করে—খোকন—আমার খোকন রে!

ওর বিকৃত কণ্ঠের চীৎকার স্তব্ধ পরিবেশকে কি বেদনায় ভরিয়ে দিয়েছে। কদম ঠাকরুণ বলে—ভগমান কি নাই গ! মায়ের কোল থেকে এমনি করে ছেলেটাকেও কেড়ে লিলা! হেই ভগমান!

নবীন ভটচায-এর গিন্নী গিরিবালা দেখছে ভটচায এর কাণ্ডটা। বাড়ির পুজিত শালগ্রাম শিলা বানে কোথায় পলিচাপা পড়ে গেছে বসতবাড়ির ধ্বংসস্তূপের নীচে।

এদিকে শ্রীধর দাসজীর কল্যাণে তুলসী চাপাতে হবে। দাসজী নগদ পাঁচটাকা আর কিছু চাল দিয়েছে। নবীন ভটচায ওই ইট খোয়ার গাদা থেকে কুড়িয়ে আনা নকল পাথরটাকেই লাল শালু মুড়ে

পাথরবাটিতে বসিয়ে অং বং করে দাসজীর কল্যাণে তুলসীপাতা চাপাচ্ছে।

গিরিবালা বলে—আর পাপ কত করবা ওই সব ভড়ং করে।

ইশারায় নবীন ওকে থামতে বলে জোর জোর ঘণ্টা বাজাচ্ছে টিকি নেড়ে। কদম ঠাকরুণও এসে ভক্তি ভরে প্রণাম করে গেল! নবীনও বের হয়ে আসে পূজোর ভড়ং সেরে।

হঠাৎ শব্দটা শোনা যায়। আর চীৎকার ওঠে।

বনবনিয়ে হাওয়ায় ভর করে হেলিকপ্টারটা আসছে নীচু হয়ে।

লোকগুলো যেন মুখ বুজে ওই উপবাস আর জল কাদার হিম-টুকুকে সহ্য করে বাঁচার জন্য লড়ছে। হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়া ওই জনবসতটা সচকিত হয়ে ওঠে ওই শব্দে।

নিমাই হেঁকে ওঠে—হেলিকপ্টার গ! অ ভূষণ খুড়ো।

কাছেই দুর্গাপুর, পানাগড়। তার জন্য এসব তারা দেখেছে। নবীন ভটচায গর্জে ওঠে—শালোরা মজা দেখতে এয়েচে রে? আমরা মরছি প্যাটের জ্বালায় আর ওনারা—

—অয় বাপ্! ই কি গো! চমকে ওঠে অনেকেই। এর আগে বন্যা এখানে এমন হয়নি। তাই এ খবরটাও অজানা ছিল, হেলিকপ্টারটা অনেক নীচে নেমে এসেছে। চারিদিকে আদিগন্ত বিস্তৃত জলের রাজ্য, মাটি বলতে এখানেই কিছু জেগে আছে, আর কিলবিল করছে মানুষের ভিড়।

হেলিকপ্টারটা নীচে নেমে এসে ওই জলবন্দী জায়গাটায় খাবারের প্যাকেটগুলো ফেলতে থাকে আসমান থেকে। এরা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি!

—কি ফেলছে গো!

ওই সারি সারি বদ্ধ ঘরগুলো থেকে নিমেষের মধ্যে হাজারো মেয়ে ছেলে লোকজন লাফ দিয়ে পড়েছে। গিরিবালাও চীৎকার করে। ততক্ষণে শীর্ণ লম্বা নবীন ভটচাযও শূন্যে হাত তুলে ছুটো

প্যাকেট খাবলে ধরে ফেলেছে।

ব্যাংও গোলগাল দেহ নিয়ে কোলাব্যাং-এর মত এদিক ওদিকে দৌড়চ্ছে থপ্ থপ্ করে, ওর ঘাড়ে মাথায় দু'একটা প্যাকেট পড়েছে, কিন্তু তার আগেই ওর উপরই কয়েকজন লাফ দিয়ে পড়েছে। কাদার মধ্যে ধরাশায়ী অবস্থাতেও ব্যাং ওই বস্তুগুলোকে হাতছাড়া করেনি। কি আছে ওতে তখন দেখার সময় নেই। ভিড় কলরব চীৎকারে ভরে ওঠে জায়গাটা। লোকগুলো জড়াজড়ি ঝটাপটি কাড়াকাড়ি সুরু করেছে। যেন একপাল বুভুক্ষু কোন মনুষ্যেতর প্রাণী, খাবারের দানা কণার দখলদারি নিয়ে নখ দাঁত বের করে আত্মঘাতী সংগ্রাম সুরু করেছে।

কেশব মিত্তিরও বের হয়ে এসেছে। ধীরা ডাকছে—বাবা!

কেশব মিত্তির দেখছে ওই দৃশ্যটা। মানুষের দঙ্গল যেন লড়াই-এর নেশায় মেতে উঠেছে। রূপেন-দ্বিজেন-সন্তোষও কিছু ছেলেদের নিয়ে ওই উন্মত্ত জনতাকে সংযত করার চেষ্টা করে, মনে হয় পায়ের চাপে আহত হবে অনেকেই। তবু লড়াই থামানো যায় না।

হেলিকপ্টারটা তার পুঁজি শেষ করে উড়ে গেছে। তখনও এদের খণ্ডযুদ্ধ মেটেনি।

রূপেন হাঁক পাড়ে—থামো তোমরা!

কেশব মিত্তির গর্জে ওঠে—লেট দেম ডাই। এ প্যাক অব্ ফুলস্! রুটি লড়াই দেখেছো রূপেন? যুগে যুগে এই চলে আসছে এ্যাণ্ড দিস হ্যাজ নট ষ্টপড্। এ লড়াই থামবে না—চলছে চলবে।

ধীরা এগিয়ে আসে।

ক্লান্ত জনতা তখন হাতে খাবারগুলো পেয়ে চিবুচ্ছে। রূপেনের মনে হয় কথাটা নির্মম হলেও সত্যি। ধীরা কেশববাবুকে নিয়ে চলেছে ঘরের দিকে। হঠাৎ বুড়ো বলে ওঠে—আমাকে একটা প্যাকেট দেবে? আই ফিল হ্যাংরি!

—ঘরে যাও বাবা! ধীরা বাবার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

ধীরার ওই চাপা ধমকে কেশব মিত্তির একটু ঘাবড়ে যায়। ওর মনে হয় একটা অন্যায়ই করেছে সে। পায়ে পায়ে ঘরের দিকে চলে গেল লোকটা।

নীচের চত্বরে এখান ওখানে তখনও হেলিকপ্টারের ছড়ানো খাবারের হিস্যা দখলদারী নিয়ে হৈ চৈ চলেছে। রূপেন দেখছে ক'দিনের আঘাতেই সাজানো নীতি মমতাভরা সহজ মানুষগুলো আশ্রয়, যথাসর্বস্ব হারিয়ে আদিম মানুষে পরিণত হয়েছে। ওদের মনের অতলের নগ্ন পাশবিকতাটা উৎকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ যেন মানবিকতার এক সামগ্রিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তারা। কেশব মিত্তিরের মত লোকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।

ধীরার দুচোখে নীরব আতঙ্কের ছায়া ফুটে ওঠে। কি হবে রূপেন ?

রূপেনও সঠিক জানেনা এর থেকে মুক্তির পথ। তবু বিশ্বাস সে হারায় নি। রূপেন বলে—পথ একটা হবেই ধীরা। হয়তো অনেক দুঃখ কষ্ট আরও সইতে হবে। তবু পথ আমরা পাবোই। বাঁচার পথ।

ধীরার হাতখানা রূপেনের হাতে এসে পড়েছে। কবোষ্ণ বিচিত্র অনুভূতিময় সেই স্পর্শটুকু ধীরা সারামন দিয়ে অনুভব করে কিসের স্বপ্ন সন্ধান করে। দুজনে যেন একত্রে সেই পথ সন্ধান করতে চায় তারা।

রাধা চুপ করে বসে আছে।

ভজনদাসেরও করার কিছু নেই। ঘর বাড়ি জমি সব গেছে। জমানো সঞ্চয় তার কিছু নেই যা ভাঙ্গিয়ে চলবে। ইদানীং তার বয়স হয়েছে। চোখেও ছানি পড়ছে। তবু ঘর বাড়ি আশ্রমটা ছিল। জমির ফসলের সঙ্গে বাইরে থেকে কীর্তন গেয়ে কিছু রোজগারেই চলে যেতো তাদের। আজ রাধার ভাবনার উপর এসে পড়েছে ভজনের সংসার চালানোর ভাবনাটাও। কোথাও যেন পথ নেই।

ব্যাং গেছে কিছু চালের খোঁজে! রাধা বলে এত কি ভাবছো

বাবা। আমাদের দিন ঠিক চলে যাবে। নাও, ওঠো!

ভজন বলে—বানের জল কমলেই সহরের দিকে চলে যাবো মা। কিছু পয়সা কড়ির দরকার। আমি, রামু, আরও দুএকজনকে নিয়ে বেরুবো। তুই এখানে থাকবি। ঘর বাড়ি তুলতে হবে। ব্যাংও থাকবে, টাকার তো দরকার।

রাধাও তা জানে।

আজ তার মনের অতলে অন্য একটা ক্ষীণ সুর জাগে। সন্তোষকে দেখেছে সে ওই ভিড়ের মধ্যে। মনে হয় হারানো দিনগুলোর কথা। সে তবু সান্ত্বনা কি আশ্বাস পায় মনে মনে। বাবার কথায় বলে ওসব পরে ভাববে! যাও—চান করে মন্দিরে দর্শন প্রণাম সেরে এসো' আমার ভাত হয়ে গেছে।

হাসল ভজন। জানে হয়তো নিজে আধপেটা খেয়েই তাকে খাবার দেবে মেয়েটা।

উঠে গেল ভজন।

রাধারাণীও ভেবেছে কথাটা। টাকার দরকার। কিছু নগদ যা ছিল তা শেষ হয়ে আসছে। একজোড়া বালা আছে, তাই বন্ধক রেখে কিছু টাকার জোগাড় করতে হবে।

…হঠাৎ কাকে দরজার সামনে দেখে চাইল। একটু অবাক হয় রাধা। ঘরের ভিতর একা ছিল। কাপড় চোপড়ও সংযত নেই। পিঠ ছাপিয়ে চুলগুলো পড়েছে। নিটোল পুরুষ্ট বাহার বুকের কাপড়টাও বেসামাল হয়ে আছে। তার মাংসল কাঁধ বাহুমূলের পূর্ণতা সহজেই চোখে পড়েছে ওই লোভী মানুষটার। ওর চোখে কি মদির চাহনি।

রাধা পুরুষের এই লালসার চাহনিটাকে চেনে। চোখ দিয়ে লোকটা যেন তার সারা দেহ লেহন করে চলেছে। কাপড়টা গায়ে ঢাকা দিয়ে রাধা চাইল ওর দিকে।

মাধব ঠাকুর বের হয়ে এসেছিল এদিকেই।

লাবণ্যের কথায় এর মধ্যে ওই বিরাট বাড়িটায় দুএকবার ওই বন্যার্তদের খোঁজ খবর নিতে আসে। অবশ্য মাধব এখানে এসেছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। শ্রীধর দাসকেও বলেছিল কথাটা। মাধববাবুর কলবাড়ির পাশেই ভজনদাসের বাগানটা। ওটার ওপর লোভ অনেক দিনের। ওটা পেলে কলবাড়ির লাগোয়া বাগানে একটা বাগানবাড়িই করতে পারে সে। ভজনের এখন টাকার দরকার। তাই খবরটা নিতে এসেছিল।

আর সেই সঙ্গে রাধার সঙ্গেও একটু কথা ছিল তার। মাধববাবু দেখছে রাধাকে স্তব্ধ নির্বাক চাহনি মেলে। ওর তরতাজা নিটোল দেহে অজয়ের বান ডেকেছে। উন্নত বুক সরু কোমর পুরুষ্ট পাছা সব মিলিয়ে আধো আলো আঁধারিতে মোহময়ী হয়ে উঠেছে মেয়েটা। মাধববাবু বলে—ভজনকে দেখছি না?

রাধা জানায়—বাবা মন্দিরে গেছেন।

মাধব যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়—অ! বাবাকে একবার দেখা করতে বলো। আর

মাধববাবু ঘরের চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে একনজর দেখে বলে—এভাবে আছো—দেখতে আমারই বিশ্রী লাগছে। মানে—কিছু টাকাপয়সার যদি দরকার হয়, এটা রাখো।

মাধববাবু এগিয়ে এসে খপ্ করে রাধার হাতটা ধরে কিছু টাকাই দিয়েছে। বলে সে—দরকার হলে তুমি ত জানাবে! এসময় লোকের বিপদে আপদে পাশে না দাড়ালে মানুষ বলবে কেন? এ্যাঁ! এত লজ্জা কিসের?

চমকে উঠেছে রাধা হঠাৎ ওই লোকটার এই মানুষ সুলভ ব্যবহারে। হাতটা তখনও ধরা রয়েছে ওর হাতে। রাধা ভাবতে পারে নি এমনি একটা কাণ্ড ঘটাবে মাধববাবু।

রাধার যেন জ্ঞান ফিরে আসে। মুখটা লাল হয়ে ওঠে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাধা বলে—টাকার এখন দরকার হবে না। হলে পরে

জানাবো।

—অ! মাধববাবু একটু হতাশই হয়। কিন্তু মেয়েটার ওই দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে ওর মুখচোখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে যেটাকে ঠিক ঘাঁটাতে সাহস করে না মাধববাবু।

তাই যেন আপোশ রফা করার স্বরে বলে মাধব।

—ঠিক আছে। তাই জানিও। লজ্জার কি আছে—দরকারের সময় নেবে। ব্যস। আর তোমার বাবাকে একবার দেখা করতে বলো!

চলে যায় মাধববাবু।

তখনও গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাধা। মনে হয় চরম বিপদ আর সর্বনাশা বন্যা যেন তাদের সব কেড়ে নিয়েও খুশী হয়নি, শেষ সম্বল সেই ইজ্জৎটুকুও যেন এবার হারাতে হবে।

মনে মনে অসহায় রাগে ফুঁসছে মেয়েটা।

—ইকি গ! উনুন জ্বলছে। ডাল পুড়ে ঝাঁই পোড়া হই গেল! এ্যাই রাধা! কি হ'ল?

ব্যাং ঘরে ঢুকে রাধাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। রাধারও খেয়াল হয় ডালটা পুড়ে গন্ধ ছাড়ছে। তখনও তার সামনে যেন মাধববাবুর মুখখানা ভাসছে।

রাধা তিক্তস্বরে বলে—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! কড়াইটা নামিয়ে ফেলে দে!

ব্যাং তৎক্ষণে কড়াই নামিয়ে বলে—চাল তো নাই গ!

—উপোস দিবি। উপোস দিতে এত ভয়? রাধা ফুঁসে ওঠে।

ব্যাং চেয়ে থাকে ওর দিকে। হঠাৎ ওই শান্ত মেয়েটা কি জ্বালায় তেতে পুড়ে উঠেছে, কি পরাজয়ের বেদনায় যেন আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে!

ব্যাং অবাক বিস্ময়ে বলে—লাও ঠ্যালা! কি হ'ল গ।

জবাব দিল না রাধা। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে সে।

হুঃখে, রাগে, অপমানে সে আজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ওই আধবোকা ব্যাং-এর মত মানুষের কাছে সেই পরাজয়ের খবর অজানাই থেকে যায়।

মাধবের চোখে মনে তখনও রাধারাণীর নেশাটা লেগে আছে। তার সঙ্গে মিশেছে মদের গোলাবী আমেজ। মাধববাবু একাই গেলাস হাতে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। চকচক করছে জল, ওই জলের বিস্তারে মন্দিরের আরতির শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ ভেসে ভেসে হারিয়ে যায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে।

হঠাৎ লাবণ্যকে ঢুকতে দেখে চাইল। লাবণ্য বলে ওঠে—আবার ছাই পাঁশ গিলছো বসে বসে?

লাবণ্য দেখছে স্বামীকে। লোকটা হুদিন ঘরে থেকে যেন বদলে গেছে। মাধববাবু বলে—আর কি করবো?

লাবণ্য বলে—কেন, নীচে গিয়ে এত লোকের বিপদে আপদে একটু দেখা শোনা করলেও তো পারো। বড় ঠাকুর—রূপেনবাবু—নরেন ডাক্তার ওরাতো রয়েছেন।

মাধব বলে—তুমি দেখছি জনদরদিনী হয়ে উঠলে! আর বাবা কত দেখবে ওদের? ওদের অভাব কোনদিনই মিটবে না, শুধু নিজেই ফেঁসে যাবে। ওরা রক্তবীজের জাত একটার পর একটা সর্বনাশ, মহামারী মন্বন্তর পার হয়ে ওরা বেঁচে আছে, থাকবে। ওদের কেউ না দেখলেও ওরা ঠিক হুনিয়ার বুকে এঠুঁলির মত লেগে থাকবেই।

হ্যারিকেনের মৃহু লালাভ আলোর আভা পড়েছে মাধববাবুর মুখে কপালে। কঠিন একটি মানুষ, যে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে নি।

লাবণ্য দেখেছে আর ক্রমশঃ যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওই লোকটার ব্যবহারে। লাবণ্য বলে—মানুষকে এতবড় অপমান করতে তোমার এতটুকু বাধেনা?

হাসে মাধব ঠাকুর। বলে সে—তাহলে ওই জলশূন্য তালপুকুর হয়েই থাকতে হতো। ধানকল—ব্যবসা—ওই বিলাস—টাকা—প্রতিপত্তি এসব পেতে?

লাবণ্যের কাছে লোকটা ক্রমশঃ যেন ছায়াছায়া একটা দানবে পরিণত হয়। আজ মনে হয় লাবণ্যের লোকটাকে সে চেনে না। অন্যসময় ভোরেই বের হয় মাধববাবু বাড়ি থেকে, ফেরে কখন তার ঠিক ঠিকানা নেই। কখন মত্ত অবস্থায় ফেরে রাত গভীরে, কোন রাতে ফেরে না, দুতিনদিন পর ফেরে উস্কোখুস্কো অবস্থায়। ব্যাগে কখনও থাকে টাকার বাণ্ডিল বেশ কিছু। বলে—রাখো এসব।

…ওইটুকু যেন তাদের স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক। টাকার বিনিময়ে মাধব লাবণ্যের স্ত্রীর অধিকার, মর্যাদাকেও যেন কিনে নিয়েছে।

তিলেতিলে অসহ্য হয়ে উঠেছে লাবণ্যের এই জীবন।

বলে সে—এভাবে কোথায় থাকো রাত দিন?

মাধববাবু ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে গর্জে ওঠে—থামো দিকি! এত কৈফিয়ৎ দেবার সময় নাই। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও।

জামায় পানের দাগ, গায়ে মদের ঘামের বিশ্রী গন্ধ, লাবণ্যের গা ঘিনঘিন করে। সারা মন তার বিষিয়ে উঠেছে। সে ভেবেছিল তার সংসারে শান্তি আসবে, একটা মানুষকে নিয়ে ঘর বেঁধে সুখী হবে সে।

বেশী পাবার লোভ তার নেই, সামান্য নিয়ে খুশী হয়েই ঘর বাঁধবে সে। কিন্তু লাবণ্যের এই ঘরবাঁধা চরম বেদনায় পরিণত হয়ে গেছে। টাকা—প্রাধান্য—প্রতিষ্ঠা!

লোকটা যেন কি নেশায় একটা দানবে পরিণত হয়েছে। বৃষ্টির রাতে ছায়াছায়া অন্ধকারে কোন সর্বনাশের রাজ্যে লাবণ্য ওই মানুষটাকে দেখে আজ তাই ভয় পায়।

কাঁসর ঘণ্টা বাজে।

জমিদার বাড়ির পুরোনো ঠাকুর দালানে আরতি হচ্ছে। মাঝখানের

উঠানে নাটমন্দির, চারিদিকে ভোগের ঘর, বারান্দা সামনে উঁচু দাওয়ার পরই মন্দির। থামগুলোয় এককালে পঙ্খের বাহারী কাজ করা ছিল, এখন মেরামত করার সাধ্য নেই, ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে।

ব্রজদুলালবাবুর স্ত্রী এবাড়ির বড়গিন্নি জ্ঞানময়ী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কুলদেবতার পূজো আরতির আয়োজন করে। চত্বরে নাটমন্দিরে এসে হাজির হয়েছে বন্যার্ত আশ্রয় প্রার্থীদের অনেকে। ধীরাও এসেছে, ভবতোষ বাবুর স্ত্রী প্রতিমাও এসেছে।

জ্ঞানময়ী বলে—এসো প্রতিমাদি—ওমা, ধীরা যে। আয়!

ব্রজদুলালবাবু প্রতিসন্ধ্যায় আসেন মন্দিরে। এ তার ছেলেবেলার অভ্যাস। এ বাড়ির কর্তারা তখন বর্তমান। তখন থেকেই রীতি ছিল সন্ধ্যার আরতির সময় ঠাকুর পরিবারের সব ছেলে মেয়ে বৌ ঝিদের মন্দিরে আসতে হবে। কর্তারাও থাকতেন। আজও ব্রজদুলালবাবু এসে দাওয়ার ওদিকে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়ান, মনে পড়ে কিশোর বয়সের, যৌবনের কত আনন্দ বেদনার স্মৃতি। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় তিনি যেন সেই অতীতের চেনা আপনজনের মুখগুলোকে দেখতে পান—অনুভব করেন তাদের সান্নিধ্য।

নাটমন্দিরে কীর্তন হচ্ছে, ভজনদাসও এখানে জলবন্দী হয়ে রয়েছে, ব্যাং খোল নিয়ে বসেছে। নামকীর্তন সুরু হয়েছে। ব্রজদুলালবাবু ওবাড়ির বৌমাকে দেখে শুধোন।

—মাধব এ'ল না? বাড়িতেই রয়েছে তো।

লাবণ্য এ বাড়ির ছোটতরফে বৌ হয়ে আসার পর থেকেই এ বাড়ির কুলদেবতার ভারও নিয়েছে। ক্রমশঃ সংসারের শূন্যতা আর স্বামীর ওই বিচিত্র ব্যবহারগুলো তার মনে এনেছে একটি নিঃসঙ্গতা, সেটাকে ভোলবার জন্যই লাবণ্য এই দেবতার মন্দিরে আসে, শান্তির সন্ধান করে। আর তাই যেন বুঝেছে তার স্বামী এ বাড়ির গোত্র ছাড়া একটি মানুষ। বনেদী এই বংশের কোন সংস্কৃতি ধর্মবোধ মানবিকতার কিছু মাত্র সে পায় নি। চিনেছে শুধু অর্থ আর

প্রতিষ্ঠাকেই।

তাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় নোতুন পথে।

লাবণ্য দেখে এসেছে তার স্বামীকে মদের গ্লাস হাতে, তাই এড়িয়ে যায় সে।

—শরীরটা ওর ভালো নেই।

ব্রজদুলালবাবু এ বাড়ির এখনও কর্তা, তিনিই সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই বলেন—সেকি! এসময় বৃষ্টিতে ভিজেছে বোধহয়। অসুখবিসুখ হলেই বিপদ। শুনলাম ওষুধপত্রও নরেনের ওখানে কিছু তেমন নেই। ওকে একটু সাবধানে থাকতে বলো মা।

লাবণ্য চুপ করে কথাটা শোনে মাত্র।

আরতির পর্ব চলেছে। সমবেত এত মানুষ আজ বিপন্ন নিরাশ্রয় বুভুক্ষু। তবু এই অদৃশ্য শক্তি আর মনের বিশ্বাসটুকুকে যেন নিবিড়তর করে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায় তারা। ওদের আর্তকণ্ঠস্বরে তাই আজ আকুলতা ফুটে ওঠে।

শ্রীধর দাসও এসেছে নাটমন্দিরে। গলায় তিনফেরতা কণ্ঠির তুলসীর মালা, কপালে নাকে তিলকসেবার চিহ্ন, গোলগাল পিপের মত লোকটার পরনে খাটো ধুতি, ফতুয়া, হাতে হরিনামের ঝুলি। একটা থামে হেলান দিয়ে তন্ময় হয়ে বসে মালা জপছে বোধ হয়।

দাসজীর এই ধ্যান সমাহিত মূর্তি দেখে অবশ্য অনেকে আড়ালে অনেক কথাই বলে। কেউ বলে চক্রবৃদ্ধিহারে খাতকদের সুদের হিসাবটা এই সময়ই পাকা হয়ে যায়, আবার নবু গোসাই বলে।

—শালো কার কি সর্বনাশ করবে ওই প্যাঁচগুলো তখন শক্ত করে নেয়।

অবশ্য দাসজী এসব শুনে অমায়িক হাসি হেসে বেশ গদগদ স্বরে বলে—নিতাই হে, এসবই তোমার লীলা।

দাসজী আজ তন্ময় হয়ে বসে মাধববাবুর কথাটা ভাবছিল। বিশেষ করে ভজনদাসের মেয়েটার কথাই। রাধাও এসেছে, আরতির সময় দালানে ওই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে রয়েছে সে। অবশ্য দাসজীর

মনেহয় মাধবঠাকুর মিথ্যে কথা বলেনি।

মেয়েটার সারা দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে! ওর মাতাল করা কালো চোখের চাহনি দাসজীর ভক্ত বল্লভ পঞ্চাশোত্তর বয়সের অপোক্ত দেহটাতেও সাড়া জাগায়। কেমন যেন বয়স হঠাৎ কমিয়ে আসার দুর্বার সাড়া আনে মনে। শাড়িখানা রাধার নিটোল দেহের রেখাগুলোকে আরও সোচ্চার করে তুলেছে।

ক'দিনের অনিয়ম এই গোলমালের মধ্যে মেয়েটার গায়ের ফর্সা রংটা একটু ম্লান হয়ে এসেছে, তবু তার আকর্ষণ এতটুকু কমেনি।

দাসজীর হাতের মালাটা একটু জোরে জোরে ঘুরছে। নোতুন পারমিট, অনেক টাকার মাল-এর অন্ধকারের লেনদেনের সুযোগ আর ফাঁকি দিয়ে অনেকের অনেক কিছু কেড়ে নেবার মৌকাটা হারাতে চায় না দাসজী। ওই মেয়েটা যেন তার কাছে একটা টোপ মাত্র, বিরাট একটা শিকারকে পাকড়ে ফেলার, ভাগ্যলক্ষ্মীকে তার হাতের মুঠোর মধ্যে বন্দী করার একটা পথ। এই কাজে তাকে সিদ্ধিলাভ করতেই হবে।

খোলে চাটি তোলে ব্যাং, তেরে কেটে ধুম-ধুম-তাক ধুম! আরতি কীর্তন থামলো, হরিধ্বনি দেয় সকলেই। শ্রীধর দাস মালাটা কপালে ঠেকিয়ে গদগদ স্বরে চীৎকার করে ওঠে--হরি বো ও ল!

ভজনদাস কথাটা আজই বলেছিল দাসজীকে। অবশ্য তখন দাসজীর মাধববাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই দাসজী ভজনদাসের তখনকার আবেদনে কান দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এখন এইবার ভজনদাসের সেই অনুরোধে কান দেবার দরকার পড়েছে। তাই দাসজী বলে—একটু আসবে ভজন, সকালে কি যেন বলছিলে। তা বাপু পাঁচ কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন ধ্যান দিতে পারিনি। পরে ভাবলাম এই নিরিবিলিতেই তোমার কথাটা শুনবো।

ভজনদাস শ্রীধর দাসজীর দিকে চাইল। তার কিছু টাকার দরকার। ঘরবাড়ি সব গেছে, জমির হাল কি আছে তা জল না কমলে

জানা যাবে না। ফসল তো গেছেই জমিতে বালিচর হয়ে গেল কিনা কে জানে। এদিকে বাইরে কীর্তনের আসরও সব বন্ধ। ওগুলো থাকলে তবু তার কিছু রোজকার হতো।

অথচ খেতে কয়েকটি প্রাণী, ওই রাধারাণীর জন্য ভাবনা হয়। সব হারিয়ে মেয়েটি তার ঘরে ফিরে এসেছে, মেয়েটার নিঃস্ব জীবনে ভবিষ্যতের কোন সংস্থান নেই। তাছাড়া ওই ব্যাং, ডাইনের দোহার রামলালও থাকে খায় তার কাছেই।

শ্রীধর দাস জানে মানুষের এসব বিপদের কথা। ভজন বলে ওকে—কিছু টাকার কথা বলছিলাম দাসজী, ঘরবাড়ি গেল একটু আশ্রয় তৈরী করতে হবে, আর জমিতে ফসল হবেনা এ বছর, সামনে এতগুলো মাস—সংসার তো শুনবে না।

দাসজী শ্রীধরকে ডেকে নিয়ে এসেছে তার পিছনের আশ্রয় টুকুতে। এদিকটা নিরিবিলি।

দাসজী ওর কথায় মাথা নাড়ে—তা সত্যি! টাকা তো কিছু দিতে পারি ভজন, কিন্তু শুধু হাতে কি করে দিই? যা দিনকাল পড়েছে।

ভজন ও কথাটা শুনেছে, উত্তরপাড়ার উমেশও বলছিল, তার বৌ-এর চার ভরির হার বাঁধা রেখে এখান থেকে পাঁচশো টাকা নিয়েছে সুদে। গোবিন্দ মধুসূদনও জমি বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছে। আর এও বুঝেছে মধু এটাকা শোধ দেবার সাধ্য তার নেই।

ভজন চুপ করে কি ভাবছে। তার জমি যা আছে তা সামান্য, একটা বাগান—পুকুর আছে। কিন্তু সেইটুকুই তার শেষ সম্বল। ভজন বলে—কি করবো তাই ভাবছি।

হঠাৎ ওদিকে খুট খুট শব্দ শুনে চাইল শ্রীধর। ভজনও দেখছে। নামো পাড়ার গিরিধারী উঁকি ঝুঁকি মারছে অন্ধকারে।

গিরিধারী এদিগরের নামকরা ছেলে। মদ-গাঁজা কোন নেশা ওর বাদ নেই, আর কিছু দলবল নিয়ে রাতের অন্ধকারে এই চাকলায় চুরি ডাকাতি রাহাজানি করে, মায় বনের মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুর-এর

শিল্পাঞ্চলের সীমানা অবধি ওর ঘাঁটি। ট্রাকবন্দী নানা মালপত্র আসা যাওয়া করে ওই পথে। ওরা তাতেও হামলা করে।

সেই গিরিধারীকে ওই ভাবে উঁকি মারতে দেখে ভজন একটু ঘাবড়ে যায়। শ্রীধর ভজনকে বলে—একটু বোস ভজন।

শ্রীধর দাস উঠে গেল বাইরের চাতালের দিকে। অন্ধকার নেমেছে এদিকে। চাতালের নীচেই একটা কচু ঝোপ তারপরই সুরু হয়েছে জলের সীমানা। একটা নৌকায় কি সব রয়েছে।

ভজন দাস দেখে শ্রীধর দাস ফিসফিসিয়ে ওদের কি নির্দেশ দেয়, কিছু কাঁচাটাকার লেনদেন হতে গিরিধারীও নৌকায় উঠে বের হয়ে গেল।

জানলা দিয়ে ভজন অন্ধকারের ব্যাপারটা দেখেছে, ঠিক বুঝতে পারেনা। তবে মনে হয় একটা গোলমাল কিছু আছে, ওসব ভাববার সময় তার নেই। নিজের ভাবনাতেই ডুবে আছে সে, সামনে যেন অমনি নিরাশার অতল অন্ধকার।

শ্রীধর ফিরেছে। গজগজ করে সে—বুঝলে ভজন, দেশশুদ্ধ লোকের অভাব। আমি শালা কতো করবো বল?

ভজন উঠতে চায়। বুঝছে এখানে কোন সুবিধে হবেনা।

দাসজী বলে—আরে বসো ভজন, তোমার কথা বলছিনা। তুমি হলে নামী লোক। আমাদের মাথার মণি, তোমার কথা আলাদা।

ভজন দেখছে শ্রীধর দাসকে। দাসজী হিসেব করে বলে এবার।

—টাকার দরকার, কিছু নাও। তোমাকে ওসব করতে হবে না। টাকা তোমাকে শুধু হাতেই দেব, বিপদে পড়েছো দেখতে হবে বৈকি—

শ খানেক হলে চলবে?

ভজন দাস অবাক হয়। দাসজীর কথায় সেই হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে বলে—ওতেই হবে। তবে একটা হ্যাণ্ড নোট লিখে দোব দাসজী। ধম্মো বলে কথা!

দাসজী অবশ্য একথাটা পরেই বলতো। সেটা নিজে থেকে ওকে

জানাতে দেখে যেন নেহাৎ অনিচ্ছাভরে বলে।

—তা বলছো যখন দাও। টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি।

আজ সন্ধ্যাতেই গিরিধারী এই বন্যার বাজারেও একলট মাল চালান এনেছে। এসময় পুলিশ লোকজন অন্য কাজে ব্যস্ত। তাদের নজর রাখার সময় নেই। গিরিধারী সব মালপত্র ওই দুর্গাপুরের দিক থেকে টেনে এনে মাধববাবুর গুদামে জমা করেছে। এরপর রড লোহার জিনিষপত্র, করোগেট টিনের বাজার উঠবে। এক ধাক্কায় দাসজী চড়চড়িয়ে উঠবে আর মাধববাবুও সিকি দামে পাবেন হাজার হাজার টন রড—বাণ্ডিল বাণ্ডিল টিন।

…সেই টাকা থেকেই নোটগুলো গুনে দেয় ভজনকে দাসজী।

দাসজী বলে—তোমার কোন অসুবিধে হলে বলো ভজন। আর মনে হয় দু'চার দিনের মধ্যে জল কমে যাবে, এই হাটতলায় এমনি গোলমালে না থেকে দু'চার দিনের মধ্যে একটু আশ্রয় তৈরী করে বাড়ির ভিটেতেই ফিরে যাও দাসজী। মানে সোমত্ত মেয়ে রয়েছে, এখানে পাঁচজনের মাঝে থাকা ঠিক হবে না।

কথাটা ভেবেছে ভজনও।

দাসজী বলে—বাইরের অনেক লোকজন ভিড় করেছে, আর মেয়ে তো দেখছি জনসেবাতেও লেগেছে। মিত্তির মশাই-এর মেয়েটার সঙ্গেও ঘোরে—

তাই বলছিলাম।

ভজন দাস সদ্য টাকাগুলো হাতে পেয়েছে দাসজীর কাছ থেকে। তার কথাগুলোর তাই প্রতিবাদ করার সাধ্য নেই। তাছাড়া ভজন দাসও দেখেছে রাধারাণী ক'দিনেই এই চাতরের আশ্রয়ে এসে একটু যেন স্বাধীন হয়ে গেছে। আর পাগলা কেশব মিত্তিরের মেয়েটার কথাও জানে সে। মেয়েটার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। তার সঙ্গেও মেশে। হাসপাতাল না ছাই—ওই একপাল বানে

ডোবা জ্বরো রুগীদের সেবা করার নামে সেখানে নাটক অনেক কিছু হয়। রাধারাণী সেখানেও থাকে আজকাল।

ভজন দাস এসবগুলো দেখেছে। কিন্তু তখন তার পূর্ণতার দিনে রাধারাণীর প্রতি ছিল বুকভরা স্নেহ-সমবেদনা। একটা মেয়ের চরম দুর্ভাগ্যের জন্য ভজনও দুঃখ বোধ করতো। মনে করত অসহায় একটা মেয়ের উপর চরম অবিচারই হয়েছে।

ক্রমশঃ এই বন্যার তাণ্ডবে ঘরবাড়ি জমি জারাত সব হারিয়ে আজ পথে নেমে ওর চোখের সামনের দুনিয়াটার আসল রূপ যেন ধরা পড়েছে। সেই স্নিগ্ধতা—মনের দয়া মায়াগুলো মুছে মুছে যাচ্ছে। নোতুন চোখে দেখছে ভজন আজকের নিঃস্ব রিক্ত পৃথিবীকে।

শ্রীধর দাস দেখছে ভজনকে।

বলে সে—মানে রাধা তো ভালো মেয়ে, তাই কথাটা বললাম। ও আমার নিজের মেয়ের মতই।

ভজন বের হয়ে আসছে। আজ মনে হয় এক হাতে তালি বাজে না। শ্বশুরবাড়ী থেকে বিতাড়িত হবার মূলে রাধারও কিছু দোষ ছিল। আজ দেখছে সে রাধার ব্যবহারগুলোও কেমন বিচিত্র। কোথায় যেন একটা কঠিন সত্যকে সে দেখেনি। মনে হয় তাকে তার ভাগ্য নয়, নিজের মেয়ে রাধাও ঠকিয়েছে। মেয়েকে ঠিক চেনে নি সে। দাসজী বিচক্ষণ ব্যক্তি— তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি রাধা।

রাধা ওই সন্তোষকে দেখার পর থেকেই অনেক কিছু ভেবেছে। সন্তোষ যেন তাকেও একনজর দেখেছে, আর রাধা দেখেছিল তার চোখে চকিত বিস্ময়, কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত, তাছাড়া সন্তোষ যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে তাকে।

তবু রাধা তার কথাটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। মাধববাবুর সেই ঘটনার পর রাধা নোতুন করে কথাটা ভেবেছে। নিজের স্বামীকে

এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও ভুলতে পারেনি রাধা। হিন্দুর ঘরের বৌ, স্বামীর ঘর হারিয়ে স্বামীকে না পেয়েও দুর থেকেও তার কল্যাণ কামনায় সে এখনও শাঁখা সিন্দুর পরে এয়োতির সবচিহ্নই রেখে চলেছে ; সন্তোষের বাড়ির খবর আর জানে না সে।

রাধারাণীরাও তাদের পুরোন গ্রাম ছেড়ে বাবার সঙ্গে এই রূপগঞ্জে এসে বসবাস করছে এখবরও জানে না সন্তোষ। তাই বোধহয় ভাবতে পারে নি সে যে তারই স্ত্রী রাধাকে এখানে দেখবে।

ওদিকের টানা কাছারি বাড়ির এককোণের একটা টালির চালায় রয়েছে সন্তোষ। স্যাঁৎস্যাঁতে মাটি—তাতেই কিছু খড় পেতে একটা চাটাই এনে বিছিয়ে রাজশয্যা বানিয়েছে।

কদিন বৃষ্টি জলে—বন্যার স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষগুলোকে উদ্ধার করে গা গতর ব্যাথা করছে সন্তোষের, শরীরটা ভালো নেই। জ্বর জ্বর ভাব। এখানে আসার আগেকার সেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই-এর দৃশ্যগুলো বার বার মনে পড়ে।

বাঁধের সব জল এসে ধুয়ে নিয়ে গেল বাড়িঘর, বুড়িমাকেও। আর ঘরের চালাটা হঠাৎ দমকা স্রোতে ভাসমান হয়ে রাতের অন্ধকারে এসে অজয়ে পড়লে। একটা একটা প্রাণকে যেন ছিনিয়ে নিল রুদ্র ভৈরবের গ্রাস।

ধ্বংস মৃত্যু আর সবহারানোর পালা। সন্তোষ সেই দৃশ্য গুলোকে ভুলতে পারেনি। হঠাৎ তার পর এখানে এসে ঠাঁই পেয়েছিল এদের দয়ায়। তার পরদিনই দেখেছিল একটা চেনা মুখ ; সেই চাহনিটাকে।

সন্তোষ সেই অতীতে তাকে আশ্রয় দিতে পারেনি। ভুল করেছিল সে। তারপর সব হারিয়ে গেল। কিন্তু রাধারাণীদের এখানে দেখবে ভাবেনি সে। তারাতো অনেক দূরের গ্রামের বাসিন্দা, অজয় থেকে অনেক দূরে তাদ্রের গ্রাম।

এখানে তারা আসেনি। এ বোধহয় অন্য কোন মেয়ে।

রাধা হারিয়ে গেছে। তার শূন্য নিঃস্ব জীবনে আর কোনদিনই আসবে না পূর্ণতার কোন স্নিগ্ধতা। নিঃস্ব ঊষর সবহারানোর শূন্যতা ভরা পৃথিবীর পথে একাই তাকে চলতে হবে। সেই চলার তুনিয়ার নোতুন রূপটাকেই দেখেছে আজ সন্তোষ।

একটা মোমবাতি জ্বলছে কলুঙ্গীর উপর। মিট মিট করছে আলোটা। ওটুকুকে নিভিয়ে দিয়ে এবার শুয়ে পড়বে সন্তোষ। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল।

—কে ! রূপেনদা—দ্বিজেনবাবু ?

হয়তো কোন দরকারে তারা ডাকতে এসেছে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে ওই মোমবাতির আলোয় কাকে দেখে চমকে ওঠে সন্তোষ। আবছা আলোয় দেখা যায় সেই মুখ সেই চোখ আর ডাগর অসহায় মিনতিভরা চাহনি, য' সন্তোষকে আজ থেকে তুবছর। অতীতের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

অবাক হয় সন্তোয—তুমি ! রাধা !

রাধারাণী ওখান থেকেই দেখছে ওকে। অবাক হয় সন্তোষ।

—চিনতে পেরেছো তাহলে ? রাধা বলে ওঠে।

ওর কথার সুরে বেদনার বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে। রাধা বলে।

—সেদিন তো চিনতেই পারলে না।

সন্তোষ জবাব দিল না। দেখছে সে রাধাকে। রাধাও দেখছে লোকটাকে—আজকের এই নিরাভরণ নিঃস্বতার ছায়া ওর চারিদিকে। সানকিতে তু'খানা রুটি আর একটু গুড় পড়ে আছে। আর খড়ের উপর আশ্রয়। মুখে একমুখ দাড়ি, চোখতুটো তবু তেমনি উজ্জ্বল আর সুন্দরই রয়ে গেছে।

সন্তোষ শুধোয়—ভালো আছো তো ? বাবা কেমন আছেন ?

—ভালোই ! দেখছো তো কেমন আছি সবাই ! রাধা ম্লান স্বরে জানায়। সন্তোষও জানায় তাদের সর্বনাশের কথা। কি ভাবে ভেসে এসেছে এখানে সব হারিয়ে তাও বলে। রাধা চুপ করে

শুনছে কথাগুলো। সন্তোষ বেদনার্ত কণ্ঠে বলে—সব হারিয়ে গেল রাধা। এখন পড়ে আছি শুধু একা আমি।

রাধার মনে ওই অসহায় মানুষটির কণ্ঠের বিষণ্ণতা নজর এড়ায় নি। আজ যেন সেও একা। রাধা নিজেকে আজ নিঃসঙ্গ বোধ করে।

পুরোনো দিনের সেই তিক্ততাটুকুর জ্বালাও যেন ভুলে গেছে সে। সন্তোষের সব হারানোর দুঃখে সে আজ সমব্যাথী হয়ে উঠেছে। শুধোয়—খাচ্ছো কোথায় ?

সন্তোষ হাসল। এখন তার মাতৃদশা চলেছে। শোক করারও সময় নেই। বলে সন্তোষ—যা জুটছে খাচ্ছি। অপঘাত মৃত্যুর অশৌচ তিনদিন। সেটা পার হয়ে গেছে। মা আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

চুপ করে থাকে রাধা। তারও আজ অশৌচান্ত। নিজের এই পরিচয়টাকে সে মুছে ফেলতে পারে না।

ওদিকে লোকজনের কথার শব্দ শোনা যায়। সন্তোষ বলে—কারা আসছে।

অর্থাৎ রাধার সঙ্গে কথা বলার অধিকারও তার নেই। রাধাও সেটা যেন বুঝতে পারে। গোপনে কোন পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করার অপরাধে যেন সেও অপরাধী। সন্তোষ বলে,

—তুমি যাও ! কারা আসছে।

রাধাও জানে এসময় তাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে অনেক কথাই উঠবে। তাই রাধা চুপ করে সরে এল।

ব্যাপারটা হঠাৎ নজরে পড়ে ভজনের। ভজনদাস শ্রীধরের ওখান থেকে ফিরছে। হাতে ওর দেওয়া টাকা ক'টা। তখনও ভজনের মনে পড়ে দাসজীর সেই কথাগুলো। রাধার সম্বন্ধে এসব কথা কোনদিনই ভাবেনি সে, আজ নোতুন করে ভাবছে।

হঠাৎ ওপাশের ঘরের দরজায় রাধার সঙ্গে একটি ছায়ামূর্তিকে

ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে দেখে একটা আতাগাছের ঝোপের আড়ালে থমকে দাঁড়াল ভজন।

নিজের চোখকে সে আজ অবিশ্বাস করতে পারে না। দাসজীর কথাগুলো মনে হয় মিথ্যা নয়। আবছা অন্ধকারে সে ঘরে ঢুকে গেল আর রাধা নেমে আসছে বারান্দা থেকে। ওদিকে চলে গেল।

ভজনের মনে হয় লাফ দিয়ে গিয়ে ওই মেয়েটার টুঁটি টিপে ধরে শেষ করে দেবে তাকে। এতদিন ধরে শুধু রাধা তাকে ঠকিয়ে এসেছে। আজ তার চোখের সামনে ধরা পড়ে গেছে রাধার কুকীর্তিটা।

তবু ভজন কেন জানে না পারল না।

রাধা চলে গেল। ভজনদাসের চোখের সামনে দুনিয়া, আর এই মানুষগুলোর রূপ কি কদর্যতায় মলিন হয়ে উঠেছে।

ভজনদাস ওর ঘরে ফিরে অবাক হয়—তখনও রাধা ফেরেনি। ব্যাং আনমনে খোলটা নামিয়ে নোতুন ষোলকুশী বিলম্বিত তালের বোল তুলছে তন্ময় হয়ে। মূল গায়েনের ডাকে চাইল।

—রাধা কোথায় রে?

ব্যাং-এর খেয়াল হয়। বলে সে—কোথায় যেন গেল গো। মন্দিরেই হবেক বোধহয়।

গজরে ওঠে ভজন—যমের বাড়ি গেছে সেটা। আসুক সে, ঝাঁটা পিটে করবো।

রাধা হঠাৎ ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো। সন্তোষের মা মরার খবর্ শুনে সে ওই কাপড়েই স্নান করে এসেছে। রাধাও শুনেছে বাবার কথাগুলো। আজ রাধাও অবাক হয়েছে। বাবা যে তাকে এমনি নোতুন ভাবে দেখবে ভাবেনি। রাধাও আজ চটে ওঠে। বলে রাধা।

—যমের বাড়ি যাবার পথ জানলে নিজেই এতদিন কবে চলে যেতাম। আর ঝাঁটা খাবার কাজ কি করলাম বাবা? বলো?

ভজন দেখছে রাধাকে। আবছা আলোয় ওর তেজদৃপ্ত মূর্তিটা যেন নোতুন করে দেখছে সে। রাধা দড়ির আলনা থেকে শুক্‌নো কাপড়টা নিয়ে ওদিকের আড়ালে চলে গেল। ব্যাং খোল বাজানো বন্ধ করে ওদের ছুজনকে দেখছে। ব্যাংও অবাক হয়েছে ওদের এ ভাবে কথা বলতে দেখে।

বলে সে—কি ব্যাপার বল দিন্ মূল গায়েন? রাধাও দেখছি বিজায় চটে গেছে গ!

ভজন জবাব দিলনা। আজ নোতুন করে দেখছে সে সবকিছু! মুখের উপর অনেক কথাই বলতে চেয়েছিল ভজন, কিন্তু পারে না। কেমন সব ঘুলিয়ে যায়।

রাধা কাপড় ছেড়ে ফিরে এসে বলে—মুড়ি গুড় দিচ্ছি, খেয়ে নাও।

টাকাগুলো দেখে অবাক হয়। রাধা শুধোয়—টাকা কোত্থেকে আনলে?

ভজন এই ব্যাপারকে চাপতে চায়।

তাই বলে—এমনিই আনলাম। ঘর বাড়ি তো তুলতে হবে।

রাধারাণী চুপ করে থাকে। ভজন কেন জানে না দাসজীর নামটা করে না ওর সামনে। ব্যাপারটা গোপনই রাখল সে।

কেশব মিত্তির গুম হয়ে বসে আছে প্রায়ান্ধকার ঘরের এক কোণে। চেহারাটা আরও শুক্‌নো হয়ে গেছে, দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ছুচোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। সামনে একটা জীর্ণ কাগজের ছক মেলা, ধীরাকে বলছে সে—ওই রাস্কেলরাই আমাকে যেতে দিল না, আই সাসপেক্ট সামথিং রং! জানিস গুপ্তধন—অনেক-অনেক আকবরী মোহর সোনার বাট সব আছে ওই বাড়ির মাটির নীচে, কেউ জানে না। আই ডোণ্ট কেয়ার গবা—ও আমার ত্যাজ্যপুত্র। একবার খপরও নিল না বেঁচে আছি না মরে গেছি। ওইসব সম্পত্তি যদি পাই কাউকে এক পয়সাও দেব না। নট এ পাই, তোকেও না। ওই

ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে কেন মিশিস ? ছ্যাট রাস্কেলস্।

ধীরা বাবার কথায় চাইল। ও বাড়ির মাসীমার উনুনে বাবার জন্য খানকয়েক রুটি করে এনেছে। সেগুলো দিতে দিতে বলে, চুপ করে খেয়ে নাও বাবা !

—নো ! হোয়াই চুপ করবো ? ফুঁসে ওঠে কেশব মিত্তির।

বাবার ওই কথাগুলো বেশ কিছুদিন থেকেই শুনেছে ধীরা।

ধীরা জানেনা রূপেনকে হঠাৎ কি করে ভালো লেগে যায় তার। সহজ মেলামেশার মাঝে ক্ষণিকের এই কঠিন সত্যকে অনুভব করে সে চমকে উঠেছিল, হয়তো তার নিঃশব্দ জীবনের মাঝে এসেছিল একটা মনোরম পরিপূর্ণতার আভাষ, সে বাঁচার স্বপ্ন দেখে রূপেনকে কেন্দ্র করে।

দাদার ঔদাসীন্য দেখেছে, নিজে তাই চাকরীর সন্ধান করেছে বাঁচার জন্য। কিন্তু ধীরা কোন ভরসাই পয়নি, অন্য দিকে রূপেনের মনে নিজের এই প্রতিষ্ঠাটুকু তার কাঙ্গাল মন বার বার যাচিয়ে দেখেছে। কিন্তু কর্মব্যস্ত রূপেনের দিক থেকে সাড়া সে পায়নি।

কিন্তু ধীরাও চায় নি নিজেকে ছোট করে কিছু পেতে।

তবু বাবার ওই কথাগুলো ক্রমশঃ তার সারা মনে একটা জ্বালা এনেছে। ধীরা আজ বাবার কথায় বলে ওঠে।

--কি আজে বাজে কথা বলছো বাবা ! পাগলামি থামাবে ?

কেশব মিত্তির ফুসে ওঠে—আমি পাগল ? তোরাই আমাকে পাগল সাজাতে চাস, না ? তোর ওই দাদা—ছ্যাট গবুচন্দ্র, আর তুই ! কেন তা জানি ? তোদের নোংরামিটা দাপটের সঙ্গে চলবে, না ?

—বাবা ! ধীরা অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে।

ওই কথাগুলো তার সারা মনে আগুনের তাত এনেছে। এত কষ্ট করে ওই লোকটার সেবা করে চলেছে, নিজের ভবিষ্যতের দিকেও চায়নি। আর তার বদলে দিনরাত দেখেছে ওর চোখে অবিশ্বাস আর

ঘৃণার ছায়া।

ধীরাও এই অভাব দুর্ভোগের মধ্যে তার সব ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছে। তবু জবাবটা দিতে গিয়ে ও পারলো না। চুপ করে থাকে। কেশব মিত্তির গর্জায়।

—ওই মোহর সোনা পাই তারপর দেখে নেবে সবাইকে। কাউকে আমার চাইনা।

ধীরা দেখেছে একটা বিচিত্র বঞ্চিত লোভী অসহায় মানুষকে, নখদন্তহীন একটা জীব শুধু গজরায় আর গজরায় মাত্র, সামর্থ্য তার নেই।

রাত্রি নামে। ক্লান্ত বুভুক্ষু মানুষগুলো যেন অন্তহীন প্রতীক্ষা করে চলেছে রাত্রির প্রহরে, কবে আসবে আহার্য, তাদের আশ্বাস।

রাতের অন্ধকারে পানু ঘোষের বৌটা কঁকাচ্ছে খিদের জ্বালায়। রতন আর বুড়ো যতীন শঙ্করীকে নিয়ে ওদিকে গোয়ালঘরের চালায় এসে জুটেছে। …শঙ্করী কাঁদছে—তার বুক আজ খালি। বাচ্চা ছেলেটাকে ওরা কেড়ে নিয়েছিল জোর করে। বুঝেছে সে তার খোকন আর নেই। কাঁদছে সে, গলাটা ফেঁসে গেছে। বিকৃত কান্নার ক্ষীণ স্বর ছাপিয়ে বুড়ো যতীনের কাসির শব্দ ওঠে। যেন গলাটা চিরে যাবে।

দু'রাত্রি ঘুমায় নি রতন। তার চোখের সামনে তখনও সেই সর্বগ্রাসী বন্যার ভীষণ দৃশ্যগুলো ভেসে ওঠে, কোথায় সশব্দে মাটির কোঠা বাড়ি জলের মধ্যে ভেঙ্গে পড়ল, কার তীক্ষ্ণ অসমাপ্ত আর্তনাদ কানে আসে। চাপা পড়েছে মানুষটা ওই মাটির স্তূপের নীচে জলের অতলে। তার চীৎকারটাও অসমাপ্ত থেকে যায়, যেন কেউ কঠিন হাতে ওর গলাটা টিপে ধরে জীবনের সব কলরবকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

রতনের ঘুম আসে না। ওদের কাসি আর কান্নার শব্দে চমকে ওঠে

রতন—থামবি তোরা তুটোয় ? এত লুক মরে গেল, তোরা গেলি না
কেনে ?

যতীন চাইল ছেলের দিকে। এ যেন বেচে থাকার লড়াই। এত বিপদেও তারা বাঁচতে চায়, দরকার হলে একজনকে শেষ করে অন্য একটি মানুষ তার বাঁচার পথ খুঁজে পেতে চায়। বুড়ো যতীন বাঁচার এই পৃথিবীর কদর্য রূপ দেখে শিউরে উঠেছে। ক্লান্ত কণ্ঠে বলে সে।

—মরতে তো চাই রে, আর বাঁচায় কাজ নাই। তা শালো যম যে ভুলে গেইছে। তাই শুধু ধুঁকছি আর ধুঁকছি। যমও লেয় না!

ওদিক শঙ্করী তখনও কাঁদছে, গলার জোর ওর নেই—কান্নাটা ক্ষীণতর হয়ে আসে।

ওই অর্দ্ধ জাগ্রত মানুষগুলোর জগতের বাইরেও অন্য জগৎ আছে। গিরিধারী আর ক'জন বের হয়েছে নৌকা নিয়ে। নৌকা তুটো বাঁধাই ছিল। এখন ওদের দখলে। জলবন্দী গ্রামের মানুষগুলো ঘরবাড়ি ছেড়ে আটকে রয়েছে এখানে। রাতের অন্ধকারে ওরা বের হয়েছে, বাক্স প্যাটরা গৃহস্থের দামী কাঁসার বাসনপত্র চুরি করতে, সেগুলোও কম নয়।

গিরিধারী তার তু'চারজন অনুচরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ওই সব মালই চুরি করতে বের হয়েছে।

পচা বলে—শালো মিত্তির বাড়ির দামী দরজা কপাট উপরের ঘরের ঝাড় লণ্ঠন গালচেগুলোও আনতে হবে।

গিরিধারী জানে পুরোনো বাড়িটার সব গেলেও অতীত সম্পদ কিছু কম নেই। বার্মা সেগুনের জানলা দরজাগুলোর অনেক দাম।

গিরিধারী বলে—ওগুলো রাতারাতি পাচার করতে হবে ওপারে।

মাথা নাড়ে পচাই—তা হবেক, কিন্তু শ্লা কুনকালের ভাঙ্গা ভিটের রাজ্যি, সাপ যা আছে মাইরি !

গুপী বলে—সে শালারাও ভেসে গেইছে, আর ওই মিত্তির কত্তার

সেই গুপ্তধন মানে মোহরের হাঁড়ি যদি মেলে।

গিরিধারী এই রাতে গা গরম করার জন্য ত্বুবোতল ধেনো মদও তুলেছে নৌকায়। গলায় মদ ঢেলে বলে সে।

—গুপ্তধন না ইয়ে আছে শালোর! নে চল, সব পাচার করে দাসজীর কাছে আসতে হবে। দামপত্তর কালকের মালেরও পাইনি।

গবা বলে—ও শালো ঠ্যাটা গো।

গিরিধারী তা জানে, অনেক কুকর্মের সঙ্গী সে। দামটা অবশ্য মিটিয়ে দিতে একটু বেগ দেয় শ্রীধর দাস। তবু গিরিধারী বলে।

—ওর বাপ দেবে। পঞ্চাশ জোড়া দরজা কপাট দিচ্ছি। বড়গাকড়ি কতো তার ঠিক নাই, সব গেছে শিবপুর গুদামে। আর কাঁসার পেতলের বাসন তো তুদিনে বাইশ বস্তা দিছি—দাম দেবে না মানে?

ওদের অন্ধকারের জীবনে ক্লান্তি নেই! জমাট নিরন্ধ্র অন্ধকার। মেঘগুলো আকাশ থেকে তখনও ধুয়ে মুছে বৃষ্টির পালা শেষ করে ফিরে যায় নি।

ওরা মিত্তির বাড়ির ধ্বংসপুরীতে এসে নৌকা ভেড়ালো, তখনও একতলার জল নামেনি, নৌকাটা গিয়ে উঠোনের ধারে ভাঙ্গা দরদালানের বুক ভোর জলের ধারে ঠেকেছে।

ছায়ামূর্তির মত লোকগুলো নেমে যায়। অন্ধকারে গিরিধারীর টর্চের একফালি আলো ছুরির ফলার মত বিঁধছে। ভাঙ্গা দেওয়ালে রং-এর বিবর্ণ ছাপ। দরজাগুলো বিরাট, জব্বর সেগুনকাঠের তৈরী, সাবল দিয়ে চাড় দিতে চুনপলেস্তার সঙ্গে ভিজে ইটগুলো খুলে যায়।

পচা বলে—আয় বাপ! শালো বাহারি কাঁচের ঝাড় গো!

এ যে নেত্যশালা ছিল, মাগীরা ঘাঘরা পরে যা নাচন নাচতো। শালো যেমন নাচন আর তেমনি মাজা ঘোরানো।

পচা মালের নেশায় তুপাক নেচে নিয়ে বাড়িটা দেখছে, বহু টাকার মাল।

—ফোঁস—স্—

—অয় বাপ্! শালো সাপ গ! ইয়াসাপ!

ভাঙ্গা বাড়িতে জল ঢুকতে সাপটা বোধহয় দোতলার এদিকেই আশ্রয় নিয়েছিল। ওদের পায়ের শব্দে চকিতের মধ্যে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গিরিধারী টর্চের আলোয় দেখছে ওটাকে, বিরাট সাপটা ঈষৎ দুলছে, আলোয় চিকচিক করছে ওর হলুদ আভা মাখা গা—দুচোখে নীল মৃত্যুর আভা···মার—গুপে!···

গুপীর সাবলটার প্রচণ্ড আঘাতে সাপটার কোমর ভেঙ্গে গেছে। মেজেতেই ছোবল মেরেছে, তার সঙ্গে সঙ্গেই গবার হাতের সাবলের আঘাতে মাথাটা চেপ্টে যায়। ল্যাজ, আর লম্বা দেহটা তখনও পরাজিত মৃত্যু যন্ত্রণায় নড়ছে। গজরাচ্ছে গিরিধারী।

—লে ঝাড়টা নামা। হুঁশিয়ার হয়ে নামাবি, যেন ভাঙ্গে না। ওই পাল্লাগুলোও খুলে নে। গুপী ঠাকুরঘরে ঢুকে ছাখ শ্লা, ঠাকুরের বাসনপত্র সোনাদানা যা পাস নিয়ে নে।

গুপী বলে—ঠাকুর যি গো? ঠাকুরের ইসব চুরি করবো? পাপ হবেক নাই?

গুপীটা এই লাইনে নোতুন। চাষ-বাস করতো, দিন মজুরী করতো সে। ঘরবাড়ি হারিয়ে ওইখানে আশ্রয় নিয়েছিল। খেতে পায়নি দুদিন। দাসজীকে বলে গিরিধারী ওকে চাল-পয়সা কিছু দেয়। অবশ্য একরাতের রোজগারেই তার দাম মিটিয়ে দিয়ে গুপী হাতে পেয়েছে নগদ বাইশ টাকা। ভালো রোজকার।

গিরিধারী বলে—শালো মাঠে কাদা ঘেঁটে দিনভোর চাষ করে কি পেতিস রে? ই লাইনে থেকে যা।

গুপীর মনে ছিল ইতঃস্ততঃ ভাব, বলে সে—ইতো চুরি করা গ!

—ভারি আমার সাধুর মাগের বাচ্চারে! কোন ব্যাটা চুরি করে না হে শালো? ওই হরিনাম করা দাসজী আমাদের চুরির মালের সামালদার। ওই মাধববাবু তো ডাকাত মদখোর মাগীবাজ।

অবাক হয় গুপী। মাঠে চাষবাস করতো। বাবুদের দেখেছে দূর থেকে। ওদের সম্বন্ধে এসব ধারণা তার ছিল না। গুপী বলে —এসব কি বলছিস গিরি? বাবুরা এমনিই।

হাসে গিরিধারী—একটা ডবকা ছুঁড়ি দিয়ে ছাখনা মজা, একবোতল বিলেতী দিয়ে ছাখ কেমন পেঁদিয়ে দেয়। ওরা ডাকাত রে। রিলিফ এলে হয়, দেখবি মজা—দোষ শুধু তোর আমার বেলায়।

গুপী পেটের জ্বালায় আর দমকা লোভের জন্যই দলে ভিড়েছে। গিরিধারী জানে ওর দেহের শক্তির খবর। এক চাড়ে দরজাগুলো খুলে ফেলছে।

ঠাকুরের ঘরে চুরি করার ব্যাপারে ওর ইতঃস্ততঃ ভাব দেখে গিরিধারী বলে—শালো সাধুপুরুষ এয়েছেন রে? পাপ হবেক! বান্‌চোত! যা বলছি কর। ঠাকুর বাকুর ফৌত হয়ে গেছে উ শালো বাবুদের সাথে নালে রোজ এত ডাকাডাকি, পেন্নাম করার পরও উদিকে পালিয়ে গিয়ে ওই গোয়ালে ঢুকতে হয় তুর আমার মতন? ঠাকুরের মহিমাও শ্লা ফুটে গেছে! নে, তোল তোরঙ্গটা আমিই শ্লা গিরিধারী নিজেই ঠাকুর। এই ছাখ।

গিরিধারী ওদিকের ঠাকুরঘরে ঢুকে নিঃসঙ্গ রাধামাধবের হাতের পেতলের বাঁশিটা নিয়ে বঙ্কিম ঠাটে বোতল বগলে দাঁড়িয়ে পুঁ পুঁ শব্দে বাঁশী বাজাচ্ছে। হঠাৎ হেসে ওঠে—একটা ডব্‌কা রাধাকে পেলে বেশ জমতো মাইরী এসময়!

গুপী বলে—রাধাতো আছে গো! ওই চাতালে ভজন দাসের মেয়ে রাধা, বেশ ডব্‌কা মাল।

গিরিধারী কি ভাবছে। চমকে ওঠে—নে, জলদি কর। এরপর মালপত্তর তুলে দিয়ে এসে দাম লিতে হবে দাসজীর কাছে।

শম্ভু আগে সিটকে চুরিই করতো। একমাত্র ছেলেটা মারা যাবার পর থেকে ওসব ছেড়ে দিয়েছে। তার বৌ বলে। —পরের অনেক সর্বোনাশ করেছো, হরে হম্মে লিয়েছো সব, তাই

ভগমান আমার একটা ছেলেকেই হরে লিল গ'। সেই পাপেই আমার সব গেল। তুমি মানুষ না মান্‌সুরে!

চুপ করে শুনেছিল শম্ভু ওই হাহাকারভরা কথাগুলো। হয়তো কথাটা সত্যি। ভগবানের বিচারে তাই তার সব হারিয়ে গেল। শম্ভু বলেছিল—তুকে কথা দিছি বৌ, ভগমানের নামে বলছি উ কাজ আর করবো নাই! একবাপের বাচ্চা হইতো ই কথার লড়চড় হবেক নাই!

শম্ভু সেদিন থেকেই ওসব কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের বিঘে কতক জমি নিয়েই পড়েছিল।

এখানে এসে শম্ভু আরও বিপদে পড়েছে। খাবার নেই কিন্তু জানে শম্ভু মাধবঠাকুরের ভাঁড়ার ঘরের খবর। সেদিন মাছ একটা দিতে গিয়ে সন্ধানী চোখ মেলে দেখে এসেছে চাল-তেল-ঘি-ডালের বস্তা সবই সাজানো আছে। ওদের ঘরে অভাব নেই।

…চুরি করতে চায় নি শম্ভু।

মরা ছেলের নামে দিব্যি করেছিল। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তুদিন ধরে প্রায় না খেয়েই আছে। তাই বের হয়েছিল রাতে। ঘুম আসেনি খিদের জ্বালায়।

পেটের মধ্যে নাড়িগুলো পাক দিয়ে আসে। ওতে ঘুমও ভুলে যায় মানুষ। শম্ভু দেখছে চারিদিকে চোখ মেলে। অন্ধকার নেমেছে এখানে। তবু শম্ভুর বহুদিনের অভ্যস্ত চোখে এ আঁধারও স্বচ্ছ হয়ে আসে।

…ঘটি বাটি এসব মেলে এখানে, কাপড় গহনাও।

কিন্তু এসবের দরকার তার নেই, দরকার কিছু চালের।

বৌটাও উপোস দিয়ে আছে। শম্ভুর মনে হয় আর সহ্য করা যায় না। রূপেন মাষ্টারও বলেছে রিলিফ আসবেই। একমুঠো চাল যেন তার মনের ভালো হয়ে থাকার ইচ্ছেটাকেও ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়।

ঠাকুরবাড়ির পাঁচীলটার দিকে চেয়ে দেখছে। শেওলা ধরা পাঁচীলটা টপকে গেলেই ওদিকে ভাঁড়ার ঘর, চালের বস্তা সাজানো আছে থরে থরে। ক্ষুধায় অন্ন! পেটের এই দুঃসহ জ্বালাটা থেমে যাবে ওই চালে।

ভাতের স্বাদটা জিবে লাগে, ভাত আর আলু সেদ্ধ।

মনে হয় খাচ্ছে সে তৃপ্তি ভরে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে শম্ভু, পিছন দিকে একটা যজ্ঞি ডুমুর গাছ-এর ডাল পাঁচীলে ঠেকেছে; সেখান দিয়ে টপকানো যাবে। সারা বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ শম্ভুর অভ্যস্ত কানে ঠেকে নৌকার শব্দ, নৌকাটা এদিকেই আসছে অন্ধকারে। দুবার টর্চের আলো জ্বলে জ্বলে নিভে গেল। ব্যাপারটা কেমন সন্দেহের মতই মনে হয়।

শম্ভু ঝোপের আড়ালে সরে গেল।

আবছা অন্ধকারে দেখে শম্ভু ওদিকের ঘর থেকে একটা লোক বের হয়ে এল আলোর সঙ্কেত দেখে, লোকটাকে চিনেছে সে।

শ্রীধর দাসই। নৌকা থেকে নামছে গিরিধারী আর দু'জন হালে দাঁড়ে বসে আছে। দাসজী বলে!

—সব সাফ?

গিরিধারী মাথা নাড়ে। দাসজী বলে।

—মালপত্র শিবপুর নিয়ে চলে যা, ওখানে ট্রাক থাকবে।

গিরিধারীর হাতে টাকাটাও দেয় সে। শম্ভু দেখছে ব্যাপারটা। তার মনে হয় একটা কিছু ঘটছে আর দাসজীকে টাকা দিতে দেখে বুঝেছে ব্যাপারটা লাভেরই। নাহলে গিরিধারীকে এত সহজে টাকা দিতনা দাসজী।

নৌকায় দেখাযায় আবছা আলোয় বাসনপত্র, কাঁচের বিরাট ঝাড়, দরজা কপাট, কারোগেট টিন, টিউবওয়েলের মাথা, বাক্স টাক্স রয়েছে!

গিরিধারীরা চলে গেল নৌকা নিয়ে। অন্ধকারে জলের বুকে ঝপ ঝপ দাঁড়পড়ার শব্দটা মিলিয়ে যায়। দাসজী মনে মনে খুশী হয়েছে।

সামান্য টাকার বিনিময়ে যা পাচ্ছে তার দাম অনেক। আর ওই হিংস্র লোকগুলোও তার হাতে থাকছে। দাসজীর ওই অন্ধকারের জীবদের হাতে রাখা দরকার।

…হঠাৎ আঁধার ফুঁড়ে সামনে কাকে দেখে চমকে ওঠে শ্রীধর দাস।

—তুই! চুরি করতে বেরিয়েছিস ব্যাটা চোর কোথাকার?

হাসছে শম্ভু—পেস্বাব বসছিলাম গো।

—মিছে কথা! চল পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিচ্ছি তোকে! বানে ডুবছে সারা দেশ আর তুই ব্যাটা সিঁধেল চোর, এখনও ঘুর ঘুর করছিস চুরির মতলবে!

দাসজী বেশ রাগতভাবেই কথাগুলো বলে, কিন্তু শম্ভু নির্বিকার ভাবে বলে ওঠে।

—আর চুরি করা আমাদের হবেক নাই গ, তোমাদের মত লোক ডাকাতির সামালদারি করছো, দিনে ডাকাতি করছো। রুই কাতলা যদি ঘাই মারে—চুনো পুঁটির দাপানি তো ঠাণ্ডা হবেক গ। আমাদের ভাত আর থাকবেক দাসমশাই?

গিরিধারী গুপী বাবাকে দেখলাম নৌকায়, তা মালপত্তর ভালোই টেনেছে নাগলো। মিত্তির বাড়ির বাহারী ঝাড়টা দেখলাম। কি দাম গ! কত্‌কে হ'ল?

চমকে উঠে দাসজী—এ্যাই! কি যা তা বলছিস?

শম্ভু বলে—ট্যাকাও দিলা দেখলাম ওখান থেকে! তালে ডাকি বাবুদের, রুপু মাষ্টারকেও। লা লিয়ে গেলে নামোপাড়ার মুখেই তাদের পাবেন। এখনও লদী পার হয়ে শিবপুরে মদনের ডেরায় মাল পৌঁছে নি।

…দাসজীর এবার বিষম খাবার পালা। ব্যাটা সব আটঘাট জেনে ফেলেছে, ব্যাটা চোর মালের খবরও জেনেছে। দাসজীর সেই তেরিয়া ভাবটা মিলিয়ে গেছে। একটা পথ বের করতেই হবে, নাহলে শম্ভু গোল ঘাট করে দিলে সব ধরা পড়ে যাবে হাতে নাতে।

চতুর দাসজী তক্ষুনিই গদগদ স্বরে বলে।

—কি করছে ওরা কে জানে ! মরুক গে—তুই বরং বিশ টাকা রাখ, যা দেখলি শুনলি পাঁচকান করে কি লাভ হবে বল ? ধর টাকাটা।

শম্ভু দেখছে দাসজীকে। নিমেষের মধ্যে লোকটা বদলে গেছে। শম্ভু ওর বিনয়াবনত মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে। পেটের জ্বালাটা চনচনিয়ে ওঠে। তার দরকার চাল-এর, চাই ক্ষুধার অন্ন।

শম্ভু বলে—ট্যাকার দরকার নাই। উ লিয়ে কি চিবিয়ে খাবো।

দাসজীও তা জানে। তাই বলে সে—কাল সকালে আসবি সব পাবি। চালও দোব।

সকাল হয়। মেঘের ঠাস বুনোট ভাবটা এবার কমে গিয়ে মাঝে মাঝে চকচকে হয়ে ওঠে, মেঘ ভেদ করে সূর্য উঠছে, সেই আলোর আভাসটুকু এদের মনে কোন আশার সঞ্চার করতে পারেনি। লোকগুলোর মুখেচোখে জমাট হতাশা নামে।

চারিদিকের জলবন্দী মানুষ চেয়ে থাকে ওই জলরাশির দিকে। ঠাঁই ঠাঁই মাটি জাগছে, মাটি নয় বালিচর।

খগেনবাবুও নেমে এসেছে। খবরের কাগজ এখন স্বপ্ন। ওরা যেন অন্য কোন জগতে বাস করছে। খগেন বলে।

—অল আণ্ডার ওয়াটার, রূপেন ! নাও কামস্ ল্যাণ্ড প্রবলেম।

জমির সমস্যা চিরন্তন। আর সেটা এবার বড় হয়ে, নোতুন করে দেখা দিয়েছে। ভাগচাষ আর তার স্বত্ব নিয়ে গোলমাল তো বেঁধেই রয়েছে। সগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, নোতুন সেটেলমেণ্টের জন্য।

খগেনবাবু বলেন—লাণ্ড স্যাড গো টু দি টিলার্স হে ! এতো কথার কথা। কিন্তু হোয়াট এ্যাবাউট আদারস্ ! অন্য সকলের কি হবে ? ছোট খাটো মালিকদের অবস্থা ? তারা কি ওই বানের জলে ভেসে যাবে ?

দ্বিজেনও এসে জুটেছে। সে বলে।

—এসব নিয়ে ভাবতে হবে খগেন কাকা। এক কথায় এক হাঁকে সব কিছু সমাধান হবে না।

—কারেক্ট!

রূপেনের এখন অন্য ভাবনা। ওদিকের চালের ভাঁড়ার ফুরিয়ে আসছে। সন্তোষও সঙ্গে রয়েছে। রূপেন বলে।

—ওসব ভাবনা পরে হবে দ্বিজু, খগেন কাকা। এখন চাল ডাল কিছু দরকার। রিলিফের জন্য খবর গেছে—ওরা নৌকা নিয়ে আসতে পারছে না, আমাদের গিয়ে আনতে হবে। এ বেলার মত খাবার চাই। এসব কথা ভাবুন। জমির সমস্যা জল মরুক, জমি জাগুক—তবে ভাবা যাবে।

দ্বিজু চুপ করে যায়। তার কথাটা যেন রূপেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে! রূপেন বলে—সন্তোষ যাচ্ছে, ডিঙ্গি নিয়ে রিলিফ-পার্টির সন্ধানে।

সন্তোষ চলে গেল।

খগেনবাবু ওই চালের কথায় চুপকরে গেছে। ওদিকে বাচ্চাগুলো লোকজনের বুভুক্ষু মুখগুলো চোখের সামনে ফুটে ওঠে। রূপেন কি ভাবছে।

ভজনদাসকে দেখে চাইল রূপেন।

ভজনদাস বাইরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে দাসজীর নৌকার দিকে চলেছে।

রূপেন শুধোয়—কোথায় চল্লে মূল গায়েন!

পথ ঘাট ঠিক নেই তবু ভজনদাস কাল রাত্রিতেই মন স্থির করে ফেলেছে। যে ভাবে হোক তাকে বের হতে হবে টাকার সন্ধানে। বর্দ্ধমান-দুর্গাপুর-কোলিয়ারী অঞ্চলে তার বাঁধা আসর কিছু আছে। সেখানেই দেখবে সে কিছু টাকা যদি পায়, আর দরকার হলে রাধাকেও নিয়ে যাবে। তাকেও গাইতে হবে এবার।

মেয়ে কীর্তনীয়ার গানের বিশেষ কদর আছে। রাধার কালরাতের ব্যবহারটায় মনে মনে বিরক্ত হয়েছে ভজনদাস। তবু একটা কাজের মধ্যে এই কীর্তনের ধারার মাঝে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চায় সে। মেয়েটা নিজে খ্যাতি—টাকা পয়সার মুখ দেখলে হয়তো বদলাবে।

রূপেনের কথায় ভজনদাস বলে।

—দাসজীর নৌকায় ইলামবাজার অবধি চলে যাবো, সেখান থেকে দেখি কোন প্রকারে পানাগড় যেতেই হবে বাবা। এখানে তো পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া পথ দেখিনা—যাই যদি কোন ব্যবস্থা করা যায় দেখিগে!

…দাসজীর নৌকায় গিরিধারী আর শম্ভুও চলেছে মালপত্র আনতে। ভজনদাসও গিয়ে উঠলো। শম্ভুকে একরাতেই নোতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে দাসজী। শম্ভু তাড়া দেয়—চলো গো মূলগায়েন। ভজনদাস বলে—যাই রূপুবাবু! ওরা থাকলো দেখবেন।

খগেন বলে—বাঁচার লড়াই হে! বেচারা কীর্তন গেয়েই বাঁচতে চায়। লেট হিম গো।

নৌকায় উঠল ভজনদাস যেন অনিচ্ছাসত্বেই। বাঁচার জন্যেই যেতে হবে তাকে।

…রূপেনই কথাটা বলে—চল দ্বিজু, মাধববাবুর ওখানে একবার চল। একটা দিন চালাবার মত কিছু চাল ওকে দিতে বলি। দাসজী-মাধববাবুদের সাহায্যও দরকার এখন।

দ্বিজু ওর দিকে চাইল। বলে সে—ওদের উপর চাপ দিবি?

রূপেন একটু অবাক হয় কথাটা শুনে, কোথায় দ্বিজেনের মনে যেন একটা চাপা সমবেদনাও রয়েছে ওদের জন্য। রূপেন সেটাকে আমল না দিয়ে বলে—চল, নাহলে কাল থেকে এদের কোন কিছু দিতে পারেনি। খিদের জ্বালার কাছে মান অপমান ভয় সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। একটা কিছু করতেই হবে।

মাধববাবু চুপ করে কথাটা শোনে। বেলা হয়েছে, তখনও নেশার খোঁয়াড়ীটা রয়েছে তার।

রূপেন বলে—কিছু চাল, ডাল যদি দেন, আজকের দিনটা তবু চলে যায়। রিলিফ এসে পড়বে তার মধ্যে।

মাধববাবু মনে মনে হিসাব কষে নেয়। অন্তত দশবস্তা চাল—দু'বস্তা ডাল—তার সঞ্চয়ের কিছু কুমড়ো-আলু-বাগানের শাকও যাবে।

বলে ওঠে মাধব—এত চাল কোথায় পাবো? মিলও বন্ধ—বরং দু'একশো টাকা দিতে পারি! চাল ডাল চেয়োনা। ওই নিয়ে যাও দ্বিজু।

দ্বিজু বলে—তাই নে রূপেন! এখন চাল মেলা ভার।

রূপেন বলে ওঠে—টাকা নিয়ে কি হবে? এখন খাবার চাই!

মাধববাবু বলে—কদ্দিন খাওয়াবে ওদের? দান করে বাঁচানো যাবেনা রূপেন, ওদের চাই কাজ আর খাবার দিতে হবে কাজের বদলে!

রূপেন বলে ওঠে—কিন্তু উপোস দিয়ে থেকে থেকে ওরা তো মরীয়া হয়ে উঠতে পারে। সেদিন কি আপনারাও নিরাপদে থাকবেন মাধবদা? তখন কি থামানো যাবে ওদের?

চমকে ওঠে মাধবঠাকুর। সে দেখছে রূপেনকে কঠিন দৃষ্টিতে।

মাধব জানে ছেলেটার স্বরূপ, একটু বেপরোয়া গোছের, তাই মাধববাবু বলে—অর্থাৎ জোর করে কেড়ে নিতে চাও? ভয় দেখিয়ে আমাকে শাসাতে এসেছো!

রূপেন উঠে পড়েছে। জানে এখানে কিছু পাবেনা তারা। রূপেন বলে—ভয় দেখাচ্ছি না, সত্যি কথাটাই বলছিলাম! চলো দ্বিজু।

ওরা চলে যায়। লাবণ্য বারান্দা থেকে দেখেছে নীচের ওই বুভুক্ষু জনতাকে। শুনেছে মাধববাবুদের কথা। ঘরে ঢুকে লাবণ্য চাইল মাধববাবুর দিকে—মাধব ফুসে ওঠে। কতবড় সাহস দেখলে? বাড়ি বয়ে সাত সকালে এসে শাসিয়ে যায় আমাকে? বাড়ি চড়াও হবে?

লুঠ করবে ?

লাবণ্য ভেবেছে কথাটা। এসময় তার স্বামীর ওই সিদ্ধান্তটাকে মেতে নিতে পারে না সে। লাবণ্য বলে।

—শাসায় নি রূপেন। ওই মানুষগুলো খেতে না পেয়ে যদি কিছু করে, কি করবে তুমি ? এত সঞ্চয় করে ওদের চোখের সামনে বসে থাকবে ? আর তাই চুপ করে দেখবে ওরা ? যদি তেমন কিছু করে—কে বাঁচাবে ?

মাধব দেখছে স্ত্রীকে। মাধব বলে ওঠে তীক্ষ্ণ স্বরে।

—দরদে যে গলে গেলে ? ওসব দরদ ঢের দেখা আছে।

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে চাইল লাবণ্য। মাথার ঘোমটা তুলে দিয়েছে দাসমশাইকে দেখে। দাসমশাই অবশ্য গলা খাকাঁরি দিয়ে ঢুকেছে, তার আসার খবরটা ওই ভাবেই জানান দেয় সে।

লাবণ্য ওই গোলাকার কণ্ঠিধারী মানুষটিকে সহ্য করতে পারেনা। মদের বোতল যোগান দেয় সে, নাকে নামাবলী চাপা দিয়ে মাংসও এনে দেয় মাধববাবুর জন্য।

লাবণ্য চলে গেল, স্বামীর কথার জবাবটা দিতে পারলো না আপাততঃ, তবে ওই ইঙ্গিতটা সে বুঝেছে। জ্বলে উঠেছে মনে মনে লাবণ্য মাধববাবুর এই হঠকারিতায়।

দাসজীও শুনেছে কথাটা।

বলে সে—রূপেনের সাহস একটু বেড়েছে ছোটবাবু। নাহলে বাড়িতে এসে এসব কথা বলে ? শুনলাম কথাটা !

মাধব চুপ করে গজরাচ্ছে। বলে ওঠে সে।

—পথঘাট খুলুক, এসব ডাঁট আমি ভেঙ্গে দেব ওর। আর রিলিফ এলে দাসজী, সে সব রিলিফের ভার নিতে হবে আপনাকেই।

দাসজী মনে মনে খুশীই হয়। তবু বলে সে,

—আবার এসব ঝামেলায় যেতে হবে এবারেও ?

সেবার বন্যায় অবশ্য মাধববাবুই ছিল প্রেসিডেন্ট আর দাসজীও

এসেছিল রিলিফের কাজে। ধুয়ে বেছে যা হাতে ছিল তার পরিমাণ কম নয়।

এবারও কিছু থাকবেই। দাসজী বলে।

—আপনি আদেশ করলে না করার সাধ্য আমার নেই। তবে জানেন তো এবারের ওই ছেলেছোকরাদের ব্যাপার আলাদা। ওরাই তো মাতব্বর!

মাধববাবু বলে—আমি নিজে এস-ডি-ও সাহেবকে বলবো।

দাসজী খুশী হয়। তবু বলে সে।

—আজ্ঞে ওদের একটু ঠাণ্ডা করতে হবে। মানে কোনরকম ঝামেলায় ফেলে একটু টাইট করা দরকার।

মাধববাবুও ভাবছে কথাটা। ওর মুখেচোখে ভাবনার ছায়া পড়ে। দাসজী বলে।

—আর ওই ভজনদাসের মেয়ের কথাটা আমার মনে আছে ছোটবাবু, কাজটা একটু গোপনে করতে হবে কিনা। সিধে কলবাড়ির বাংলোয় নে যাবো দেখবেন।

মাধববাবু চুপ করে কি ভাবছে।

শ্রীধর বলে—ভজনকে দেখলাম, ও তো চলে গেল কেত্তন গাইতে। মেয়েটা এখানেই রইল!

মাধববাবু এবার একটু কথাটা ভাবছে—তাই নাকি হে?

দ্বিজেন রূপেনরা নেমে এসেছে বাইরে! জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। নিরু ঘোষ, রতন বুড়ো, যতীন, নামোপাড়ার অগণিত বুভুক্ষু মানুষ কচি কাঁচার দলও জেনেছে ওরা চাল, এর জন্য গেছে মাধববাবুর ওখানে-ওর ধানকলে অনেক চালই আছে। দাসজীর গুদামও এখানে।

দ্বিজেন অন্ধকার প্রাসাদ এর মধ্যে রূপেনকে বলে।

—এটা কি করলি? ওরা যদি তাদের চাল না দেয়—এইভাবে শাসানো ঠিক হ'ল?

রূপেন যেন দ্বিজেনকে আজ নোতুন করে চিনছে।

ওই স্বার্থপর ধনী মানুষগুলোর হয়েই কথা বলে দ্বিজু। রূপেন বলে—আমি শাসাই নি দ্বিজ্। পরিস্থিতিটা বুঝে যা হতে পারে তারই জন্য সাবধান করেছি মাত্র।

বাইরে আসা মাত্র লোকজন ঘিরে ধরেছে তাদের।

—কই গো কিছু চাল ডাল পেলে? অ বাপু?

বুড়ো যতন চীৎকার করে—উদের এত থাকতে উপোস দিই মরতে হবেক? ক্যানে হে?

এ যেন কঠিন একটা প্রশ্ন। চারিদিকের বুভুক্ষু শীর্ণ মুখে এর প্রতিফলন ঘটে। মনে মনে ফুঁসছে ওই জনতা। ক'দিনে সয়েছে তারা অনেক যন্ত্রণা অনেক কষ্ট। আজ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আর মুখ বুজে থাকতে চায় না তারা। কে যেন গর্জে ওঠে—না! চাল দিতে হবেক উদের? পরে শুধে দিব। এখন চাই—

চমকে ওঠে দ্বিজু রূপেন—একি বলছিস?

রূপেন বলে—তুই ওদের থামাবার চেষ্টা কর। এমনি হবে তা জানতাম!

দ্বিজু বলে ওঠে—এসব খুব অন্যায়। থামো তোমরা।

ফুঁসে ওঠে যতন—কেনে থামবে? প্যাটের খিদেয় চেঁচাবে না? বলো?

ধীরে ধীরে একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। গুঞ্জরণ থেকে সোচ্চার হচ্ছে এদের প্রতিবাদ!

হঠাৎ ওই জলের দিকে নজর পড়ে ওদের! স্তব্ধ দৃষ্টিতে লোকগুলো দেখছে ওই দিকে, কি আশার আলো জাগে ওদের মনে।

দুটো নৌকা আসছে—পিছনে আর একখানা। কলরব চীৎকার ওঠে। লোকগুলো এক উত্তেজনা ভুলে আর এক নিবিড় উত্তেজনায় চীৎকার করে ওঠে।

কলরব, চীৎকার ওঠে। ওদের কণ্ঠস্বর মুখর হয়ে ঠাঁইটাকে

ভরিয়ে দেয়। দৌড়চ্ছে ওরা!

ওই আকাশফাটানো চীৎকার নীচে থেকে মাধববাবুর প্রাসাদেও এসে পৌঁচেছে!

চমকে ওঠে মাধববাবু—কি ব্যাপার হে?

মাধববাবুর মনে হয় ওরা এইবার খেপে উঠে এই প্রাসাদই আক্রমণ করেছে। রূপেন এবার ওই হাজারো মানুষকে লেলিয়ে দিয়েছে তার সর্বস্ব লুট করে নিতে।

ওরা লুট করবে, আগুন ধরাবে, হয়তো প্রাণেও মেরে রেখে যাবে। এসময় বাইরের কোন সাহায্যও আসা সম্ভব নয়। সন্তোষ গেছে, এখনও ফেরেনি।

এক সর্বনাশা মত্ততা এবার রুদ্র রূপে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে।

মাধববাবুও কঠিন স্বরে আদেশ দেয়—ফটক বন্ধ করো দ্বারোয়ান।

হঠাৎ দেখা যায় নৌকা দুটোকে। সন্তোষও রয়েছে। লোকজন ছুটে যায়, জলের ধারে যেন নৌকা দুটোকেই ডুবিয়ে দেবে। রূপেন সন্তোষ নীরু শশীপদরা এগিয়ে আসে।

কয়েক ড্রাম খিচুড়ি এসেছে। তবু এবেলার সমস্যার সমাধান হবে। নীরু বলে।

—সারবন্দী দাঁড়িয়ে যাও সবাই। গোলমাল করোনা।

থালা সান্‌কি বাটি যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই এসে পড়েছে। বুভুক্ষু মানুষগুলো আজ ওই খিচুড়িই অমৃত বলে খেয়ে চলেছে। চোখে মুখে কি তৃপ্তির ছোঁয়া ফুটে ওঠে।

বেশী কিছু চাহিদা তাদের নেই, রূপেন স্তব্ধ চাহনি মেলে দেখছে ওদের।

তিনতলার প্রাসাদে মাধববাবু মাছের চপ দিয়ে বিলেতী মদ খেয়ে চলেছে। দাসজী বলে—ওদের তড়পানি জানা আছে।

এক হাতা খিচুড়িতেই ঠাণ্ডা।

তখনও নীচের চত্বরে লোকজন ছেলেরা খিচুড়ির জন্য লাইন দিচ্ছে। চীৎকার-কলরব ওঠে।

নবীন ভটচায দেখছে নীচে খিচুড়ি উৎসব। তার ছেলেমেয়েরাও উসখুস করে সেখানে যাবার জন্য।

তাদেরও খাওয়া জোটেনি ঠিক মত। খিদেটা ঠেলে ওঠে। নবীনের বড় মেয়ে পটলি আর ছোট মেয়েটা জানলা দিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে বাইরে তিনু তাদের পাড়ার মালু আরও অনেকে খিচুড়ি খাচ্ছে।

—মা! মেয়েটা ফিস্ ফিস্ করে—খিদে লেগেছে মা!

নবীন ভটচায স্ত্রীর দিকে চাইল।

এ যেন তার চরম পরাজয়ই। সব হারানোর এক অলিখিত স্বীকৃতি। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ সে! গিরিবালাও দেখছে মেয়েটা খেতে পায় নি। বলে সে—যাক্ না। ছোট ছেলে মেয়ে কতক্ষণ খিদে সয়ে থাকবে বাপু? যাক্—

নবীন গর্জে ওঠে—না। মান সম্মান নেই? খবরদার যাবে ওরা! কাঙ্গালী ভোজনে যাবে নবীন ভটচাযের ছেলেমেয়ে? কভি নেহি।

মা হয়ে মুখের গ্রাস দিতে পারেনি, তাকে সেটুকু থেকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তিই সে খুঁজে পায় না। বলে ওঠে গিরিবালা।

—এমন মানসম্মানের ক্যাঁথায় আগুণ দিই। খেতে দিতে পারোনা আবার মান সম্মান! যাবে ওরা—

নবীন চমকে ওঠে। তার মুখের উপর যেন এক চড় মেরেছে কে!

—পুটুর মা! নবীন তবু আর্তনাদ করে বাধা দিতে চায়।

গিরিবালা আজ রুখে দাঁড়ায়—না! ওদের বাধা দিওনা। উপোস দিতে হয়, জাত নিয়ে উপোস দিয়ে শুকিয়ে তুমিই পড়ে থাকো। ওই দুধের বাচ্চারা কেন ভুগবে? যা তোরা—

ওরাও থালা বাটি নিয়ে দৌড়লো।

নবীন ওদের বাধা দিতে পারেনি। বের হয়ে চলে এসেছে।

সারা মনে ওর জ্বালা ফুটে ওঠে। এই সমাজ—ওই মানুষগুলো—এই সামগ্রিক বিপর্যয় সবকিছুর উপরই তার বিতৃষ্ণা ঘৃণা এসেছে। তার শেষ মর্য্যাদাটুকুও হারিয়ে গেল যেন আজ।

মনে হয় বানের স্রোতে সবকিছু ভেসে গেছে, ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে সব শুচিতা—মানবিকতা সবকিছু। নবীন বের হয়ে এসেছে। সামনে রূপেনকে দেখে বলে

—সব হারিয়ে গেল রূপেন।

রূপেন ওই সর্বনাশের কথায় বলে ওঠে—কিছুই যায় নি।

—মরতে পারলে শান্তি পেতাম রূপেন। সব হারিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি?

রূপেন বলে—ছিল কি ভটচায মশায়? মিথ্যা কিছু অভিমান, অস্তিত্বহীন ধর্মের ভেক আর ঝুটো আত্মসম্মানবোধ। পেট ভরে খেতে পাওয়া—ভালো ভাবে বাঁচার জন্য ভবিষ্যৎ-এর দিকে চেয়ে ওসব না হয় ছেড়েই দেন এবার। ওগুলো মূল্যহীন অসার হয়ে গেছে।

চমকে ওঠে নবীন ভটচায।

—এসব কি বলছো রূপেন?

বড়বাবু শুনছেন কথাগুলো—ব্রজদুলালবাবুও ভাবছেন। মনে হয় এমনি কোন পরিবর্তনই আসছে এবার।

নবীন ভটচাযও বুঝেছে বাচঁতে গেলে এবার বড়গাছে ভেলা বাঁধতে হবে। ওই মানুষগুলো অভাবের মুখে পড়ে সবাই বদলে গেছে। তারাও আজ তাকে আর মান্যি করে না।

গিরিধারী দলবল নিয়ে ফিরছে কোথা থেকে। ওদের মুখে সিগ্রেট, হাতের ব্যাগে তরিতরকারী। তাকে দেখে চাইল মাত্র। গুপীনাথ এককালে ছিল তারই কৃষাণ, আজ হঠাৎ দমকা রোজকারে সে বদলে গেছে। হেঁট হয়ে প্রণামও জানায় না। পচা বলে—শালো ঠাকুর যে চিমড়ে দড়ি মেরে গেছে গো!

হাসে গিরিধারী—বানের গুঁতোয় অনেক শালাই ইবার দড়ি পাকিয়ে যাবেক হে !···তা ঠাকুর মাশায় চলবেক টলবেক ? গা গতরে মাষ লাগবেক, খাটি জিনিষ গ !

গিরিধারী পকেট থেকে পাঁইট বোতলটা বের করে দেখায়। গুপী বলে—গঙ্গাজলে তৈরী কিন্তুক ঠাকুর।

হাসির ধূম পড়ে যায়।

নবীন চুপ করে সরে গেল। বেশ বুঝেছে নবীন দিনগুলো, আগেকার সেই শান্তির জীবন সব হারিয়ে গেছে। এই বন্যা তাদের জমি-ঘর বাড়িই কেড়ে নেয় নি, ছিনিয়ে নিয়েছে মানসিক সেই ভারসাম্যকে। আজ ভাঙ্গনের মুখে তাদের সব কিছু ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। আর তাই এই উন্মাদনা আর জ্বালা। ওরা শুধু ছোবলই মারতে চায়।

নবীন ভটচায মনে মনে গজরায়। শেষ অবধি গিয়ে হাজির হয়েছে মাধববাবুর ওখানে। দাসজীও রয়েছে। ওর মনে তখন চলেছে নিখুঁত ভাবে সেই প্যাঁচ কসার পালা। রূপেন নীরু ওই বানে ভেসে আসা সন্তোষের কাজগুলোকে সে সমর্থন করতে পারে না। দাসজী বলে।

—ওরা আরও অনেক কথা বলেছে ছোটবাবু, তাছাড়া গ্রামে বাস করতে গেলে এসব চুপ করে সহ্য করা ঠিক হবেনা। সব চলে যাবে। এর বিহিত করা দরকার।

মাধবও তা জানে।

তাই বলে সে—তাহলে কি করা যেতে পারে বলো ?

দাসজী জানে ওদের মধ্যে আনতে হবে বিভেদ, দরকার হলে ওদের চরিত্রের কিছু সামান্য ত্রুটি, ওদের কোন দুর্বলতার খবরকেই ফলাও করে প্রচার করবে, বিকৃত করে তুলবে ওদের সবকিছুকে। তাই বলে দাসজী।

—আমি দেখছি ছোটবাবু !

নবীন চতুর সাবধানী লোক। ও বুঝেছে এখানেই তাকে আশ্রয় নিতে হবে। তাই ব্যাকুলস্বরে বলে।

—আপনারা এর বিহিত করুন ছোটবাবু, দাসজী। গরীব বামুন মানুষ এককোণে উপোস দিয়ে পড়ে থাকি। ওই ওদের রিলিফের খিঁচুড়ি খাই নি,···ওসব অপবিত্র জিনিষ খাই কি করে? এখনও সন্ধ্যা আহ্নিক করি, পূজোপাট করি। তাই আমার অপরাধ? টিটকারী করবে—মদ ঢেলে দিতে আসবে গায়ে? বলুন—এ ভাবে ওদের অত্যাচার সয়ে বাঁচি কেমন করে?

দাসজী একটু খুশী হয় মনে মনে তাই বলে।

—এসব ওই রূপেনদের যোগসাজসেই হচ্ছে ছোটবাবু! ওরই চেলাদের কাজ। বেচারাকে কি হেনস্থা করেছে শুনুন।

নবীন বলে—ওদের সব কেচ্ছাকাহিনীর কথা আমি জানি। ওই রূপেন কি কম? ওই দু'দিনের আসা ছোকরা সন্তোষ না ফন্তোষ ওকেও চিনিছি। এর মধ্যে ভজনদাসের মেয়েটাও গা ঢাকা দিয়ে ওর ঘরে যায়। আর কে কি করেছে তাও দেখেছি। তাই রূপেন দ্বিজেনের মধ্যেও নাকি ঝগড়া হয়ে গেছে।

এমনি কিছু সন্ধানী লোক আর কিছু গোপন খবরই তারা চাইছিল। সেটা যেন পাবে এবার। তবু আরও আটঘাট বেঁধে এগোতে চায় শ্রীধর দাস। তাই বলে দাসজী,—ওসব কথা থাক ভটচায মশাই। সাক্ষ্য প্রমাণ তো নেই। তবে একটু নজরে রাখুন।

মাধববাবু ভাবছেন কথাটা। এমনি কোন চতুর লোক তাদের দরকার। দাসজী তারও কিছু লোককে ওদের পিছনে লাগাতে পারবে। মাধব বলে।

—এ নিয়ে ঘাবড়াবেন না ভটচায মশাই, এর বিচার হবে যথা সময়ে। ততদিন মুখ বুজে চোখ কান খোলা রেখে চলুন। কোন খবর থাকলে জানাবেন। আর জবাবও দিতে জানি আমরা।

ভটচায আশ্বাস পেয়ে গদগদ স্বরে বলে।

—আপনাদের আশ্রয়েই আছি ছোটবাবু, দাসজী মশায় !

মাধববাবু জানায়—এ বাড়ির পূজো টুজো করতো ফটিক চক্কোর্ত্তি। তাকে তো দেখলাম খিচুড়িতে লাইন দিয়েছে। ওদের দলেই মিশেছে।

দাসজী বলে—রাতে দেখলাম ওকে ওই ফুলি বাগ্দীর ঘরে। খুব ভাবসাব। ছুঁড়ির চোলাই মালও গেলে ওই ফটিক চক্কোর্ত্তি।

মাধব বলে—ওকে দিয়ে ধম্মোকম্মো আর চলবে না। আপনিই আসবেন। আমি বাড়িতে বলে দেব। এ বাড়ির পূজোটুজো আপনিই করবেন।

গদগদ হয়ে ওঠে নবীন ভটচায। সে ক্রমশঃ আশ্বাস পাচ্ছে। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে বের হয়ে এল। মাধববাবু কি ভেবে বলে।

—দ্বিজেনকে একবার আসতে বলো দাসজী। একটা জরুরী কথা আছে।

…ধীরা ভাবনায় পড়েছে। স্কুলের চাকরীটার আশায় সে ছিল এতদিন। দাদার ভরসা করা যায় না। সে এসেছিল রূপেনের কাছে ওই কাজের ব্যাপারে।

সন্ধ্যার পর রূপেন বসেছে রিলিফের প্ল্যান নিয়ে। দু'চার জায়গায় জল কমেছে। এবার কিছু বাড়ি ঘর তোলার কাজে হাত দিতে হবে। বাতাসে আসছে শরতের শিশির, এরপর আসবে শীতের হিম হাওয়া। সারা গ্রামে কোন আশ্রয় প্রায় নেই। আশ্রয় আর আহার্যের দরকার।

ললিত, সন্তোষও রয়েছে। ওরা লিণ্ট করছে।

কার কার বাড়ি ঘর গেছে, সেসব ফর্দ হচ্ছে। অনেকেই ভিড় করেছে সেখানে। গুপী বলে।

—আমার দুখান কোঠা গেছে বাবু !

অবাক হয় রূপেন—দুখান কোঠা লিখলেই সরকার কি সব বানিয়ে

দেবে ? যা ছিল জানি তাই লিখছি।

কে চীৎকার করে—টাকাটা কবে পাবো গ !

ওদের অভাব তো আছেই। কিন্তু পাওয়ার আশাও অনেক। এ যেন পাবার জন্যই মারামারি শুরু হবে। বলে ওঠে সন্তোষ।

—এখন যাও, পরে লিষ্ট করে নে যাবো কাল সকালে !

টাকা এলে এখন সমান ভাগ করে দেওয়া হবে। মাথা গোঁজার আশ্রয় সকলেরই চাই।

ভিড় কমে এসেছে। হঠাৎ রূপেন ধীরাকে ওদিকে দেখে চাইল।

—তুমি ?

ধীরা বলে—সাহায্যের আশাতেই এসেছি রূপুদা। তবে ওই ভিক্ষে না দিয়ে স্কুলের চাকরীটার ব্যবস্থা করে দাও। বাবাকে নিয়ে কি করে যে দিন কাটাবো তাই ভাবছি। চাল ধান সব গেছে।

স্কুলের চাকরী ! ভাবছে রূপেন।

অনেক কষ্টে স্কুলের একটা লম্বা মাটির দেওয়াল টালির ছাউনির ঘর তুলেছিল, ওখানেই গার্ল'স স্কুল হবে। কিন্তু বানে তা ধুয়ে মুছে গেছে। রূপেন বলে।

—স্কুলই ধুয়ে গেল ধীরা। স্কুল আবার কবে হবে জানিনা, এখন লেখাপড়াতো মাথায় উঠেছে। শুধু বেঁচে থাকার চিন্তাই বড় হয়েছে এখন।

...ধীরাও তা জানে। সেটা কঠিন ভাবে বুঝেছে সে।

রূপেন বলে—যুদ্ধের প্রথম বলি সত্য, সভ্যতা আর সংস্কৃতি, বানও আমাদের সেই ভাবে যুদ্ধের মতই ওইগুলোকে আগে শেষ করে দিয়েছে ধীরা। সত্য আর নেই, সব মিথ্যে হয়ে গেছে। সভ্য মানুষের পরিচয় আমাদের যেন আর নেই, সভ্যতা আর সংস্কৃতি ! সেটা তো পলি চাপা পড়ে গেছে। তবু বাঁচতে হবে। কি ভাবে সে পথ পাবো জানিনা।

ধীরা শূন্য হাতেই বের হয়ে এল হতাশা নিয়ে। রূপেনও আশ্বাস

দিতে পারে না, এড়িয়ে যেতে চায় তাকে।

ধীরা ভাবছে কথাটা।

বুক ভরা হাহাকার নিয়ে ফিরছে। এদিকটায় সন্ধ্যার অন্ধকার থমথম করছে। বাতাসে ওঠে সুগন্ধ, একটা শিউলি গাছ ছিল এখানে। তলা বিছিয়ে পড়ে থাকতো অন্য বছর এই সময় ফুলের রাশি, বন্যার আগেও হঠাৎ হিম শরতের বাতাসে তার ফুল ফোটার খুশী জেগেছিল, আজ তার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে ধীরা। সবুজ ফুল ফোটা গাছটা কুঁড়ি সমেত কালো বিবর্ণ হয়ে গেছে। ওতে আর কোনদিনই ফুল ফুটবেনা, বানের জলে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সব ফুলফোটার স্বপ্ন ফুরিয়ে গেছে ওর জীবন থেকে।

এ তার জীবনের মতই শূন্য বিবর্ণ।

এখানে কোন আশ্বাস নেই, ভালোবাসার অন্ধকার পরিবেশ ছাড়া কিছুই নেই। আছে শুধু শূন্যতা আর ব্যর্থতার জ্বালা।

—ধীরা! তারাজ্বলা আবছা অন্ধকারে হঠাৎ দ্বিজেনকে এগিয়ে আসতে দেখে চাইল ধীরা।

—তুমি!

দ্বিজেন একটু আগেই মাধববাবুর ওখানে গেছল। মাধববাবুর সোফায় বসে অনেক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নই দেখেছে সে। দ্বিজেন জানে বাঁচতে হলে একটা আদর্শকেই একটা অবলম্বনকেই ধরে বাঁচা যায় না। দরকার মত সেটাকে বদলাতে হয়।

দুর্গাপুরে মাধববাবুর কারখানার লাগোয়া কোয়ার্টার পাবে—সেখানেই তাকে কাজকর্ম দেখতে হবে। আর মাঝে মাঝে এখানেও এসে কিছু কাজ করতে হবে। মাধববাবু বেশ যুৎসই টোপটা দিয়েছে। দ্বিজেনও জানে একবার দুর্গাপুরে একটা আশ্রয় পেলে সে সেখানে অন্য ভালো চাকরীই জুটিয়ে নেবে। মাধববাবুও সেই ইঙ্গিতটা দিয়েছে। সেখানে তার মজুরদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ছোট স্কুল করতে চায় সে। দ্বিজেনকে তার ভার নিতে হবে। আর একজন শিক্ষিকারও

দরকার। মাইনেপত্র ছাড়া বাসাও মিলবে সেখানে।

দ্বিজেন মনে মনে কল্পনাটা করেছে।

তাই ধীরাকে দেখেই এগিয়ে আসে। ওকে খুঁজতে গেছল দ্বিজেন ওই বড় বাড়িটায়, দেখেছে দ্বিজেন ধীরা তখন রূপেনের কাছে চাকরীর জন্য উমেদারী করছে।

সরে এসেছিল রূপেন দেখা না দিয়ে।

দ্বিজেন ধীরাকে শুধোয়—কি হল? রূপেনের স্কুলের চাকরীর?

ধীরা চাইল ওর দিকে। অসহায় বিবর্ণ ক্লান্ত সে চাহনি।

হতাশায় যেন ভেঙ্গে পড়েছে ধীরা। শ্যামলা শান্ত চেহারা, ডাগর চোখে তারার ঝলকানি জাগে। ধীরাকে এই আবছা অন্ধকারে কেমন রহস্যময়ী বলেই মনে হয়। ধীরা জানায়।

—এখন সব তো ধুয়ে মুছে গেছে। স্কুল কবে হবে কে জানে?

রূপেন বলে—আর হবে না। রূপেনের সব অমনি বড় বড় কথা। ভবিষ্যৎ, আরে বাবা বর্তমানে যদি না বাঁচি ভবিষ্যৎ নিয়ে কি হবে?

ধীরাও কথাটা সত্যি বলেই মনে করে আজ। বলে সে।

—কিন্তু পথ কই?

দ্বিজেন এতদিন ধরে যেন এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করেছিল।

বলে সে—পথ আছে ধীরা! এখনও সুন্দর ভাবে বাঁচা যায়। তবে এখানে নয়। বাইরে ধীরা। দুর্গাপুরে একটা চাকরী, বাসা সবই পাবে, আমিও তাহলে ওখানে কাজটা নিই!

ধীরা দ্বিজেনের দিকে চাইল।

দ্বিজেনের মুখচোখে ফুটে উঠেছে কি ব্যাকুলতা, মেয়েদের কাছে পুরুষের এই আকুতি কিছু নতুন নয়। ধীরাও এর অর্থ জানে। দ্বিজেনের এই আশ্বাস যদি সত্যি হয় ধীরাও বাঁচার পথ পাবে। এখান থেকে সরে যেতে চায় সে কিন্তু পিছনে তার একটা টান রয়ে গেছে।

ধীরা বলে—কিন্তু বাবা কি রাজী হবেন একা আমাকে যেতে দিতে ?

দ্বিজেন বলে—তাকেও নিয়ে যাবে।

ধীরা কি ভাবছে। দ্বিজেনের কথাগুলো তার মনে একটা প্রশ্ন তুলেছে। রূপেন তাকে এ ভাবে আশ্বাস দেয়নি, দিতে পারেনি। ও দিয়েছে শুধু কষ্ট সহ্য করে পথ খোঁজার সন্ধানই। কিন্তু কোন দাবীও নেই রূপেনের।

দ্বিজেনের এই প্রস্তাবের পিছনে কি দাবী আসবে তাও ভাবছে ধীরা। বলে সে।

—একটু ভাবতে দাও দ্বিজু! বাবারও মতামত নিতে হবে।

দ্বিজেন আজ অনেক কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে। মনে হয় ধীরা ভাবছে রূপেনের কথাই। আজ দ্বিজেন যেন নিজেকে রূপেনের তুলনায় অনেক ছোট মনে করে নিজেকে, অন্ততঃ ধীরা তাই বোধ হয় ভাবছে।

দ্বিজেন বলে—ঠিক আছে। ভেবে ছ্যাখো ধীরা। দু'চার দিনের মধ্যে মতামতটা জানালেই ব্যবস্থা করা যাবে। তবে বড় বড় কথা শুনে মন ভারই হয় আর কিছু হয় না।

দ্বিজেন চলে গেল, ধীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে কথাটা, আজ মনে হয় তাকে কেন্দ্র করেই দ্বিজেন একটা পথ পেতে চায়।

কেশব মিত্তির অন্ধকারে মাঝে মাঝে বের হয়। ওই পুরোনো বাড়িটায় যাবার চেষ্টা করে সে। এখনও জল কিছু আছে কিন্তু আজ বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পুরোনো ধ্বংসস্তূপটার দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় কাল যেতে পারবে। জল অনেকটা সরে যাবে কাল।

বাড়িটার বেশ কিছু অংশ ধ্বসে গেছে। সন্দেহ হয় বুড়োর যদি আর কেউ সেই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যায় বিপদ হবে। এবার ফিরে যাবে ওখানে কেশব মিত্তির।

…নির্জন পথে হঠাৎ কাদের ওই দিক থেকে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালো কেশব মিত্তির। আর কেউ ওখানে যায় বোধহয় গুপ্তধনের সন্ধানে। চমকে ওঠে কেশব মিত্তির।

কথার শব্দ শুনতে পায়, ধীরা আর দ্বিজেনের কথার টুকরোগুলো শোনা যায়। ওরা ফিসফিসিয়ে কি কথা বলছে, যেন দুজনে কি গোপন চক্রান্তই করছে কেশব মিত্তিরের অগোচরে।

কাউকে বিশ্বাস করেনা কেশব মিত্তির। ধীরাকেও সে সন্দেহ করে। দ্বিজেন আর সে বোধ হয় ষড়যন্ত্র করছে গোপনে তারই বিরুদ্ধে।

…দ্বিজেন চলে যেতে বুড়ো এগিয়ে আসে।

—তুই, এখানে?

বাবাকে এখানে এসময় দেখে ধীরা চাইল! কি যেন অন্যায় করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেছে। কেশব মিত্তির চড়াস্বরে শুধোয়, ওটার সঙ্গে এত কথা কিসের? এঁ্যা— গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে, সব তুলে নিয়ে দুজনে কেটে পড়বার তাল? এঁ্যা—আই এ্যাম্ নট এ ফুল!

ধীরা বাবার কথায় বলে—বাবা কি বলছো যা তা!

—সাট্ আপ! যা তা বলছি আমি? নিজে কি করছিস? এঁ্যা—জবাব দে!

লজ্জায় রাগে ধীরা জ্বলে ওঠে। সামনে অনাহার আর বুভুক্ষার অন্ধকার। তার মাঝে এই অপমানটায় জ্বলে উঠেছে ধীরা। তিলে তিলে সে জ্বলছে। এই লোকটার জন্যই তার কোন পথ নেই মুক্তির, মুখ বুজে এই অত্যাচার সহ্য করে সে ক্লান্ত!

ধীরা বলে—তোমার ধনসম্পত্তি নিয়ে যক্ষের মত আগলাও, আমাকে মুক্তি দাও বাবা। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই!

গর্জে ওঠে কেশব মিত্তির—এঁ্যা এত বড় অধঃপতন তোর? মিত্তির বংশের অপমান! আই স্যাল ফিনিস্ ইউ—কিল ইউ!

বৃদ্ধ রুগ্ন লোকটা শীর্ণ দুহাত দিয়ে ধীরার গলাটা টিপে ধরেছে। গর্জাচ্ছে একটা জানোয়ার, অন্ধকারে দুচোখ জ্বলছে তার। ধীরার দম বন্ধ হয়ে আসে, সে এই আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না। তবু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। অন্ধকারে এই ধ্বংসস্তূপের মাঝে একটা মানুষ সর্বনাশা মত্ততায় মেতে উঠেছে।

রূপেন সন্তোষ বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। ওরাও এসে পড়ে! টর্চের আলোয় ওই দৃশ্য দেখে রূপেন এসে কোন রকমে ধীরাকে ছাড়িয়ে নেয়। কি করছেন মিত্তির মশাই? কি ব্যাপার!

গর্জায় কেশব মিত্তির—ওকেই শুধোও! শয়তান—নীচ—একটা জানোয়ার ও! কেশব মিত্তিরের চোখে ধুলো দেবে? এঁ্যা! দেখে নোব।

চলে গেল কেশব মিত্তির টলতে টলতে! রূপেন দেখছে ধীরাকে!

অসহায় মেয়েটার কাপড় চোপড় অবিন্যস্ত, কি দুঃসহ কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়ে সে। কাঁদছে মেয়েটা কি অপমানে, গ্লানিতে।

রূপেন বলে—ঘরে যাও ধীরা। বাবার মাথার ঠিক নেই। কিছু মনে করোনা! যাও।

ধীরা কান্না ভেজা স্বরে বলে—কি হয়েছে শুধুলে না?

রূপেন জানে, বাঁচার লড়াই-এ পরাজয়ের অসহায় কান্নাই এটা। তাই বলে—ওসব কথা পরে হবে। এখন ঘরে যাও!

রূপেনের মা প্রতিমা ওদের জন্য খানকয়েক রুটি আর আলুর চচ্চড়ি তৈরী করে বসে আছে। ভবতোষবাবু বলেন।

—তুমি খেয়ে নাও রূপেনের মা। রূপেন এখানেই কোথায় আছে। আসবে।

প্রতিমা বলে—তুমি শোও। কি যে করে দিনরাত ছেলেগুলো জানিনা। ভবতোষবাবু ওদের পায়ের শব্দে চাইলেন। রূপেন আর

সন্তোষ এসেছে।

রূপেন অবাক হয়—তুমি বসে আছো মা? খাবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেই পারতে।

প্রতিমা হাসল। মায়ের ব্যাকুলতা ওরা বোঝে না। প্রতিমা বলে—তোরা বস, যা আছে দিই। তবে রুটি পাঁচ খানার বেশী কেউ পাবি না।

প্রতিমারও মন কাঁদে। ছেলেগুলো দিনভোর কাদা জলে খাটছে, ভরপেট খেতেও দিতে পারে না। রূপেনকে কিছু আটার জন্যে বলেছিল। রূপেন বলে—দরকার হয় লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ো মা। যা ভাগে পড়ে পাবে। আমি হাতে করে কিছু আনতে পারবো না।

প্রতিমা বলে—তাই আনতে বলেছি নাকি? দাম দিয়ে কিনতাম।

রূপেন বলে—কয়েকদিনের মধ্যে রেশন চালু হবে মা। সরকার থেকে জিনিষপত্র বেচার ব্যবস্থা করা যাবে তখন কিনো।

প্রতিমা বলে—দাসজীর কাছ থেকেই কিছু আটা কিনেছি, তিনটাকা দর দিয়ে। ও নাকি এখন চারটাকায় বিচছে।

হাসে রূপেন—তাহলে তুমি বেশ বড় লোক মা। খা সন্তোষ, তিনটাকা কিলোর আটা খা। তাগদ বাড়বে।

সন্তোষ চুপ করে খাচ্ছে।

ওর মনে পড়ে রাধার কথা। আজ সন্ধ্যাবেলায় এসেছিল তার ঘরে গোপনে। অতীতের সেই স্মৃতিটুকু যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে।

প্রতিমাও শুনেছে সন্তোষের কথা। সব হারিয়ে প্রাণ নিয়ে ভেসে এসেছে ছেলেটি। প্রতিমা বলে—খাও সন্তোষ, চুপ করে বসে আছো যে।

—খাচ্ছি মাসীমা। সন্তোষ খাবার চেষ্টা করে।

প্রতিমা শুধোয়—বাড়ির আর কারো কোন খবর পেলে? মা তো গেলেন।

চমকে ওঠে সন্তোষ।

মায়ের শেষ মুহূর্তের সেই আর্তনাদ এখনও তার কানে ভাসে। বাড়িঘরও ভেঙ্গে গেছে। জমি জায়গার কি অবস্থা হবে বানে তাও জানে না। ঘর সে বেঁধেছিল, কিন্তু সব আগেই হারিয়ে গেছে। তার স্ত্রীও চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

তারপরও সন্তোষ তার স্ত্রীর খোঁজ করেছিল, ভেবেছিল রাধাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তার ঘরে, দুজনে ঘর বাঁধবে।

মাও তার ভুলটা বুঝেছিল, ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মা বলেছিল। —বৌমাকে ফিরিয়ে আন বাছা। হাজার হোক ঘরের লক্ষ্মী। তাকে আন—

—মা! সন্তোষ অবাক হয় মায়ের কথায়।

মা বলে—ভুল করেছিলাম বাবা। ওকে নিয়ে আয়—আমি তোদের সংসারের বিষয়ে আর কোন কথাই বলবো না। তোরা সুখী হ' বাবা।

সন্তোষ রাধার খোঁজ করেছিল: ওদের আগেকার গ্রামে এসে অবাক হয়। সেই ছোট্ট বাড়িটা ভেঙ্গে পড়ে ভিটেপুরীতে পরিণত হয়েছে। কেউ কোথাও নেই।

দু একজন ওকে দেখে চিনতে পারে। তারাই বলে।

—ভজনদাস বেশ কিছুদিন আগে মেয়েকে নিয়ে এখান থেকে চলে গেছে গো।

চমকে ওঠে সন্তোষ। অনেক আশা নিয়ে সে এসেছিল।

আবার ফিরে যাবে রাধা তার সংসারে। রাধার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে সে, এসেছে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

কিন্তু রাধা কি ব্যর্থ বেদনা বুকে নিয়ে এই বিরাট পৃথিবীতে হারিয়ে গেছে। সন্তোষ শুধোয়।

—কোথায় গেছে তারা?

একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলে—শুনেছিলাম নাবাল দেশে কোথাকে

গেছে। ঠিক তো জানি না। আর কুন খপরও পাইনি। তবে শুনি ভজনদাস বিটিকে নে সহর বাজারে কেত্তন গান করে।'

সন্তোষ ফিরে গেছল শূন্য হাতে।

মাও অবাক হয়—পেলিনা তাদের?

ওর কণ্ঠে বেদনার স্বর ফুটে ওঠে। মা চুপ করে থাকে। সন্তোষ তবু এখানে ওখানে খুঁজেছিল এতদিন। পায় নি।

বহু দিন পর এই বন্যা তাদের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। এতদিন পর আবার সে দেখেছে রাধাকে হঠাৎ এই বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামে।

কিন্তু রাধাও যেন বদলে গেছে। কি অভিমানে সে আজ নীরব হয়ে গেছে। কোন স্বীকৃতিও দেয়নি। সন্তোষ দেখেছে দূর থেকে ভজনদাসকে। তাকে চিনতেও অবকাশ পায়নি ভজন। হয়তো দেখেনি, কিংবা দেখেও না চেনার ভান করে অতীতের সেই অপমানের প্রতিবাদই জানাতে চেয়েছে। অবশ্য দাড়ি গোঁফ-এর জঙ্গলে ঢাকা সন্তোষের শীর্ণ মুখখানার আদলই বদলে গেছে। ভজনদাস চিনতে পারেনি সন্তোষকে। চায়ও নি। ভজন বোধহয় অতীতের সেই বেদনাময় অধ্যায়টাকে ভুলে গেছে।

সন্তোষ তাই আজ বলে।

—আর তো কেউ নেই মা। কেউ আমার নেই। আমি একা!

কথাটা জানাতে তার কণ্ঠস্বর কি বেদনায় গাঢ়তর হয়ে ওঠে।

প্রতিমার দুচোখে সমবেদনার ছায়া। রূপেন বলে।

—খেয়ে নাও সন্তোষ। লিষ্টগুলো আজই শেষ করে রাখতে হবে। আর নোতুন স্কিমটার কথা আলোচনা করা দরকার।

সন্তোষ বলে—ওই স্কিম মাথায় ঢুকিয়ো না রূপুদা। এখন ওসব নিয়ে কথা বললে ওরা কি মেনে নেবে?

রূপেন বলে—বানের জল কমুক। তারপর জমির হাল দেখে ওই পথ নেবার কথা ভাবতেই হবে। তাই নিজেরা ওগুলো আলোচনা করতে চাই। বড় বাবুকেও জানাতে হবে। তারপর সারা গ্রামের

মানুষের সামনে জানাবো সমস্ত পরিকল্পনার কথা।

এ তাদের কাছে বিরাট একটা প্রশ্ন। পুরোনো জমির বিলিব্যবস্থা—মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে।

সন্তোষ বলে—অন্যরা মানলেও দাসজী, ছোটবাবু, ওই মাধববাবু, কেশব মিত্তির ওরা মানবে? ওদের তো সে গরজ নেই!

কথাটায় যুক্তি আছে। ওরা সঙ্গতিপন্ন জোতদার। তাদের ভাবধারার সঙ্গে আজকের এই গণতান্ত্রিক নীতির মিল হবে না। এ পথে চিন্তা করতে ওদের সংস্কারে বাধবে।

রূপেন বলে—দেখা যাক। কি হয়।

প্রতিমা শুনছে কথাগুলো। ভবতোষবাবু গড়গড়া টানছেন বারান্দায় বসে। ওই গড়গড়া টানা তাঁর একমাত্র নেশা। ওটাকে তবু বাচিয়ে রেখেছেন এত বিপর্যয়ের মাঝেও।

ভবতোষবাবু ওদের কথায় বলেন।

—স্কিমটা একটু আমাকেও জানাবে রূপেন। জমির চাষ নিয়ে কিছু ভাবছো। তা বাপু জমি কিঞ্চিৎ আমারও আছে। স্কিম তাই স্বার্থবিরোধী হলে আমিও মত না দিতে পারি।

হাসে সন্তোষ - জানাবো কাকাবাবু। আগে স্কিমটা বিশদভাবে ছকা হোক। আপনার অমত হবে না তাতে আশা করছি।

হাসেন ভবতোষবাবু—হবে না এত ডিফিনিট হয়ে বলছো কেমন করে। আগে দেখি তারপর জানাবো একে সমর্থন করা করা যায় কিনা।

প্রতিমা বলে—ওদের খেতে দাও তো বাপু, পরে ওসব কূট কচালি তক্কো করো। সারাদিন পর বাছারা খেতে বসেছে।

ভবতোষবাবু চুপ করে গড়গড়া টানতে থাকেন।

রূপেন এসব কথা ঠিক ভাবেনি এর আগে। তবে নিজের গ্রামে দেখেছে বিচিত্র এই সমস্যাগুলো। সে এখানে হাতে কলমে কাজ করেছে! সারা গ্রামের জমিগুলো রয়েছে কিছু মানুষের দখলে, আর

সেগুলো ছড়ানো আছে চারিদিকে। এখানে একবিঘে, দখিনের মাঠে আড়াই বিঘে, পশ্চিমের মাঠে কয়েক কাঠা, উত্তরের মাঠে তিন জায়গায় ছড়ানো—কুল্যে পাঁচ বিঘে জমি, লাঙ্গল নিয়ে প্রত্যেককে ঘুরে ঘুরে চাষ করতে হয়। এ মাঠে জল থাকে তো ও মাঠে জল তখন শেষ। মাটিতে ফাটল ধরে। এই ভাবে ঘুরে ঘুরে টুকরো টুকরো জমি চাষ করতে অনেক সময়ের অপব্যয় হয়।

একলপ্তে যদি ওই জমিগুলো থাকতো তাহলে চাষী ধার করেও স্যালো টিউবওয়েল বসাতো, নিজে যত্ন করে সার দিয়ে চাষ করত। হেপাজত করলে ওই জমিতেই দ্বিগুণ ফসল ফলতো, রকমারি ফসল চাষ করতে পারতো।

কিন্তু তা হয় না। গ্রামের পঞ্চাশ জন পরিবারের হাতে তাছাড়া কিছু জমি আছে। কারো হাতে তিরিশ বিঘে, কারো হাতে কুড়ি বিঘে, কারো হাতে দশ বিঘে। কারো হাতে অনুসান ছ'সাত বিঘে। কিন্তু দশ বারো বিঘে জমির মালিককেও এক জোড়া হাল গরু রাখতে হয়। কৃষাণ রাখতে হয়। আবার কুড়ি বাইশ বিঘে জমির মালিক নিজে খাটে তবু তাকেও এক জোড়া হাল বলদ রাখতে হয়েছে। এই ভাবে ছিটিয়ে ছড়িয়ে গুনলে দেখা যাবে গ্রামে মোট হয়তো চল্লিশ জোড়া হাল বলদ আছে, কৃষাণ মুনিষও আছে কয়েক শো।

কিন্তু একজোড়া হাল বলদ দিয়ে অনুমান পনেরো বিঘে জমি চাষ করা যায়। সেখানে ওই হাল বলদ জনশক্তি দিয়ে অন্ততঃ পাঁচ ছ'শো বিঘে জমিতে চাষ করা ফসল ফলানো সম্ভব, কিন্তু চাষযোগ্য জমি সে মাঠে আছে চারশো বিঘে, একশো দু'শো বিঘা জমির উৎপাদনী শক্তি সেখানে অপচয় হয়ে চলেছে।

অথচ ওই জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে আছে বহু জন বহু পরিবার। ফলে অভাব দারিদ্র সেখানে নিত্যসঙ্গী।

রাত নেমেছে।

ওরা বসেছে কাগজ কলম নিয়ে, গ্রামের উৎসাহী কর্মী নিরু ঘোষও এসেছে। সন্তোষ বলে।

—গেরামে তাই বলেছিলাম গাঁতায় যৌথ ভাবে কিছু জমি চাষ করতে। তাহলে দেখা যাবে এর ভাল মন্দটা। কিন্তু কেউ তাতে রাজী হয়নি। বলে যার জমি সেই চাষ করবে।

হাসে রূপেন—ওসব সংস্কার সন্তোষ। এতদিনের জীর্ণ পুরানো ভূমিলক্ষ্মীর কাঠামোটাকে আমরা আঁকড়ে ধরে ছিলাম সব ক্ষতি সহ্য করেও। কিন্তু আজ এই বন্যা যা বিপর্যয় এনেছে সেটা দেখার পর এই সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হবে তারা। নইলে বাঁচা যাবে না।

নিরু বলে—চাষ হবেক কি করে গো? হলে ফাল গাড়ি চাষের এস্টেট পত্তর সব বিবাক ভেসে গেছে, আর বলদ গরু আছে হ্যাশে?

বিবাক সাফ হই গেছে মরে। তালে জমি চষবেক কে গো ম্যাষ্টার? শালো জমি পড়ে পড়ে জল খাবেক তু'সন, আর নিজেরা আঁত কাঁকালে করে বুলবেক ইধার উধার। প্যাটে খেতে পাবেক নাই।

সামনে কঠিন প্রশ্ন। বিরাট সমস্যা।

বন্যার হাত থেকে, জলে ডোবার হাত থেকে বেঁচে উঠে সামনে এতবড় দুর্দিন কি ক'রে পার হবে তাই ভাবছে সবাই। রিলিফ-এর চাল গম কাপড় সাহায্য আসবে দুচার দিন, মাসখানেক ধরে। চিরকালতো এসব পাওয়া যাবে না।

নিরু বলে—ভিখেরীর মত চেরকাল কেনে উসব হাত পেতে লুব গ। খেটে খেতে হবেক নাই? জমি—মাটিগুলানকি নিস্ফলা পড়ে থাকবেক! আর ভিখ্ মেঙ্গে খাবো আমরা? কেনে?

রূপেন বলে—তার জন্য চাষের এই ব্যবস্থা করা যায় কিনা ভাবো। এক যোগে গাঁতায় চাষ করতে হবে। ট্রাক্টর দিয়ে টানা চাষ করে যাবে, রুইবে, হেপাজত করবে তোমরা। যার যেমন জমি ফসল উঠবে গাঁতায়, পরে সেই হিসেবে ফসল ভাগ হবে। একা একা কিছু করা যাবে না; যৌথ ভাবেই কিছু করার কথা ভাবতে হবে।

নিরু বলে—ওদের সব্বাইকে ডেকে ব্যাপারটো বুজ কারও মাষ্টার। আমার তো খারাপ লাগছে না কথাটো।

রূপেন ক'দিন দেখছে দ্বিজেন এড়িয়ে চলেছে তাদের। এমনি একটা আলোচনায় দ্বিজেনেরও থাকা দরকার। কিন্তু সেই সন্ধ্যার সময় থেকেই দ্বিজেন আর আসেনি এখানে।

নিরু ঘোষ বলে—তাকে দেখলাম মাধববাবুর বাড়ি যেতে। দাসজীও ছিল সঙ্গে !

রূপেন বলে—হয়তো কোন কাজে গেছে। আমি দেখছি। ওকে দরকার।

গোপাল ওদিকে চটে বসে বিড়ি টানছিল। শীর্ণ লোকটা চুপ করে এদের আলোচনাগুলো শুনে চলেছিল। জমির বর্গাদারী স্বত্ব তারপর ওই জমি নিয়ে সমবায়ের কথাগুলো শুনে গোপালও ওঠে পড়ে। নিরু বলে—চললি যে গোপাল ? তোদের পাড়ার লোকজনকে বলবি এসব কথা, তাই একটু থেকে সবটা শুনে যা !

গোপাল বলে—আটার মলিদা খেয়ে প্যাট ভুট ভাট করছে গো, মনে হয় তলব আইছেন। যাই, পরে আসবো।

সন্তোষ লোকটাকে দেখছে। গোপাল চলে গেল। যেন প্রাকৃতিক কাজের তাগিদেই চলেছে সে। সন্তোষ বাইরে এসে দেখে লোকটার প্রাকৃতিক কাজটা ছল মাত্র, সে একটু এদিক ওদিক চেয়ে মাধববাবুর মহলের দিকেই চলে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনা সন্তোষ, হঠাৎ নিরুকে দেখে চাইল।

নিরু ঘোষও ওই গোপালকে চেনে। সেও এসেছিল ওর পিছু পিছু। নিরু বলে—বুঝলানা সন্তোষ, উ শালো ক্যানে এসেছিল হে ? গেল ওর বাবাদিকে ই সব শলার খপর দিতে। শ্যালো হারামী কোথাকার। ইবার লুক চেনার দরকার হইছে গো। কে আসল আর কুন শালা বেদো ইটা জানতে হবেক ইবার।

হয়তো মানুষের প্রকৃতিতে এই দুটো সত্তাই রয়েছে। একশ্রেণী চায় অন্যের সব কেড়ে নিতে, সবকিছু দখলদারী পেতে। তার জন্য তাদের চোখে অন্য শ্রেণীর প্রতি কোন টান দামই নেই। দাসজী মাধববাবুর ক্ষিধেটা সর্বগ্রাসী। দাসজীও তাই অনেক পাবার জন্য মাধববাবুর নির্দেশে এগিয়ে চলেছে। পরিকল্পনাটা তারই। মাধববাবু বলে।

—ছাখো, যদি পারো। দ্বিজেনটাকে কোনমতে সরাবার ব্যবস্থা করছি। আর তাহলেই রূপেন একা পড়ে যাবে। সন্তোষটাকে হঠাতে হবে তারপরই।

দাসজী হাসছে! বলে সে।

—তা হবে ছোটবাবু। আর ওই ভজনদাসের মেয়েটার খবরও নিতে হয় তাহলে। ধরুন কলবাড়িতে একরাত কেত্তনের বায়না ছান। মানে এমনি পয়সা নেবে না—ঠ্যাটা আছে মেয়েটা, তাই একটু কৌশল করে ডেকে নে চলুন, তারপর।

দাসজী ইঙ্গিতটা আভাসে জানিয়ে দেয়।

মাধববাবু বলে—ছাখো! তবে একটু সাবধানে পা ফেলো দাসজী। ওরা এখন ফাঁক খুঁজে ফিরছে।

দাসজীও তা জানে। তাই বলে সে—ওসব নিয়ে ভাববেন না।

রাধারাণী আর ব্যাং দেখে এসেছে তাদের ভিটেটা।

সেখানে আর কিছুই নেই। কোনরকমে কাঠ টিনগুলো কিছু বের করেছে। মজুর লাগিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে কোনমতে চালাই তুলে নিয়ে চলে যাবে সেখানে। রাধা বলে—এখানে রেওয়াজ কেত্তন হয়না রে! তবু ওখানেই গিয়ে সব শুরু করবো।

ব্যাংও এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। চারিদিকে উঠেছে ময়লার গন্ধ। এত মানুষ এমনি গাদাগাদি করে থাকাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বলে সে

—তাই ভালো গ ! নামোপাড়ার অনেকেই চলে গেছে। ওদিকে গদাইরা চালা তুলেছে। নীরু ঘোষদের পাড়ার বিবাক লোক বাঁধের চাতাল জুড়ে ঘর তুলছে। আমাদেরও চলো ইবার ! আমি বরং কাল চার পাঁচজন মজুর লাগিয়ে চালা তোলার কথা বলে আসি ভিটেতে !

ব্যাং চলে গেল মজুরের সন্ধানে। এখন ওই লোকগুলো যে ভাবে হোক নিজেদের ভিটেতে ফিরে যেতে চায় !

একাই বসে আছে রাধা। বাবার কথা মনে পড়ে। লোকটাকে এখনও খেটে রোজগার করতে হয়, রাধাও এবার নিজেই পালাগান করবে। সন্তোষকে দেখেছে কিন্তু সেই রাত্রির পর আর যায়নি রাধা। সন্তোষ যখন অতীতের পরিচয়টাকে মুছে ফেলতে চায়, রাধাও সেই চেষ্টাই করবে। যে ভাবে হোক এই নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা একাই বইবে সে।

হঠাৎ দাসজীকে আসতে দেখে চাইল।

শ্রীধর দাস এগিয়ে আসে, ব্যাং যে ঘরে নেই সেটাও জানে সে।

রাধা একটু অবাক হয়েছে—আপনি ! এসময় ?

দাসজী মুখে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে তোলার বিদ্যাটা রপ্ত করেছে ভালো ভাবেই। বলে সে

—এলাম ! ভজন নেই—একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত। তা সময় পাই কই ! তাই বলছিলাম টাকাপয়সা দরকার। ভজন তো জমি বাগান বন্ধক রেখে ট্যাকা নিল, তা তুই ঘরবাড়ি তোল ! বরং কি লাগে টাগে বলিস !

দাসজীর দিকে চেয়ে থাকে রাধা। বলে সে।

—দরকার হলে বলবো।

দাসজী যেতে গিয়েও কথাটা যেন মনে পড়ে যেতে ফিরে এসে বলে দরদী কণ্ঠে।

—তা ধর শ'খানেক দেড় টাকার একটা আসরে গেয়ে দিবি ? মাসে

মাধববাবু কলবাড়িতে কীর্তন বসাবেন ভাবছেন, তাই বললাম বাইরের থেকে এসময় কাউকে না এনে ঘরেই রয়েছে নামী কীর্তনীয়া, তাকেই আসর ছ্যান। তবু কিছু টাকা আসবে তার হাতে।

রাধা অবাক হয়—মাধববাবু কীর্তন দেবেন ? হঠাৎ—

হাসছে দাসজী—মানে বড়লোকের খেয়াল আর কি। এতবড় বিপদ গেল—কলবাড়িতে পূজো টুজো করাবেন তাই। তা আমি বলেছি পঞ্চাশ টাকা বায়না—আর কীর্তনের দিন পাবে একশো এক টাকা। রাধার টাকার দরকার। কিন্তু মাধববাবুর এই মতিগতির কথা শুনে সেও ভাবছে। বলে ওঠে শ্রীধর।

—বায়নার টাকাটা নাহয় নিয়ে রাখ ! ধর পঞ্চাশ টাকা !

টাকাটা বের করে দেয় দাসজী। রাধা যেন বিপ্‌দে পড়েছে।

এদিকে নিজের আসরে গাইবার ডাক আর দেড়শো টাকা, অন্যদিকে কি একটা অজানা ভয় তার মনে বাসা বাঁধে ! ইতি উতি করে সে।

—বায়না এখনই কেন দিচ্ছেন গো ?

দাসজী দেখছে চারে মাছ এসেছে। সে বলে।

—মা লক্ষ্মীকে ঠেলতে নেই। ধর টাকাটা। পরে এসে দিনটা জানিয়ে যাবো।

গলা নামিয়ে বলে দাসজী—মস্তলোকেরা সব আসবেন, প্যালাও পড়বে ভালো। পুষিয়ে যাবে। নে ধর টাকাটা। টাকাই লক্ষ্মী বুঝলি।

দাসজী কোনরকমে মা লক্ষ্মীকে রাধার হাতে গছিয়ে দিয়ে চলে গেছে। চুপ করে ভাবছে ধীরা।

হঠাৎ রূপেনকে আসতেদেখে চাইল। রূপেন আর সন্তোষ দ্বিজেনের সন্ধানে গেছল, দ্বিজেন নাকি ওপাড়ায় গেছে কি কাজে। রূপেন ফেরার সময় হঠাৎ দাসজীকে এখানে দেখে এগিয়ে আসে। ধীরা চুপ করে বসেছিল, টাকাগুলো পড়ে আছে সামনে। রাধা সন্তোষ আর রূপেনকে দেখে বলে—টাকা দিয়ে গেল দাসজী !

—ও কেন এসেছিল রে ? রূপেনের কথায় বিস্ময়ের সুর ফুটে ওঠে।

হাসছে ধীরা—কীর্তনের বায়না করে গেল! কি কীর্তন করাবার মতলব তা জানি না রূপুদা! মাধববাবুর কলবাড়িতে গান হবে।

সন্তোষ দেখছে রাধাকে। সেই রাতের অন্ধকারে যে রাধা তার ঘরে গিয়েছিল কি আকুতি নিয়ে এ সেই মেয়েটি নয়। এ যেন অন্য একজন মেয়ে, হাসছে রাধা!

রূপেন জানে মাধববাবুদের। রূপেন রাধাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। সত্যিকার শিল্পী সে, তার গানে ভাব আছে, সুর আছে। রূপেন বলে।

—ও টাকা নিলি কেন?

রাধার দুচোখে কি জ্বালার প্রকাশ। সন্তোষের দিকে চাইল সে। তীক্ষ্ণস্বরে রাধা বলে ওঠে—কেন নেব না গ? আমিতো বাজারের ঢপ-ওয়ালী, ঢপ কেত্তন গাইবো আসরে, তবে কেন পালা ধরবো না? কি আছে আমার? ওসব মান অপমান সব এককার হয়ে গেছে গ!

রাধার কথাটায় তীব্র জ্বালা ফুটে ওঠে।

রূপেন ধীরার এই বিচিত্র রূপ দেখেনি এর আগে। সন্তোষ চুপ করে সরে এল। রূপেন বলে।

—তোর বাবা এখানে নেই। আমাদেরই বলে গেছে রাধা। তুইও ভেবে ছাখ, আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। পালা কীর্তন গাইবি তেমনি আসরে! নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলিস না!

রাধার দুচোখ কি বেদনায় ছলছল করে ওঠে। এটা সেও ভেবেছে। কিন্তু সন্তোষকে দেখে সে যেন অসহায় রাগেই ফেটে পড়তে চেয়েছিল। সেই জ্বালাটা দুচোখে অশ্রু হয়ে নামে।

রূপেন ওকে দেখছে। সন্তোষও দেখেছে সেই অশ্রুধারা।

রূপেন বলে—এতবড় সর্বনাশা বানে যখন মরিস নি তখন মানুষের হাতেও নিজের অপমৃত্যু আনবি না রাধা। বাঁচতে হবে মানুষের মত, মানুষের পরিচয়ে! তাই কথাটা বলে গেলাম!

ধীরা চুপ করে সেই রাত্রে ঘরে ফিরে এসে গুম হয়ে বসলো। আজ ধীরা বুঝেছে পথ তাকে খুঁজে নিতে হবে। রূপেনও দেখেছে সেই অপমানটা, কিন্তু প্রতিকারের কোন পথই দেখাতে পারেনি সে ওদের।

দ্বিজেনের কথাগুলো মনে পড়ে। সে তবু একটা পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিল। ধীরা হয়তো তাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি।

রূপেন আজ নোতুন করে ভাবছে কথাটা।

ধীরার ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠেছে এই ব্যবহার।

তিলে তিলে যেন কি আগুণে পুড়ছে সে। এর থেকে নিষ্কৃতি নেই!

ধীরা খাবারটা সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়লো। ঘুম আসে না। চারিদিকে স্তব্ধতা নামে। বাবা তখনও ফেরেনি। ধীরা ভেবেছিল কোথাও আছে লোকটা, ফিরবে। কিন্তু ফেরেনি এখনও। ঘুম আসেনা ধীরার! কি ভাবনায় পড়ে সে! কোথায় যেন হারিয়ে গেছে লোকটা।

রাত কতো জানে না। ধীরা অনেক ভেবেছে। তবু রূপেনের কাছে তার প্রত্যাশা কিছু রয়ে গেছে। বের হয়ে এল ধীরা। এগিয়ে গিয়ে রূপেনদের ওখানেই হাজির হয়।

ওই অন্ধকারে ওখানে তখনও আলো জ্বলছে। রূপেন ধীরাকে দেখে অবাক হয়—তুমি!

ধীরা কান্নাভিজে স্বরে বলে—বাবাকে দেখছি না। সেই সন্ধ্যা থেকে বাবা ঘরে ফেরেনি!

—তাই নাকি! চমকে ওঠে রূপেন।

এখনও জল বইছে ঠাঁই ঠাঁই, চারিদিকে কাদা জল আর ধ্বংসপুরী। মাটির বাড়িগুলো যা দুচারটে টিকে ছিল জল নামতে এবার ধ্বসে পড়ছে। কোন বিপদ ঘটা বিচিত্র নয় ওই ধ্বংসপুরীর মাঝে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিজেনও এসে পড়েছে সব শুনে।

ওইই বলে—একবার খোঁজ করলে হয় না ?

রূপেন জানায়—দেখাতো দরকার কিন্তু এই রাতে কোথায় দেখবো ?

তবু কিছু লোকজন বের হয়েছে ওই রাতের অন্ধকারে কেশব মিত্তিরের সন্ধানে। দ্বিজেনই ব্যস্তসমস্ত হয়ে লোকজনকে জুটিয়ে নিয়ে বের হয়েছে।

কেশব মিত্তির আজ সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্ধ্যার পরই বের হয়েছে। নিজে একবার দেখে আসবে তার বাড়িটাকে।

ওদের সে বিশ্বাস করেনা। দ্বিজেন ধীরা যেন সত্যিই কোন ষড়যন্ত্র করছে তার বিরুদ্ধে।

জল কাদা তখনও রয়েছে। কোথাও হাঁটুর উপর জল। বুড়ো আবছা চাঁদের আলোয় চলেছে ওই ধ্বংসপুরীর দিকে। সে জানে কোনদিকে থাকতে পারে সেই গুপ্তধনের সন্ধান। পিছল পথ, বন্যার তোড়ে সব ভেঙ্গে গেছে। কোথায় জলের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ঘরের দেওয়াল এবার জল সরে যেতে সশব্দে আছড়ে পড়ে। জলকাদা ছিটিয়ে ওঠে চারিদিকে।

কেশব মিত্তির পথ দিয়ে সাবধানে চলেছে। চোখে তার সেই গুপ্তধনের স্বপ্ন। সেগুলো পেলে আর কাউকে তার দরকার নেই! কাউকে সে চায় না। সামনে খানিকটা জলের স্রোত তখনও বয়ে চলেছে। নদী যেন আছড়ে পড়েছিল এদিকে। পায়ে বালি ঠেকছে, কোনরকমে কাদা জলে কাপড় ভিজিয়ে গিয়ে সে ওদের ভিটেতে উঠেছে।

ধ্বংসপুরীতে জনমানব নেই। স্তব্ধ এক রাজ্য। দু'চারটো রাতজাগা পাখী ওর পায়ের শব্দে কলরব করে ওঠে। কেশব মিত্তির এগিয়ে গিয়ে বাড়িটায় ঢুকলো।

উঠোনে জমেছে খড় কাঠি নোংরার স্তূপ। ভাঙ্গা হাড়ি-কুড়ি তালাই• এসে জুটেছে। থমকে দাঁড়ালো কেশব মিত্তির।

এদিক ওদিকে কি যেন দেখছে সে। বাতাসে ওঠে সর সর শব্দ ভয়ও হয় তার।

তবু দাঁড়িয়ে থাকে আবছা অন্ধকারে। তার এতদিনের বাড়ি—অতীতের সেই দিনগুলোকে খুঁজছে একটি অসহায় মানুষ।

আবার দিন বদলাবেই।

পুরোনো খিলানগুলোর নীচে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। এখানে চাঁদের আলো ঢোকেনি। টর্চের একফালি আলোয় দেখে সে এদিকের দেওয়াল বেশ খানিকটা ধুয়ে গেছে, হাড় কঙ্কাল বের করা বাকী খানিকটা গাঁথুনি ওখানে শূন্যে ঝুলছে। ছাদের খিলানের টানেই বোধহয় ওখানটা ধ্বসে পড়ে নি এখনও।

কেশব মিত্তির এগিয়ে যায়, ওদিকটাতেই বোধহয় কিছু থাকতে পারে, হাতের সাবলটা দিয়ে নীচে আঘাত করছে, আর কান পেতে শোনে কোথাও কোন শব্দ ওঠে কিনা।

—ঠং!···কি বিজাতীয় একটা শব্দ তার কানে আসে, চমকে ওঠে কেশব মিত্তির। এ যেন পিতলের কলসীতেই লেগেছে তার সাবলটা।

বন্যায় ধুয়ে গেছে এতদিনের সেই গুপ্তধনাগারের পাঁচীল।

সামনে যেন তার সেই সম্পদ। আবার সেই গৌরবময় দিনগুলো ফিরে আসবে। সবকিছুর মালিক হবে কেশব মিত্তির।

কেশব মিত্তির জোরে জোরে সাবলের ঘা মারছে।

ইটগুলো ঝরছে—একটার পর একটা ইট খসে পড়ে। এবার সেই সব সম্পদ তার হাতের মুঠোয় এসে পড়বে।

একটা শব্দ ওঠে। মাথায় পড়ছে গুড়োগুড়ো সুরকি-টুকরো ইট। প্রাণপণ ঘা মেরে চলেছে কেশব মিত্তির।

হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে। পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে—চোখের সামনে ঝরে পড়ে সুরকির জমাট আস্তর, এতদিনের জীর্ণ দেওয়াল সব খসে পড়ছে। ধ্বসছে মিত্তির বংশের প্রাসাদ আর সেই

প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে যায় কেশব মিত্তির।

তার অস্ফুট আর্তনাদও বাইরের জগতে শোনা যায় না, অসমাপ্ত চীৎকারও থেমে যায়, পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই বিরাট একটা ইট সুরকির স্তূপ ধ্বসে পড়েছে।

ধ্বংসপুরীতে খানিকটা সময় ধরে সেই শব্দটা ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে থেমে গেল। আবার অন্তহীন স্তব্ধতা নামে এই ধ্বংসপুরীর বুকে। আশ্রয়চ্যুত একটা খ'য়ে গোখরো বিরক্ত হয়ে বুকে হেঁটে অন্য দিকে চলে গেল নোতুন আশ্রয়ের সন্ধানে।

—বাবা! ধীরা ডাকছে।

সেই ডাকটা রাতের আবছা রহস্যময় আলো-আঁধারির মাঝে সাড়া তুলে শূন্য মাঠে ওই নদীর বুকে হারিয়ে যায়।

ওরা খুঁজছে হারানো মানুষটাকে। ধীরার ডাক আর তার কানে পৌঁছবে না। কি এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, পূর্ণতার আনন্দের স্মৃতি নিয়ে সেই লোকটা কোন ধ্বংসস্তূপের অতলে হারিয়ে গেছে।

রাতের অন্ধকারে কোন পাত্তাই মিলবে না।

দ্বিজেন কথাটা বলে। ধীরা চুপ করে চেয়ে থাকে। তার কথাতেই ওরা এসেছে এই ধ্বংসপুরীতে।

কিন্তু বন্যার স্রোত বয়ে গেছে এবাড়ির উপর দিয়ে, এখান ওখানে পাঁচীল ধ্বসেছে, কোনটা বিপদজনকভাবে হেলে আছে। আর জমে আছে জঞ্জাল।

···রূপেন বলে—রাতে এখানে বেশী দূর যাওয়া যাবে না দ্বিজু! কাল সকালে দেখতে হবে।

হঠাৎ ধীরা চীৎকার করে ওঠে।

—এইখানটা ধ্বসেছে একটু আগে! ওই তো কি পড়ে আছে?

টর্চের আলোয় সেটা তুলে নেয় দ্বিজু।

কেশববাবুর চশমাটা পড়ে আছে ওখানে।

…ব্যাপারটা বুঝতে বাকী থাকে না।

ওরা ইট-সুরকির স্তূপ সরাচ্ছে। ধীরা আর্তনাদ করে ওঠে,
—বাবা!

কেশব মিত্তিরের বিকৃত প্রাণহীন দেহটাকে ওরা বের করেছে।

ধীরার আর্তকণ্ঠস্বর ওই ধ্বংসপুরীতে কি বেদনার সাড়া জাগায়। এ বন্যা রতনের শিশু—এই বৃদ্ধ সকলকেই মৃত্যুর স্পর্শে মুক্তি দিয়েছে। স্তব্ধ মানুষগুলো সেই মৃত্যুকে আবার প্রত্যক্ষ করেছে এখানে।

ধীরার সব হারিয়ে গেল।

এদের চোখের সামনে যেন নিষ্ঠুর অতীতের গ্রাসটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। এ অতীত প্রাণহীন, নির্মম। সবকিছু কেবল লুণ্ঠনই করে নেয়।

চারিদিকে ছড়ানো সেই লুণ্ঠনের চিহ্ন, নির্মম নিষ্ঠুর সেই চিহ্নগুলো সারা মাঠ গ্রাম-এর বুকে ছড়িয়ে আছে। মাঠগুলো এত দিন জলে ডুবে ছিল, ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক করতে পারেনি মানুষগুলো। তাছাড়া ওদের চোখের সামনে তখন মৃত্যুর ছায়া, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করেছে সর্বগ্রাসী বন্যার সঙ্গে। ওই আকাশ জোড়া বর্ষার সাথে!

হুমুঠো উদরান্নের সন্ধানে বসেছিল ওখানে, চেয়েছিল একটু মাথা গোঁজার আশ্রয়। তাই অন্য ক্ষয়ক্ষতির কথাটা ভাবার মত মানসিক অবস্থা তাদের ছিল না। কয়েকটা দিন তার জীবনের পাতায় রক্তের আখরে লেখা আছে, স্মৃতির ভাঁড়ারে বিষাক্ত বেদনায় তা নীল বিবর্ণ একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে।

এবার বাঁচার প্রশ্নটার কিছুটা মোকাবিলা করেছে, এ যেন তাদের অনেকের কাছেই নবজন্মের সামিল। যতীন বুড়ো একমাত্র অঙ্গাভরণ ধুসো চাদরটা চাপিয়ে উঁচু ভিটে থেকে এবার নেমে এসেছে গ্রামের পথে। দৃশ্যটা দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

—ই কুথাকে এলম বাপ্! ই কুন রূপগঞ্জো? ই তো

শ্মশান রে !

লোকগুলো সকলেই এবার সেই আশ্রয় থেকে নিজেদের ঘর বাড়ির সন্ধানে বের হয়েছে। পাড়াগুলো এখন শুধু মাত্র মাটির বাড়ির পাহাড় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কাঠ-তালের কাঁড়ি, ভাঙ্গা ঘরের সাজ বিবর্ণ হয়ে কাদায় পড়ে আছে, মাঝে মাঝে দোতলা মাঠকোঠার দেওয়ালগুলো কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে, একদিক ধ্বসে পড়েছে। সেখানে গৃহস্তের মঙ্গলঘটটা কাৎ হয়ে গড়াচ্ছে।

বাতাসে ওঠে পূতিগন্ধ।

পানুঘোষ হাহাকার করে ওঠে—ই আমার ডাইনের বাঘা বলদটা গ !

মরে ঢোল হয়ে পচে আছে পথেপথে তাদের প্রিয়সঙ্গী গরু বাছুর চাষের বলদ। অনেকেরই নিশানা নেই।

শকুন কাকগুলো ক'দিন ভোজ লাগিয়েছিল, এবাব মানুষের পায়ের শব্দে, কথার সাড়ায় বিরক্ত হয়ে ডানা মেলে উড়ে গিয়ে দু'চারটে টিকে থাকা বট অশত্থগাছের ডালে গিয়ে বসলো। মনে হয় বিরক্ত হয়েছে তারা, তাদের এতদিনের কায়েমী অধিকারে ওই মানুষগুলো আজ অনধিকার প্রবেশ করেছে।

দাসজী দেখছে ওই গ্রামের ধ্বংসস্তূপগুলোকে। তার ওদিকে বেশ উঁচু টিবির উপর বিরাট পাকাবাড়ি গুদামঘর, সেখানে বিশেষ জল ওঠেনি। গোয়ালঘর খামারবাড়ির দেওয়াল দুচার জায়গায় ধ্বসেছে। গরু বাছুর সবই মজুত আছে।

দাসজীর চোখেও লুব্ধ শকুনের মত দৃষ্টি ফুটে ওঠে। ও জানে ধ্বসেপড়া গ্রামের মানুষগুলো এবার তার কাছেই আসবে। আর সেও মনে মনে হিসেব করে কাকে কি ভাবে পাকে পাকে জড়াবে।

রতন-এর ভিটে মাটির চিহ্ন নেই, টিকে আছে সেই আমগাছটা, যেখানে তিনদিন ধরে আশ্রয় নিয়েছিল সে !

রতন বলে—কি হবে দাসজী !

এ প্রশ্ন সকলেরই। দাসজীই এখন তাদের একমাত্র নির্ভর।

দাসজী বলে—যাবি, পরে দেখা যাবে। তবে বাবা মাধববাবুকে ধর। তোদের সঙ্গে আমিও যাবো। এ বিপদে ত্যানাকে বলে করে সরকারী সাহায্য আনাতে হবে।

সরকার থেকেও কর্তাব্যক্তিরা এসেছেন। তারাও গ্রামে ঘুরছেন। মাধববাবুও রয়েছে, ব্রজদুলালবাবু রূপেন দ্বিজেনের দলও আছে। এইটাই ছিল গ্রামের পঞ্চজনের মন্দির, ওদিকে স্কুলবাড়ি।

রূপেন যেন ওদের এক পুরাকীর্তির ধ্বংসস্তূপে নিয়ে এসে একালের ট্যুরিষ্ট গাইডের মত অতীতের দিনগুলোর উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছে। রিলিফ অফিসার দেখছেন সেই ধ্বংসস্তূপগুলোকে। শুধু এই গ্রামেই নয়, এই অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামের এই এক দৃশ্য দেখছেন তিনি।

রূপেন বলে—স্কুল বাড়িটাকে তুলতে হবে, ওদিকে গার্লস স্কুলের অবস্থাও এমনি। লেখাপড়া করবে কোথায়?

নিরু ঘোষ, যতীনবুড়ো, হরিহর রায় আরও অনেকেই রয়েছে। যতীন বলে।

—মাথা গোঁজবো কুথাকে? খাবো কি গ বাবু! ছেলেপুলে—গুলানকে দেখতে পারি নি, তাদের্ বাঁচাতে হবেক আগে তারপর লিখাপড়ার কথা।

—কি হবেক গো!

রূপেনরাও তা জানে। মাধববাবুর পিছনে এর মধ্যে খবর পেয়ে শ্রীধর দাসও এসে সামিল হয়েছে। পানু ঘোষও এসেছে। দ্বিজেন রূপেনকে ছাপিয়ে যেন ওদের আশ্বাস দেয়—ব্যবস্থা হবে।

মাধববাবু দেখেছে ব্যাপারটা। ব্রজদুলালবাবু কাদা জল ভেঙ্গে হাঁপাচ্ছেন। বয়স হয়েছে তাঁর।

রূপেন বলে—জ্যাঠাবাবু, আপনি বরং ফিরে যান। আমরা

ওদিকটা দেখিয়ে ওঁদের আপনার ওখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

দ্বিজেনও চলেছে এস-ডি-ওর সঙ্গে সঙ্গে, কি যেন বোঝাতে চাইছে তাকে। মাধববাবুর নির্দেশে সে এইভাবে আগলে রেখেছে সাহেবকে।

শতকণ্ঠের আবেদন ওঠে। মাধববাবু চাইছে এবার যেন তাদের দলেরই করার মত কিছু সময় এসেছে।

ওই সর্বহারা মানুষদের সামনে কিছু সামান্য মাত্র দিয়ে এই সময় কেনা যাবে অনেক ভোট। তাদের জনপ্রিয়তাও বাড়বে, আর কায়েম হবে তার আসনটা।

মাধববাবু বলে—হবে, ক্রমশঃ সব সাহায্যের ব্যবস্থাই হবে।

যতীন বলে—শীতের আগে না হলে জাড়ে না খেয়ে বিবাক ফুটে যাবেক গ !

…সত্যি কথা।

ওঁরাও ভাবছেন সেই কথা। কদম বুড়িও বের হয়েছে। হাতে লাঠি, কাঠি কাঠি পাগুলোয় কাদার ছাপ, বাতাসে উড়ছে ওর সাদা শন-নুড়ির মত চুল। গায়ে খড়ি জমেছে।

ধ্বংসপুরীর উপর থেকে বুড়ি দুজন মজুর লাগিয়ে কাঠ দরজা জানালা বের করছিল। পথে ওই শোভাযাত্রা দেখে এগিয়ে আসে। বেশ চড়া গলায় বলে রিলিফের কর্তাদের—কি দেখতে এয়েছো বাবা ? ভিটে পুরী ! তা কিছু করতে টরতে পারবে, না বচন দিয়ে সটকে পড়বে ?

কে বলে—ওই তো মাধবও রয়েছে গো—

—লুকগুলোর কিছু হবেক, না দুম্ দাম্ করেই থেমে যাবে ? আর ইরা পথে পথেই ঘুরবেক ?

মাধব বলে—হবে খুড়ি। তার জন্যেই তো এঁরা এসেছেন।

কদম বুড়ি বিরক্তি ভরে বলে—আর হয়েছে !

পরক্ষণেই ফুঁসে ওঠে মজুর দুটোকে—হাঁ করে দেখছিস কি তুরা ?

এঁ্যা, কোঠা বালাখানা হবেক। হাত চালা মুখপোড়ারা! ভগমান মেরেছে আর কি হবেক বল? ভগবানের মার ছুনিয়ার বার। তুরা মরতেই জন্মেছিস, মরবি! ই আর লোতুন কথা কি!

বুড়ি এক কথায় যেন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে একটা ভাঙ্গা তক্তার ওপর বসে হাঁপাতে থাকে।

তবু বাঁচতে হবে। তাই ওই ক্ষতবিক্ষত মাঠে নেমেছে মানুষগুলো কিসের সন্ধানে। ···গ্রামকে ঘিরে ছিল সবুজ ধানের ক্ষেত। শরতের প্রথম দিক। অন্য বছর এ সময় থাকতো সবুজের স্নিগ্ধতা। যতদূর চোখ যেতো ছিল ঢেউ খেলানো সবুজ ধানক্ষেত! গ্রামের লাগোয়া জমিতে ছিল আখের ক্ষেত, ওদিকে আউশ ধান পাকতো, সোনা রং-এর ছোপ জাগতো সবুজের বুকে।

দল বেঁধে ধানক্ষেতে নামতো টিয়াপাখীর দল, শিষ দিতো দোয়েল পাপিয়া, ধানের ক্ষেতে শিহর জাগতো বাতাসের সুরে, সুন্দর স্বপ্নময় একটি পরিবেশ গড়ে উঠতো।

···আজ সেখানে কোনও সবুজ স্নিগ্ধতার লেশমাত্র নেই, জল নেমে গেছে—জমেছে বালির চর, অজয়ের বুকের সব বালি ওই বন্যার তোড়ে এসে জমা হয়েছে জমিতে। সবুজের সব স্বপ্ন মুছে গিয়ে সেখানে এসেছে মরুভূমির রুক্ষতা। কোথায় বা এখনও নদীর খাত হয়েই রয়েছে। মাটি গর্ত করে নদীর জল বয়ে গেছে। এখনও সেখানে একমানুষ ছুমানুষ ভোর জল থিতিয়ে আছে। বাকী সব বালির নীচে।

নিরু ঘোষ সাবল দিয়ে বালির মধ্যে গর্ত করে চলেছে। বলে সে

—ই যে ছুহাত নেমে গেলাম তবু মাটি নাই গ, শুধু বালি আর বালি। ইখানটাতো রতনের ওই মিত্তিরদের দারুণ জমি ছিল মনে হয়, সাঁয়া ধান হইছিল, কুথায় গেল গো সি সব!

রতন উবু হয়ে বালির উপর বসে তার চাষ দেওয়া জমির নিশানা

খুঁজছে। হিসাবই করতে পারে না। তবে ওদিকে কোমর অবধি বালিতে ডুবে থাকা খেজুর গাছটা দেখে দক্ষিণ দিককার আলটার কথা মনে পড়ে।

রতনের সব গেছে। রতন বলে,

—তাই তো মনে হয় গো নিরুদাদা, মেঘবরণ ধান-এর ঝাড় এয়েছিল, সাতদিন আগে সালফেট পটাশ দিলাম।

দাসজীও মাধববাবুকে নিয়ে মাঠে এসেছে। যেন ওদের সমবেদনা জানাতে চায় তারা।

দাসজী বলে—বরাতে নাই রে! কি করবি বল।

…চুপ করে থাকে ওরা। কে আর্তনাদ করে।

—ই বালির মরুভূমি হয়ে গেল বিবাক জমি। আমাদের কি হবে বাবু?

…ভাবছে রূপেনও। মাধববাবুও আশ্বাস দেয়।

—একটা ব্যবস্থা হবে। রিলিফের ব্যবস্থা হবেই। আমি সদরে যাচ্ছি।

দ্বিজেন বলে—দরকার হয় কলকাতাও যাবো।

সন্তোষ দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখেছে এই চাকলার গ্রামকে গ্রামের অবস্থা এমনিই হয়ে গেছে।

বলে ওঠে সন্তোষ—রিলিফ দিচ্ছেন দেন। কিন্তু এই জমির বালি উদ্ধার করতেই হবে। নইলে ভিক্ষে দিয়ে আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন মাধববাবু? জমি না পেলে এরা বাঁচবে কি করে?

মাধববাবু ওর দিকে চাইল। শ্রীধর দাস—পানুও এগিয়ে আসে। ওই ছোকরার কথাগুলো অমনিই। দাসজী বলে,

—সেটাও ভাববো আমরা। তা তোমার নিবাস কোথায় হে? বানের স্রোতে ভেসে এসেছিলে—এবার বান কমেছে তা যেখান থেকে এসেছিলে সেখানেই যাও!

সন্তোষ চাইল দাসজীর দিকে। মাধববাবুর মুখটা কঠিন হয়ে

উঠেছে। চুপ করে আছে সে।

সন্তোষ বলে—এখানে থাকার কি কোন অধিকার নেই আমার?

রূপেন এগিয়ে এসেছে। ও জানে মাধববাবু দাসজীদের নানা-ভাবে লোকের বিপদের দিনে তাদের প্যাঁচে ফেলার কথা। ওরা তারই প্রতিবাদ করে তাই ওদের পছন্দ করে না দাসজীর দল। সন্তোষও ক'দিনেই তার সেবাকাযের মধ্যে দিয়ে এখানে সুনাম কিনেছে, তাই ওদেরও নজর পড়েছে সন্তোষের দিকে।

রূপেন বলে—আমার বন্ধু। বিপদের সময় বন্ধুবান্ধব আসাও কি চলবে না এখানে দাসজী?

শ্রীধর দাস বেগতিক দেখে বলে—না, না। ঠিক চিনিনা—তাই খবর নিচ্ছিলাম। তোমার বন্ধু! বেশ-বেশ।

পরক্ষণেই ও প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে রিলিফ অফিসার, ব্লকের অফিসারকে।

—চলুন স্যার। দক্ষিণের মাঠগুলো দেখবেন।

সন্তোষ বলে—আর জমির—ওই বসতের জায়গার নিশানা করতে হলে নোতুন করে আমিন দিয়ে মেপে পড়চা হিসেবে জায়গা বের করতে হবে স্যার।

নিরু ঘোষ-রতন-নিমাই দত্ত-কেষ্টবাবু-ভবতোষবাবু সকলেই কথাটায় সায় দেয়।

—তাই করার ব্যবস্থা করুন। নাহলে কার জায়গা জমি কার মধ্যে ঢুকে যাবে কে জানে? আল চিহ্নও নেই কিছু।

ডি-এম বলেন—নোতুন সেলেটমেণ্ট আসছে। তারাই করে দেবেন।

শ্রীধর দাস পানু ঘোষ মায় মাধববাবু অবধি ভেবেছিল এবার ওই বালি চাপার দোহাই দিয়ে তাদের কিছু ভাগের জমি, মায় অপরের কিছু জমিও নিজেদের মধ্যে ঢুকিয়ে নেবে। তাছাড়া শ্রীধর দাস এর আগে থেকেই অনেকের জমি জায়গা নানা ভাবে নানা পাকে

প্রকারে তার নিজের দখলে এনেছে। তার পরিমাণও কম নয়। সাতে পাঁচে দাসজী এই মাঠগুলোতেই শতখানেক—শদেড়েক বিঘে উৎকৃষ্ট জমির বর্তমান দখলদার।

কিন্তু নোতুন করে সেটেলমেণ্ট করে মাপ মত জায়গা বের হলে আগেকার মালিকদের হাতেই ফিরে যাবে সেই জমি, তার দখল আর থাকবে না। প্রচুর জমি তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই দাসজী চীৎকার করে

—কেন ? আবার সেলেটমেণ্ট মাপজোক হবে কেন স্যার ? যার যার জমি নিজেরা চিনতে পারবে না এ কেমন মালিক হে ?

দাসজী ডি এমকে বলে—ওভাবে সময় নষ্ট করে লাভ হবে না স্যার। বালি তোলার খর্চা বিঘে হিসেবে আমাদের দিয়ে দ্যান। নিজের নিজের জমির বালি তুলে নিয়ে আবার চাষ আবাদ করি। কি বলেন ছোটবাবু ?

দুজনের মধ্যে খুবই ভাব।

মাধববাবুরও স্বার্থ জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে। তাই মাধববাবু বলে—এই তো বেশ কথা। চটপট সব কাজ হয়ে যাবে।

তরুণ অফিসার ভাবছেন কথাটা। দ্বিজেন বলে

—কথাটা ঠিক বলেছেন উনি ?

রূপেন বলে ওঠে।

—দাসজীর নির্দেশমত টাকা দিলে সব টাকাই ব্যয় করে দেবে এরা খিদের জ্বালায়, ওই জমির বালি আর উঠবে না। টাকাই জলে যাবে। তার চেয়ে সরকার থেকে ওটা করা হোক, আমরা সঙ্গে থাকবো।

ডি-এম সাহেবেরও মনে হয় ওই রূপেনবাবু, সন্তোষের কথাই ঠিক।

তিনি বলেন—কথাটা ভেবে দেখছি। আর সেটেলমেণ্টে এবার বর্গাদারদের নামও বসবে। সেটা যাতে হয় দেখবেন আপনারা।

দাসজী রেগে উঠেছে। সে বুঝেছে এবার তাদের বিপদই বাড়বে। আগুণে ঘি পড়েছে। যেন দপ্ করে এবার জ্বলে উঠবে। কিন্তু রাগটা চেপে গেল কোনরকমে দাসজী। ওরা চলেছে ওদিকের মাঠে। দাসজী গর্জায়—ওর হুকুম! মানবো নাই হে!

পান্নু বলে—আপনি যাবেন না গ দাস মাশায় ই রোদে!

শ্রীধর দাস-এর টাক ঘামছে ঠিক রোদের তাপেই নয়, রাগেও। রাগলে ওর টাকটায় বিন্ বিন্ করে ঘাম জমে। দাসজী বলে

—বড্ড রোদ। চল বাড়ির দিকে।

শরীরটা যুৎ নাই, পান্নু ঘোষ ছাতাটা দাসজীর টাকের উপর ধরে দু'জনে ফিরছে বালিয়াড়ি ঠেলে।

পান্নু বলে—ওই নোতুন ছোঁড়াটা মহা পাজী গো দাসজী!

দাসজী বলে—ও যা করছে তাতে গাঁয়ের বিপদই বাড়বে। তোদের সকলকেও ও বিপদে ফেলবে এবার।

পান্নু বলে—তার আগেই বলো নাহয় ওকে দিই শেষ করে! দাসজী অবশ্য অখুশি হয় নি। তবু বলে সে

—ওসব থাক। দেখি ছোটবাবু কি বলেন। তবে তোদেরও এবার ভাববার সময় এসেছে।

বাঁধের নীচে হঠাৎ নোতুন ছাউনি আর ভজন দাসের আশ্রমের ধ্বসেপড়া রূপটা দেখে শ্রীধরের খেয়াল হয়। বলে সে

—তুই যা পান্নু, ওরা দক্ষিণের মাঠে গেছে, সেটেলমেণ্ট-এর কথা কি বলে ওরা একটু শোনগে। ওবেলায় আসবি খবর নিয়ে।

পান্নু চলে গেল বাঁধের ওদিকে।

শ্রীধর দাস এবার একাই চলেছে ওই নোতুন ঝুপড়িগুলোর দিকে। বর্তমানে ওটাই ভজনদাসের আখড়ার নোতুন রূপ।

রাধারাণী ব্যাং-এর ভরসাতেই এখানে এসে উঠেছে। ব্যাং-এর বুড়ি মা রয়েছে। ব্যাং ওদিকে মজুরদের নিয়ে বেড়া বাঁধাতে ব্যস্ত।

দূর থেকে ট্রাকে করে খড় বাঁশ এনে কোনরকমে দুখানা ঘর তুলেছে তারা।

রাধারাণী অসময়ে শ্রীধর দাসকে আসতে দেখে চাইল। দাসজী রোদে গরমে ঘামছে। বন্যার পর রোদের তাতও যেন বেড়েছে। দাসজী ছাতাটা বন্ধ করে বলে

—যা রোদ। মাঠ ঘুরতে এসেছিলাম। তোর বাড়ি দেখে এলাম। তা কি হাল হয়েছে রে? এঁ্যা—ভজনদাস-এর আখড়া নয় যেন নিধুবন কুঞ্জবন ছিল, আহা! শান্তির ঠাঁই ছিল রে! এখন—

কথাটা মিথ্যা নয়। সারা আশ্রম জুড়ে ছিল সবুজ গাছগাছালি মাধবীলতা ঝুমকো লতার বেষ্টনী। কামিনী গুলঞ্চ টগর বেল ফুলের রাজ্য ছিল, সবুজ গাছে জড়িয়েছিল শ্যামসবুজ মাধবীলতা। লাল সাদা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ভরে থাকতো। বাতাসে উঠতো মিষ্টি সুবাস।

আজ সব সবুজ মুছে গেছে। মাধবীলতার গাছগুলো মরে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝুলছে। মুছে গেছে অনেক গাছগাছালি। দু'একটা টগর কাঠ চাপার গাছ কোনরকমে টিকে আছে। নিঃস্ব রিক্ত সেই আশ্রম।

রাধা বলে—সব তো গেছে দাসমশাই।

কি ভেবে রাধা বলে—বসুন!

দাসমশাই বলে—বসার সময় কই রে? একবার দেখে গেলাম। যা হাঙ্গামা চলেছে রে! ভাবলাম বানের পর ভাঙ্গা ঘর বালিভরা জমি আবার মুক্ত করে মানুষ কাজে নামবে। তা হবার উপায় আছে? শুধু দলবাজি আর যে যার কোলে ঝোল টানার চেষ্টা নিয়েই ব্যস্ত। ওই রূপেন আর তার পার্টির কোন এক বাউণ্ডুলে এসে জুটেছে সন্তোষ না কে—ব্যাটা গোলমাল বাধাবে মনে হচ্ছে। তবে বাপু এ বড় কঠিন ঠাঁই, বাছাধনকে আমিও ছেড়ে কথা কইব না।

রাধা চুপ করে শুনছে কথাটা। দাসজী বলে।

—তোদের জমিও কিছু আছে। তা বাপু শুনছি নোতুন

সেটেলমেণ্ট হবে, দেখিস ওরা যেন বর্গাদারী ফর্গাদারীতে কারো নাম না বসিয়ে দেয়। তেমন তেমন বুঝলে আমাকে খবর দিবি।

রাধা ওসব ব্যাপার ঠিক বোঝে না। ব্যাংও দাসজীকে দেখে এসেছে। ব্যাং বলে—সব্বাই যা করবে তাই হবেক গ!

দাসজী ফুঁসে ওঠে—তুই ব্যাটা থামতো? সবার সঙ্গে তোর সঙ্গ? খোল বাজাস তাই বাজাবি। বুঝলে রাধা—কোন অসুবিধা হলে খবর দিও। চলি—ভজন নেই এখন, যাক্ আমরা তো আছি।

আর ওই কেত্তনের তারিখটা পরে জানাচ্ছি। সেদিন শোনা যাবে তোমার গান! চলি।

দাসজী চলে গেল। রাধা ভাবছে লোকটার প্রবেশ প্রস্থানের কথা। গ্রামের কিছু লোক আর এদের মধ্যে কোথায় একটা সংঘাত বাধতে চলেছে। তাতে ভালোমন্দ কি হবে তা জানে না রাধা। তবু কেমন ভয় ভয় করে তার!

রাধা বলে—কি সব গোলমাল হবে রে ব্যাং?

ব্যাং বলে—শুনছি বটে! তা দেখা যাক পাঁচজনে কি বলে! ব্যাং পরক্ষণেই শোনায়—ছাড়ো দিকি দাসজীর কথা। উ যখন হবে দেখা যাবে। যাই—ওদিকে কিছু দড়ি ফড়ি আনতে হবে, যা দাম শালোর!

ব্যাং চলে গেল কাজের তাগিদে।

কেন জানে না রাধা আজ ওই গোলমাল এড়াতে চায়। মনে হয় মাধববাবুর ওখানে কীর্তনে যাবে না সে। রূপেনদাও নিষেধ করেছিল, কিন্তু সেদিন রাধা কি জেদের বশেই কথাগুলো শুনিয়েছিল ওদের। রাগটা রূপেনের উপর নয়, অভিমানটা জমে উঠেছিল সন্তোষের উপরই!

বৈকাল নামছে। বালুচরে দিনের রোদ সোনালী হয়ে আসে। এর মধ্যে ঠাঁই ঠাঁই কাশঘাস-এর দল মাথা তুলেছে, সন্ধ্যার ছায়া নামছে।

প্রদীপ জেলে ওই ধ্বংসস্তূপের বুকে নোতুন সন্ধ্যাকে বরণ করে গ্রামের মানুষ, তবু শাঁখ বাজে! মন্দির নেই, চালাতেই সন্ধ্যার বন্দনা করে রাধা। হঠাৎ কাকে দেখে চাইল সে!

—তুমি!

রাধা সন্তোষকে আসতে দেখে চাইল। মাথায় ঘোমটার বালাই নেই, কাপড় চোপড়ও অসংগত। রাধা কাপড়টা তুলে দেয় মাথায়! সন্তোষ দেখছে এদের সংসারের বর্তমান অবস্থা।

রাধা বলে—গোটা বালাখানা বানিয়েছি তাই দেখছো, না?

সন্তোষ বলে ওঠে—তোমার তবু এটুকু আছে, আমার তো কিছুই নেই!

রাধা শোনায়—কিন্তু মেজাজ তো আছে। এখন শুনি তুমিই গাঁয়ের লীডার। লোকের জমি জায়গা নিয়েও গোলমাল বাধাচ্ছো।

হাসে সন্তোষ—ওসব খবরও এসে গেছে দেখছি! তবে কি জানো—অত্যাচারীকে মেনে নেওয়া উচিত নয়।

রাধা ওর দিকে চেয়ে থাকে। অতীতের কথা সে ভোলেনি আজও।

রাধা বলে—সেদিন কিন্তু আর একজনের উপর এতবড় অবিচারের কোন প্রতিবাদই করোনি। তাহলে হয়তো এভাবে সব হারাতো না। সেইরাত্রে সন্তোষকে শুনিয়েই যেন রাধা নিজের পথের কথাটা ঘোষণা করেছিল।

সন্তোষ ভাবছে কথাটা। সে রাতে দুঃখই পেয়েছিল সন্তোষ। আজ এসেছিল সেই কথাটা জানাতে।

রাধা দেখছে ওকে। বলে সে—নিজের ক্ষেত্রে যেটা করতে পারো নি, আজ অপরের জন্য সেই কাজটা করতে এলে তার মূলে আন্তরিকতা, সত্য আদৌ আছে কিনা ভেবে দেখার কথা ওঠে।

চমকে ওঠে সন্তোষ, রাধা ওকে ভুলই বুঝে চলেছে।

বলে সন্তোষ—একি বলছো রাধা! নিজের স্বার্থ নিয়ে মানুষ

যদি একবার ভুল করে তাই বলে সে কি চিরকালই ভুল করবে ?

রাধা জবাব দিল না।

আজ তার মনে জেগেছে একটা হতাশার আঁধার। কি জ্বালায় যেন প্রতিশোধই নিতে চায় সে।

সন্তোষ বলে—ভুল বুঝে থেকো না!

হাসছে রাধা—তাতে কার কি যায় আসে ? অবশ্য তুমি এখন লীডার, জাম সংস্কার নিয়ে ভাবছো। কে ভুল বুঝলো না বুঝলো, তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। তবে ওরাও তোমাকে ছেড়ে দেবে না। সেটা মনে রেখো।

সন্তোষ জানায়—সেটা বুঝি রাধা। যার কিছুই নেই তার হারাবারও কিছুই থাকে না, শুধু প্রাণটা ছাড়া। ওটার ভয়ও বানের মুখে আট ঘণ্টা ভেসে থেকে মন হতে হারিয়ে গেছে। তোমার কিছু আছে—ভবিষ্যৎ-এর আশাও রাখো, তুমি ভয় করতে পারো—ওসব ভয় আমার নেই। কথাটা তাদেরও বলে দিতে পারো। চলি!

সন্তোষ উঠে পড়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বের হয়ে গেল সে।

ব্যাং ওদিক থেকে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। সন্তোষকে এখানে দেখবে ভাবেনি। আর রাধারাণীর কথাগুলোও শুনেছে সে। কি যেন বেশ কড়া কথাই শোনাচ্ছে সে। সন্তোষ চলে যেতে ব্যাং এগিয়ে আসে।

রাধা চুপ করে বসে কি ভাবছে।

নিজের এই জ্বালাভরা সত্তাটা যেন তার নতুন আবিষ্কার। ব্যাং বলে ওঠে—ওই রূপুদার বাহনটি এখানে কেন এয়েছিল গ!

রাধা ব্যাং-এর দিকে চাইল! ব্যাং যেন অন্য কোন রাধাকে দেখছে। শুধোয় সে—কি হ'ল তোমার ?

রাধার মনে হয় ওর মনের অতলের সেই দুর্বলতাটার খবর জেনেছে ব্যাং। এটা সে চায় না। তাছাড়া সন্তোষের এখানে আসার খবরটাও জানাতে চায় নি সে। রাধা বলে—এসেছিল ওদের

দলে যাবার জন্যে বলতে। জমি নিয়ে ওরা যা বলবে আমাদের তাই শুনতে হবে।

রাধা কি ভাবছে।

ব্যাং বলে—ইদিকে দাসজী মাধববাবুরা ওকে দেখতে পারে না। কমলদা যে কেন ইসব ঝামেলায় থাকে কে জানে! আমাদের উ সবে দরকার নাই বাপ্! কেত্তন গাই, বোষ্টম মানুষ—ফারাকেই থাকবো।

রাধা শোনায়—তাই বল্লাম ওকে।

ব্যাংও খুশী হয়—তাই ভালো। তালে মাধববাবুদের বায়না ধরতো? মাথুর গাইবে! যা জমাটি হবে না? ব্যাং নিজেই সেই আসরের ছবিটা যেন দেখছে।

রাধা ধমকে ওঠে—থামবি তুই! গানের কথা পরে হবে। এখন গরু দুটোকে খোলতানি দিয়ে একবার দ্যাখ বাবার কোন খবর এল কিনা। রামসাও এর দোকানে ড্রাইভার খবর দেবে বলেছে।

ব্যাং একটু অবাক হয়। এখবর নয়—ওকথাও নয়। তাহলে রাধা ভাবে কোনটাকে? ব্যাং-এর মাথায় ওসব আসে না। তাই ধমক খেয়ে মুখ বুজে থাকে সে।

রাধার মনে হয় একটা পথ বেছে নেবার দিন এসেছে। ওই দাসজীর লোভী হাতটা সবকিছুই কেড়ে নিতে চায়, তার এখানেও দলে এসেছে দাসজী ওই কীর্তনের টাকা কিছু দিয়ে লোভ দেখাতে। কমলদা সেই কথাটাই বলেছিল, আজ সন্তোষকে হয়তো পাঠিয়েছিল সেই-ই, কিন্তু রাধা মেজাজ গরম করে তাকেও যা তা বলেছে। কথাটা ভাবতে নিজেরই বিশ্রী লাগে। কি ভেবে দাওয়ায় উঠল সে।

ব্যাং শুধোয়—কোথায় যেছো গ?

রাধা জবাব দেয়—যমের বাড়ি! যাবি তুই?

ব্যাং গজগজ করে—কি হইছে বল দিন্! যা ম্যাজাজ—

রাধা বের হয়ে গেল।

রূপেনবাবুর সম্বন্ধে রাধার মনে একটা ক্ষীণ সুর রয়ে গেছে। সব হারিয়ে এখানে এসে ভজনদাস যখন বাড়ি তোলে তখন ওই রূপেনই এগিয়ে এসেছিল। তরুণ বলিষ্ঠ ছেলেটি প্রথমে ব্রজবাবুর ওখানে ভজনদাসের কীর্তন শুনে বলে, আপনি এখানে থাকবেন এতো আমাদের ভাগ্যের কথা। আপনার মত গুণী লোক গ্রামে এলেন!

রাধা দেখেছিল রূপেনকে। তখন কলকাতায় পড়ছে রূপেন।

ভজনদাস বলে—আমার মেয়ে। প্রণাম কর রাধা! কলকাতায় পড়ছেন উনি, দুটো পাশ দিয়েছেন রে!

রাধার ডাগর দুচোখে নীরব চাহনি ফুটে ওঠে।

রাধা দেখেছিল ক্রমশঃ রূপেনকে। তাদের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করেছে। রাধা কি যেন স্বপ্ন দেখে! রূপেন গ্রামে এলে এখানে আসতো, তাদের আশ্রমে। রাধার গান শুনে বলে—এখানে পড়ে আছো কেন? সহরে গেলে তোমার নাম ডাক হবে। সত্যি অপূর্ব গাও তুমি।

রাধা বলে—সহরে কে চেনে আমাদের?

হাসে রূপেন—চিনবে রাধা। তোমার নিজের গুণেই চিনবে তারা।

…রাধার মনের অতলে কি সুর জাগে। একটা নির্ভর-এর স্বপ্ন দেখে সে। কিন্তু জানে রাধা এর বাস্তবে কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবু মন এই যুক্তিতেও রাজী নয়। সে অন্ধ, অবুঝ।

তাই রাধার বাইরে কোন প্রকাশ নেই সেই পরিচিতির, তবু এটাকে অস্বীকার করতে পারে নি সে। তাই ওর সামনে সেদিন ওই চপওয়ালী হবার কথা বলে নিজেই দুঃখ পেয়েছিল।

আজ সন্তোষের আসাটাতে তাই বিস্মিত হয়েছে সে। কি একটা দোটানার মধ্যে পড়েছে রাধা। সন্তোষকে তাই কঠিন আঘাতেই ফিরিয়ে দিয়েছে, তবু রূপেনকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।

রাধা চলেছে রূপেনদের ওদিকেই। আজ সেও মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ধীরা ওই ধ্বংসপুরীতে আর থাকতে পারে না। বিরাট বাড়িটায় রাতের অন্ধকারে যেন বহু যুগের অশরীরিগুলো জেগে ওঠে। অন্ধকারে ধীরা শুনছে তাদের দীর্ঘশ্বাস। বুড়ি মানদা ঝিও বলে।

—এখানে থাকা ঠিক লয় গো দিদি! ত্যানারা সব বাতাসে ভর করে ফেরেন।

হয়তো তাই ধীরা দেখেছে সামনে অভাবের নগ্ন ছবিটা। মনে পড়ে রূপেনের কথা। ছেলেবেলায় দুজনে নদীর ধারে মন্দিরে ঘুরেছে। রূপেনের মা প্রতিমাও ভেবেছিল রূপেন ঘরবাসী হবে। বিয়ে থা করবে। আর ধীরাই আসবে এ বাড়িতে।

কিন্তু রূপেন সেদিকেই যায় নি। ধীরাও দেখেছে বিচিত্র ওই মানুষটিকে। নিজের আদর্শ স্বপ্ন নিয়েই মত্ত। তার তুলনায় দ্বিজেন অনেক সাদামাটা—সহজ। তাই যেন ধারার মন কোথায় তার ডাকে সাড়া দিতে পারে নি।

ভবতোষবাবু সংসারের কোন ব্যাপারে থাকেন না। ধীরা অবশ্য প্রতিমার কাছে আসে। প্রতিমারও ভালো লাগে মেয়েটিকে। এখন আরও বিপদে পড়েছে ধারা বাবা মারা যাবার পর। প্রতিমাও সেটা বোঝে। একা পড়ে গেছে বেচারা।

প্রতিমাও নিজে ক'দিন এসেছে ধীরাদের বাড়িতে। নির্জন থমথমে ভাঙ্গা বাড়িটায় ধীরা যেন কোন নির্বাসনে রয়েছে। প্রতিমাও শুধোয়—এবার তো একা পড়ে গেলে ধীরা! এতবড় বাড়িতে থাকাও মুস্কিল!

ধীরা জবাব দেয়—কি করা যাবে কাকীমা, মানদা পিসী রয়েছে, কোনরকমে পড়ে থাকতে হবে এখানেই।

প্রতিমা কথাটা ভবতোষবাবুকেও বলে।

—মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়। সব হারিয়ে একা ওখানে থাকবে?

ভবতোষবাবু চেয়ে থাকেন স্ত্রীর দিকে। শুধোন তিনি।

—কিন্তু তুমি কি করতে পারো?

প্রতিমা একটু বিরক্তিভরে বলে—তোমারই ছেলে তো, এটা দেখতে পায় না? আর এই সংসারের বোঝা ঠেলতে আমি পারবোনা তোমার ওই দেশসেবক ছেলেকে বলে দিও।

প্রতিমা কথাটা বেশ জোরের সঙ্গেই শোনাতে ছাড়ে না।

রূপেনও বাইরের ঘরে বসেছিল। ও কথাটা ভেবেছে। কিন্তু রূপেনের মনে হয় এসময় ঘর বাঁধার কোন প্রশ্ন নেই। ধীরাকেও হয়তো ভালো লাগে তার, এই বিপদে সেও ধীরার পাশে দাঁড়িয়ে সব কাজ করিয়েছে। একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থাও হবে তার। হয়তো স্কুলের চাকরীও করে দিতে পারবে কিন্তু তার জন্য বিয়ে করার কথাটা ভাবে নি এখনও। সম্মানের সঙ্গে বাঁচার পথই দেখাতে চায় রূপেন ধীরাকে।

ঘর বাঁধার স্বপ্ন তার নেই।

রূপেনের সামনে অনেক দায়, এখন বন্যার পর বিস্তীর্ণ মাঠ থেকে আবার বালি তুলে নোতুন করে সেটেলমেণ্টে চাষীদের নাম বসাতে হবে।

জানে বাধা আসবে। এতদিনের সংস্কার, ব্যক্তিগত মালিকানাকে নড়ানো কঠিন কাজ। জগদ্দল পাথরের স্তূপ সরানোর মতই কঠিন এ কাজ। তার পরই সুরু হবে আসল কাজ।

দ্বিজেন-নীরু সকলেই এসেছে। গোপালও আছে, গ্রামের নবীন ভটচাযও রয়েছে। নবীন-শশধর-গুপী-ছোট খাটো জমির মালিক কিছু চাষীরাও এসেছে। কদম বুড়িও হাজির হয়েছে। রূপেনকে বাড়ি থেকে বের হতে হবে, ওই ব্যাপারে আলোচনা হবে আজ।

মায়ের কথাটা কানে আসে রূপেনের।

ধীরার সমস্যা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার তত গুরুত্ব দেয়নি রূপেন। চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙ্গা ভিটের দিকে পা বাড়ালো কাগজপত্র নিয়ে।

ধীরা আসছিল প্রতিমার কাছে! বাইরের গলি থেকে সেও শুনেছে প্রতিমার ওই বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর। ধীরার মনে হয় রূপেন হয়তো গভীরভাবে এবার কথাটা ভাববে। মনের অতলে ক্ষীণ একটা সুর জাগে ধীরার। তার জীবনে এসেছে এতগুলো বসন্ত, কিন্তু ফুলফোটার কোন ইঙ্গিতই পায়নি সে। তার চিরন্তন নারীমন আজও নিঃসঙ্গ রয়ে গেছে কি ব্যর্থ ব্যাকুল কামনা নিয়ে। বাবা মারা যাবার পর থেকে ধীরার মনের এই নিঃসঙ্গতা বাড়ছে, আজ তাই ধীরাও যেন দুহাত ভরে কিছু পেতে চায়। আর তাই রূপেনের কাছেই আসে সে তার শূন্য অঞ্জলি পূর্ণ করে নিতে।

—তুমি! রূপেন বের হবার মুখে ধীরাকে দেখে দাঁড়ালো।

বৈকালের নির্জনতা নেমেছে, গাছগাছালিতে রোদের হলুদ আভা মিলিয়ে আসছে, সামনের বকুলগাছটা থেকে ঝরে পড়ছে বৃন্তচ্যুত ফুলগুলো। ওদের গন্ধে বাতাস ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ধীরা চাইল রূপেনের দিকে ডাগর চাহনি মেলে। ও যেন কি বলতে চায়।

রূপেনের সময় নেই, সামনে অনেক কাজ। রূপেন বলে।

—স্কুলের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসবো এবার ধীরা। চাকরীটা হলে তোমারও ভালো হয়।

ধীরা চুপ করে থাকে। কি ভেবে বলে।

—চাকরী! বেঁচে থাকার প্রশ্ন এসব তো ভাবতেই হবে।

রূপেন জানায়– পরে কথা হবে। এখন সেটেলমেণ্ট, জমি উদ্ধার এসব নিয়ে মিটিং আছে আটচালায়, তুমিও এসো!

—আমি! ধীরা ম্লান হাসলো। সে হাসিতে ছড়ানো রয়েছে বেদনার আভাস।

রূপেনের দাঁড়াবার সময় নেই, চলে গেল সে।

ধীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একাই।

হঠাৎ প্রতিমার ডাকে চাইল—কতক্ষণ এসেছিস ধীরা?

ধীরা যেন অপ্রস্তুত হয়েছে। কোনরকমে জবাব দেয়।

—একটু আগে।

—ভিতরে আয়! প্রতিমার ডাকে ধীরা চাইল।

মুখে চোখে ম্লান চাহনি। কি শূন্যতা নেমেছে ওর মনে। ধীরা বলে।

—এখন যাবোনা কাকীমা। জরুরী কাজ আছে। যাই।

চলে গেল ধীরা। প্রতিমার চোখে ওর ব্যর্থতার মালিন্য প্রকট হয়ে ওঠে। ওর চোখকে ধীরা ফাঁকি দিতে পারে নি। কিন্তু প্রতিমারও করার কিছু নেই। মেয়েটার জন্য দুঃখই বোধ করে সে। মনে হয় সব কেমন বদলে গেছে, মানুষগুলোও। চারিদিকের ওই বালুচরের নিঃস্বতা আর রুক্ষতা সব ফসলের সবুজ স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়েছে—তারই প্রতিফলন এসেছে মানুষের জীবনে। ওরা শুধু জ্বলে-পুড়েই মরবে এই নিঃস্বতার মাঝে।

আটচালাটা গ্রামের মাঝখানে। কয়েকটা পুরানো বট অশথ গাছের প্রহরা ঘেরা ঠাঁই। আগেকার চালাটা নুইয়ে ভেঙ্গে পড়েছে বানের তোড়ে। কোন রকমে খড় বাঁশ দিয়ে একটু চালা বানানো হয়েছে মাত্র।

শ্রীধর দাস আগেই এসে সভা জাঁকিয়ে বসেছে। নবীন ভটচায, গুপী, মদন অনেকেই এসেছে। মাধববাবু গ্রামে নেই। দুর্গাপুর-সিউড়িতে তার কাজ কারবার, কনট্রাকটারির কাজ চলেছে পুরোদমে, রাস্তা তৈরীর কাজগুলো চলছে। মাধববাবু বের হয়ে গেছে। ব্রজদুলালবাবুই এসেছেন। নীরু রতন যতীনবুড়ো নামোপাড়ার অনেকেই এসেছে। খগেনবাবুও এর মধ্যে এসে ইংরাজী খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে। দ্বিজেনকেও আসতে হয়েছে। আজ সে যেন তৈরী হয়েই এসেছে।

দ্বিজেন ধীরাকে সেই রাত্রে কথাটা বলেছিল কিন্তু আজও তার কোন জবাব পায় নি। কেশব মিত্তির মারা যাবার পর হয়তো ধীরা মত

বদলাবে এই আশা নিয়েই গিয়েছিল দ্বিজেন ওর কাছে।

কিন্তু দেখেছিল রূপেনকে। ধীরা আর রূপেন তন্ময় হয়ে কথা বলছে। এ যেন অন্য কোন ধীরা। ওর ডাগর চোখে কি দীপ্তি ফুটে উঠেছে।

দ্বিজেন তখনকার মত সরে আসে চুপি চুপি।

রূপেন চলে যেতে সে গিয়েছিল আবার।

দ্বিজেনের কথায় ধীরা বলে—গ্রামেই যদি কিছু পথ পাই তাহলে বাইরে যাবো কেন? দেখি কি হয়।

দ্বিজেন বুঝেছিল রূপেনই হয়তো তাকে কোন আশা দিয়েছে। দ্বিজেন মনে মনে রেগে উঠেছিল, কিন্তু জবাব দিতে পারে নি তখন।

বলে সে—ভেবে দ্যাখে ধীরা।

দ্বিজেনের সামনে এখন অনেক কাজ। মাধববাবুও বলে গেছেন তাকে দুর্গাপুরে যাবার কথা। হয়তো আজই ফিরবেন তিনি।

দ্বিজু বলে—ওদের জানাতে হবে কিনা তাই তোমার মতটা নিতে এসেছিলাম

ধীরা চুপ করে কি ভাবছে। হয়তো এখনও কোথায় আশার সন্ধান করে সে।

দ্বিজেন নিজেকে যেন আজ পরাজিত বলেই মনে করে। ধীরাকেও হাতে পায়নি। গ্রামেও দেখেছে রূপেনের প্রতিষ্ঠা। আজ দ্বিজেন তাই সব শক্তি দিয়ে বাধা দেবার জন্যই এসেছে এখানে। দাসজীকে দেখে চাইল সে।

ব্রজদুলালবাবু বলেন—এসো শ্রীধর!

কথাটা উঠতে বাধা দেয় নবীন—তা কি করে হয়? আমার জমি, কাকে চাষ করতে দেব না দেব সেটা আমি বুঝবো।

রূপেন বলে—সরকারের এটা নিয়ম। আগে থেকেই এটা নিয়ম হয়েছিল, কাজে লাগানো হয়নি। এখন যে ভাগচাষ করে তাকেও বর্গাদার বলে রেকর্ড করানো হবে।

ভবতোষবাবু বলে ওঠেন—কিন্তু সুরাহা কি হবে? একজন মালিকের জায়গায় যদি তিনজন মালিক হয় জমিতো বাড়ছে না। কার কি উপকার হবে এতে? চাষের গোলমাল হবে।

রূপেন চাইল ওর দিকে। দাসজী দেখছে ব্যাপারটা। বাবা ছেলের মাঝেও মতান্তরের প্রশ্ন দেখে বলে—ঠিক কথা! বালি তুলে দিক সরকার, চাষ আবাদ করি। এ ফসল তো গেল, অন্য ফসল করবো। বোরো হবে, রবি খন্দ হবে!

…নিরু ঘোষও শুনছে কথাটা।

রূপেন বলে—একজন মালিক নয় তুজনই হোল, কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা সেটার পরেই যা হওয়া উচিত তাই করবো।

নবীন ভটচায চমকে ওঠে।

—তারপরেও আবার কি হবে বাবাজী! মালিক তো ফৌত হয়ে গেল।

রূপেন বলে—আমরা সমবায় করছি। সকলের জমি একত্রিত করে বালি তুলে সেখানে যৌথপ্রথায় চাষ করতে চাই। তাতে সরকারী সাহায্যে ট্রাকটার, পাম্প, সার, বীজধান পাবো। ওই বালি সরিয়ে মজবুত বাঁধ হবে। আর ফসল যা হবে জমি অনুপাতে ভাগ হবে, মালিকও পাবে বর্গাদার হিসেবে যে মজুরী দেবে, সেও সেই ভাবে ভাগ পাবে ফসলের।

খগেনবাবু সব শুনে এবার শুধোয়।

—বাট এ্যানি গ্যারান্টি! কে দেবে সেই ফসলের দাম!

—আপনারা কমিটি করে যোগ্য লোকদের হাতে সেই ভার দেন। তারাই দায়ী থাকবেন! সন্তোষ কথাটা জানায়।

এইবার শ্রীধর দাস গর্জে ওঠে—পরের হাত তোলায় কেন যাবো হে? নিজের জমি কেন তুলে দেব তাদের হাতে? কি হে দ্বিজু? তুমি কিছু বল?

দ্বিজেন বলে ওঠে—করেক্ট। তেমন বিশ্বাসী লোক কই? তাছাড়া জমির স্বত্ব আল সব একাকার হয়ে যাবে। দখল চলে যাবে!

নবীন ভটচায পানু ঘোষ ধরতাই দেয়।

—জমির স্বত্ব বলে কথা। কেন ছাড়বো হে! নিজের কাঁথা পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ মরেন ঘুঁটে কুড়িয়ে। তাই হবে শেষকালে।

রূপেন দেখছে দ্বিজেনকে। দ্বিজেন যে এমনি কথা বলবে ভাবেনি। বলে ওঠে রূপেন

—তুই এর ভার নে দ্বিজ! তুই এগিয়ে আয়। দ্বিজেন চাইল রূপেনের দিকে। রূপেন যেন দ্বিজেনকে তারই অস্ত্রেই ঘায়েল করতে চায়।

দ্বিজু বলে—এতবড় দায়িত্ব নেবার মত ট্রায়েড কর্মী নেই! শেষ রক্ষে করবে কে? সব লুটপাট করে নেবে তারাই।

সন্তোষ বলে—এতবড় সর্বনাশা বানে সারা গ্রাম—আশপাশের গ্রামের এত মানুষকে রক্ষে করেছেন আপনারা, এই কাজটুকুর শেষ রক্ষে করতে পারবেন না?

দ্বিজেন জানায়—এসব আরও কঠিন কাজ।

ব্রজদুলালবাবু দেখছেন ওদের। কথাটা তাঁরও মনে ধরেছে! বলেন তিনি—বালি পড়া এত জমি মুক্ত করার সাধ্য সকলের নেই। চাষ করা তো দূরের কথা। সবই পুরোপুরি চলে যাওয়ার চেয়ে এমনি একটা কিছু করা কি ভুল? কি গবু হরো—বল তোমরা?

রূপেন বলে—দাসজী, মাধববাবু, নিধুবাবুরা খরচ করে বালি তুলতে পারেন, কিন্তু তোমাদের কি হবে? জমি মুক্ত করতে পারবে তোমরা কখনও?

ছোট খাটো চাষীদের মুখে ভাবনার ছায়া ঘনিয়ে আসে। সামনে তাদের কোন পথ নেই। ও মাটির সবুজ মুখ তারা দেখতেই পাবেনা আর, ফসলও হবে না। বালুচর নাহয় নদীর খাত-এর গভীর জলাই রয়ে যাবে। ক্ষত বিক্ষত বিবর্ণ দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে চেয়ে

থাকে তারা! তাদের মরাবাঁচার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত।

নিরু ঘোষ বলে—আমরা রাজী!

দুচারজনও সায় দেয়—তাই কিছু কর গ!···নাহলে বাঁচবো ক্যামনে! বালির পাহাড় তুলতে লারবো।

দাসজী গর্জে ওঠে—আমি এসবে নেই। জমি বিষয় সম্পত্তির স্বত্ব মুখের কথায় ছাড় দিই না রূপেন! যা খুশী করোগে তোমরা, আমার জমিতে যেওনা।

কালী ফণী দাসজীর জমিতে চাষ করে। তারাও শুনেছে বর্গাদারীর কথা। গরীব ছোট মালিকরা এটাকে মেনে নিয়েছে বাধ্য হয়েই। কিন্তু দাসজী মাধববাবুর মত লোকদের কাছে এটা সহজে হবে না! ফণী বলে—বর্গাদারীতে একদল চাষীর নাম বসবেক, আর আমাদের নাম বসবেক নাই—উরা মস্ত জোতদার বলে?

—ই ক্যামন কথা হে? গুরুচরণ বলে ওঠে।

কে প্রতিবাদ করে।

—আমারা কি ওর বর্গাদার লই? এতকাল চাষ করছি জমি।

দাসজী চাইছে ওদের। সর্বহারা ছিন্নমূল মানুষগুলোর সামনে কি আশা জেগেছে, তাই যেন প্রতিবাদে কঠিন হয়ে উঠতে চায় তারা।

দাসজী, এককড়ি দে, নিধুবাবুর দল গর্জে ওঠে—জমিতে আর যাবি নাই। বালি তুলবো নিজেরা, চষবো নিজের হালফাল করে। তোদের দরকার নাই।

দাসজীও অবাক হয়।

আজ দিন বদলেছে। বানের পর ওই মানুষগুলো আরও কঠিন হয়ে উঠে নোতুন এক জগৎ গড়ার স্বপ্ন দেখছে, জমি দখল করে দিন বদলে দেবার চক্রান্ত চলেছে। রূপেন সন্তোষরা সেটাকে ঢুকিয়েছে ওদের মাথায়।

ব্রজদুলালবাবুও দেখছেন পরিস্থিতিটা।

ফণী, বদন, কালো, রতনরাও জবাব দেয়।

—আইন হইছে, কেনে নাম বসবেক নাই দাসজী! আর পঞ্চজনের ভালো হবেক ওই সমবায়ে, তবে সেটি কেনে হবেক নাই?

রতন বলে—একার জন্যে পাঁচজনের ভালো করা আটকাবেন?

দ্বিজেন প্রতিবাদ করে।

—তোরা কি জমি এখনই জবর দখল করবি? না দাঙ্গা করবি?

কোলাহল ওঠে। দুচারবার থামাবার চেষ্টা করেও হতাশ হন ব্রজদুলালবাবু। সারা গ্রামে খবরটা রটে গেছে! গোপাল লাফ দিয়ে উঠে গর্জায়—চলে আয় মরদ! দেখে লিব।

শীর্ণ দেহটা কাঁপছে তার। রতনও ধমকে ওঠে—খবরদার! মারামারি বাধে আর কি!

ওই বঞ্চিত লোকগুলো ক্ষেপে উঠেছে। সন্তোষ রূপেনরা কোনরকমে তাদের থামায়। ব্রজদুলালবাবু বলেন—করছো কি তোমরা! ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে, এখন মাথা গরম করোনা!

দাসজী নবীন গোপালের দল উঠে পড়ে। দাসজী শাসায়।

—ডেকে এনে অপমান করা? মোল আনার মিটিং-এর মান মর্যাদাও রাখলে না রূপেন? ঠিক আছে, তোমরা যা ভালো বোঝ করো। আমরা এতে নেই!

…দ্বিজেনও চুপ করে দেখছে ব্যাপারটা।

রূপেন বলে—তুই কিছু বলবি না? তোর মতামত কি দ্বিজেন?

দ্বিজেন শোনায়—তার বোধহয় কোন দরকার নেই রূপু। তবে যে পথে চলেছিস সে পথ শান্তির নয়, গ্রামের মঙ্গল এতে কি হবে জানি না। এ তোর আগুন নিয়ে খেলা। বানে ডোবা আধমরা মানুষগুলোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিস।

চলে গেল দ্বিজেনও।

আটচালার আশপাশে গ্রামের লোকজন বয়স্কা মেয়েরাও এসে দাঁড়িয়েছে গোলমাল চীৎকার শুনে। আজ মনে হয় রূপেন একটা কঠিন পথেই পা দিয়েছে; নোতুন পথ। এপথে আর পিছোবার

উপায় নেই।

সন্তোষ-নিরু-শশী আর নামোপাড়ার অনেক অসহায় মুখগুলো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

—রূপুদা! আমাদের কি হবে এবার?

কে ডাকছে! রূপেনের খেয়াল হয়। রূপেন বলে।

—ওরা না থাক। আমরাই আমাদের মতে যারা আসবে তাদের নিয়েই এ কাজে নামবো। দেখিয়ে দেব ওদের, আমরাই ঠিক পথে চলেছি।

ব্রজদুলালবাবু দেখেছেন ব্যাপারটা। তিনিও কথাটা ভেবেছেন।

এই আগামী ঢল বন্যার চেয়েও প্রবল বেগে নামবে। আছড়ে পড়বে এতদিনের জীর্ণ জমি ব্যবস্থা—সামাজিক জীবনের উপর! তাকে ঠেকানো যাবে না। সেই পরিবর্তনের পূর্বাভাস এনেছে রূপেন, তাই এই সংঘাত!

ব্রজদুলালবাবু বলেন।

—আমি তোমাকে সমর্থন করি রূপেন। এছাড়া পথ আমিও দেখিনি। আজ দিন বদলেছে। নোতুন পথে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

রূপেন চাইল শান্ত ওই লোকটির দিকে।

ও যেন জীর্ণ সমাজের এই রূপটাকে দেখেছে, বন্যার ঢলে সব বাঁধ ভেঙ্গে যে সর্বনাশ আসে তার মাঝেই নোতুন ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। রূপেন নিজের কঠিন দায়িত্বকে যেন ওর আশ্বাসেই মাথায় তুলে নেবার ভরসা পায়।

মাধববাবু তার দুর্গাপুর কারখানা থেকে কোনরকমে সদরে এসে হাজির হয়েছে। পথঘাট ঠিক নেই, নদীর স্রোত নেমে এসে বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছে রাস্তায়, রাস্তারও চিহ্ন নেই। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ, মরা গরু বাছুরের বদগন্ধ ওঠে, আর মানুষের হাহাকারতো রয়েছেই।

রাশি রাশি মালপত্র চলেছে রিলিফ হিসাবে। পথঘাট ঠিক

করতে হবে। চারিদিকে অনেক কাজ। মাধববাবু জানে এবার তার ব্যবসাও জোর চলবে।

কিন্তু মাধববাবু এবার একটু অবাক হয় সদরে এসে।

এতকাল যে ভাবে যে পথে ঠিকাদারী করেছে হঠাৎ যেন নোতুন ইন্‌জিনিয়ার, এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইন্‌জিনিয়ার সাহেবরা সেই পথটাকে বদলে দিয়েছেন।

মিঃ সেন আগেকার রেকর্ড আর ঘরে টাঙ্গানো ম্যাপটা দেখে আগে থেকেই বোধহয় এগুলো ভেবে রেখেছেন। বলেন তিনি।

—আগে এই রাস্তা এই বাঁধের এই জায়গাগুলো আপনার করা ছিল?

মাধববাবু বলে—হ্যাঁ স্যার! আমি পুরোনো কনট্রাক্টর।

মিঃ সেন বলে ওঠেন—তাই আপনার কাজগুলো সবই ড্যামেজ হয়েছে আগে।

মাধববাবু চাইলো ওর দিকে।

মিঃ সেন বলেন—এবার কাজ কিছু করুন, কিন্তু আমার অর্ডার ফাইন্যাল ইনস্পেকশন নাহলে কোন বিল পেমেন্ট করা যাবেনা। কাজও হতে হবে আপ্ টু দি মার্ক! আপনারা কিছু বেশী টাকা বাঁচান—আর বিপদে পড়ে দেশের লোক!

মাধববাবু চুপ করে থাকে! তবু মুখ বুজে এই সর্তে কিছু কাজ নিয়ে এসেছে। লোকজন মেলা ভার, রাস্তার কাজও তাড়াতাড়ি সারতে হবে। নাহলে উল্‌টে কশান্ মানিই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

কাজ করে এবার পড়তা তেমন থাকবে না। তাছাড়া কর্তাদের মনমেজাজও ভালো নেই। ডি-এম সাহেবের বন্যাত্রাণ তহবিলেও হাজার পাঁচেক টাকা দিতে হয়েছে। সবদিক দিয়েই বিরক্ত হয়ে ফিরেছে মাধববাবু গ্রামে। দু একদিন পরই বের হতে হবে ওয়ার্ক সাইটগুলোয়। সেখানে এবার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাতে হবে।

কলবাড়িতে তবু একটা পার্টির ব্যবস্থা করেছে সে। কিছু কর্তাদের আমন্ত্রণ করে এনে কীর্তন শোনাবার ব্যবস্থা করে খাওয়া দাওয়া হবে।

আর সেই রাত্রে ধানকল থেকে পঞ্চাশ মণ চালও বন্যাত্রাণে দেবে মাধববাবু। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ডি-এম সাহেবকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে মাধববাবু।

…দাসজীকে কথাটা জানানো দরকার। তাই গোপালকেই পাঠিয়েছে সেখানে। সন্ধ্যা নামছে।

মাধববাবু স্নান সেরে এবার একটা বোতল নিয়ে বসেছে।

লাবণ্য দেখেছে সব। বলে সে—আবার ওসব নিয়ে বসলে?

মাধববাবু বলে ওঠে—ওই তোমার দোষ! যাও দিকি—কাজের কথা আছে, লোকজন আসবে এখন।

…রাধা কথাটা ভেবেছে। আজ বৈকালে আটচালায় মিটিং-এ গিয়ে সে অবাক হয়েছিল। দেখেছে আজ গ্রামের মানুষগুলো যেন পরিষ্কার ত্ব'দিকেই ভাগ হয়ে গেছে। রূপেনের কথাটা ভেবেছে রাধা। সামান্য জমিজায়গা যেটুকু ছিল তার কিছুটা গ্রাস করেছে দাসজী। ওদের মত লোকরা অন্যের ভালো চায় না।

বাকী জমি যা আছে তাতে নিজে চাষ করার সামর্থ্য নেই। বাবাও নেই বাড়িতে। আজ রাধাও কথাটা ভাবে।

ব্যাং বলে—রূপুদা ঠিক বলেছে গ! মানুষের মত মানুষ। তাকে দেখলা ওই শ্যালো চাঁধর ক্যামন হেনস্থা করলেক? বলে উঠবে নাই? তা তুমি থাকবা কেনে হে? হরে হন্মে লিতে পাবা না যে।

রাধা বলে—তাই ভাবছি আমাদের জমিও রূপুবাবুর সমবায়েই দেব!

ব্যাং মাথা নাড়ে—তা ভালো গ! উদের মত সব গিলে খাবেক নাই রূপদা!

রূপেন আজ দেখেছে কে তার সঙ্গে আছে, আর কে নেই।

তাই সে যেন পা ফেলার হিসাব করে এবার। কাগজপত্র পড়চা

মাপ সব মেপে বসে এবার তার হিসাবমত জমির মালিকদের অনুমতি পত্র নিয়ে বর্গাদারদের নিয়ে কাজে নামবে। সদরে গিয়ে সমবায় রেজেষ্ট্রির দরখাস্ত দিয়ে এসেছে তারা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তারাগুলো জ্বলে ওঠে।

শরৎ-এর শেষ হয়ে শীতের আমেজ নামছে। তখনও নদীর চরে কাশফুলগুলো জেগে আছে আবছা চাঁদের আলোয়।

রূপেন কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল।

—তুই!

রাধারাণী এগিয়ে আসে। আবছা আলোর আভাস পড়েছে ওর মুখে! রূপেন দেখছে রাধারাণীকে। প্রথম যৌবনের দেখা মেয়েটি আজ রূপ রসে যেন বর্তিটা হয়ে উঠেছে। কিন্তু রূপেনের মনে পড়ে সেই রাতের কথা। ও যেন দাসজীর টোপ গিলে চলেছে মাধববাবুর কলবাড়িতে কীর্তন নয় অন্য কিছুর পশরা নিয়ে।

রূপেন বলে—হঠাৎ এ সময়।

রাধারাণী জানায়—আমাদের জমিগুলোও তুমি সমবায়ে নাও।

অবাক হয় রূপেন ওর কথায়।

—সে কি রে? দাসজী তোদের আশ্রমে যায়, টাকাকড়ি দিয়েছে শুনলাম ঘর তুলতে। তার অমতে একাজ করবি?

রাধা রাগে না। ওর সুন্দর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। বেদনা-বিধুর সে হাসি।

রাধা বলে—অনেক কিছুই শুনবে। আর বিশ্বাস করতে মন চায়, করো। বলার কিছুই নাই। তবে জমিগুলোর জন্যে অনুমতিপত্তর দিতে হয় দিয়ে যাবো!

—তাহলে দাসজী, মাধববাবুরা কিন্তু খুশী হবে না!

রূপেনের কথায় রাধা জবাব দেয়—তাদের খাই না পরি? আমার মতেই আমি চলি। আর দাসজীদের জবাবও দিয়ে দেব এবার।

রূপেন দেখছে মেয়েটিকে। রাধারাণী বলে।

—যাই। একটা কথা বলবো রূপুদা ?

রূপেন ওর দিকে চাইল। রাধারাণী দেখেছে ধীরাকে, মেয়ে হয়ে মেয়েদের এই বেদনাটাকে চিনেছে সে। তাই রাধারাণী বলে।

—ধীরাদিকে এবার ঠাঁই দাও রূপুদা। জীবনে বাইরের দিকটাই সব লয় গো, মনের দিকও আছে। তোমার না থাক আর একজনের আছে। তরে কথা ভেবেও এবার ধীরাদিকে ডেকে নাও!

সেও লেখাপড়া জানে—তোমার পাশে দাঁড়াতে পারবে। আমাদের মত মুখ্যু ঢপওয়ালি তো নয়!

রূপেন দেখছে রাধাকে। এ কথা এমনিভাবে ভাবেনি রূপেন।

ধীরার কথা মনে পড়ে। হয়তো তার এই অসহায় অবস্থায় রূপেনেরও কোন কর্তব্য আছে।

ধীরা আজ এসেছিল রূপেনের কাছে। বৈকালে দেখেছে রূপেনকে। আজ ধীরার মনে হয় রূপেনের পাশে দাঁড়িয়ে সেও এই চ্যালেঞ্জটাকে তুলে নেবে।·· এই হবে তার পথ।

তাই এসেছিল সে, তার চিরন্তন নারীমন আজ আরও কিছু পেতে চায়। বাঁচার আশ্বাস চায় সে!

রাত্রি নেমেছে। রূপেনের ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। সামনে যেন সাপ দেখেছে সে! ঘরের একফালি আলোয় দেখা যায় ঢপওয়ালি ওই রাধারাণীকে। উদ্ধত যৌবনমদির দেহ—দুচোখে তার কি নেশা, ও যেন নিজের দেহের পশরা মেলে ধরেছে রূপেনের সামনে। মুখে চোখে হাসির আভাষ। রূপেনও তার দিকে বিমুগ্ধ চাহনিতে চেয়ে আছে।

ধীরা চমকে ওঠে।

ওই মেয়েটার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। রূপেনের কাছে বার বার কি আশা নিয়ে এসেছিল ধীরা, কিন্তু সেই আবেদনে কান দেয় নি রূপেন। ধীরা বার বার শূন্য হাতে ফিরে গেছে। আজ কাকীমার বিরক্তির কারণটাও জেনেছে ধীরা।

ওই স্বৈরিনী মেয়েটাই গ্রাস করেছে রূপেনকে! ধীরার পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যায়। আজ বুঝেছে ধীরা রূপেনের জন্য মিথ্যাই স্বপ্ন দেখেছে সে, আজ সেই স্বপ্ন সব তার হারিয়ে গেছে। কি দুঃসহ বেদনায় ধীরার দুচোখ বেয়ে জল নামে!

রাধারাণী চলে যাচ্ছে ওদিকের পথ ধরে। রূপেনও বাইরে এসেছে। প্রথম শীতের হিম হিম কুয়াশায় ওদিকে কাকে দেখে চাইল রূপেন।

ধীরা!

রূপেন যেন ওর কথাই ভাবছিল। রাধারাণীও বলেছে সেই কথাটা। রূপেনের মনে পড়ে মায়ের কথাগুলো, আজও ধীরা এত বিপদের মাঝে তার জন্যেই প্রতীক্ষা করে আছে। রূপেন আজ এগিয়ে যায়!

—ধীরা!

ধীরাকে মনের সব সুর, সব স্বপ্ন মুছে গেছে।

সে এগিয়ে চলেছে। আজ আর এখানে তার কোন চাওয়া নেই।

কি দুঃসহ বেদনা নিয়ে ধীরা হারিয়ে গেল।

রূপেনের ডাকে আজ আর কোন সাড়া দেবার মত মানসিক অবস্থা তার নেই। আজ সে রূপেনকে ঘৃণা করে।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রূপেন।

প্রতিমা দেবীও বের হয়ে এসেছে। শুধোয় সে

—ধীরা এসেছিল নাকি রে? এ সময়! কোন বিপদ আপদ হয়নি তো?

রূপেন বলে—কে জানে? ডাকলাম—সাড়া না দিয়েই চলে গেল ফিরে গেল সে।

প্রতিমা ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরা চলে গেছে।

রূপেন ওর এইভাবে চলে যাবার কোন কারণই খুঁজে পায় না। চুপ করে ঘরে এসে কাগজপত্র তুলে রাখতে থাকে।

তারাজ্বলা পথ দিয়ে চলেছে রাধারাণী সামনের ওই প্রাসাদের দিকে।

মাধববাবুর চোখে তখন গোলাবী নেশার আমেজ, গোপাল-গুপীও এসে বসেছে মেজেতে! দাসজী একটা টুলে বসে তখনও বৈকালের ঘটনাটার বর্ণনা দিয়ে চলেছে। রূপেনের নোতুন মতলবের কথাটা বেশ রং দিয়ে বলে চলেছে দাসজী।

—বর্গাদার-এর নাম বসানো চলবেই। তায় গোদের উপর বিষফোঁড়া। ওই বর্গাদার আর মালিকদের জমি নিয়ে একত্তর করে সমবায় সমিতি করা হচ্ছে। আমাকেও বলে আপনাদের আসতে হবে এই সমবায়ে।

মাধববাবুর মন মেজাজ ভালো নেই। সদরে-বাইরে ঘুরে দেখেছে এতকাল যে ভাবে সিংহভাগ গ্রাস করেছে কাজের নামে তা চলবেনা। সরকারী মহল মায় দেশের সাধারণ মানুষও এবার সেই শোষণ-এর বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে।

তারই যেন প্রকাশ ঘটেছে এখানেও। আর তাতে চোট-খাওয়া বাঘের মত শুধু গর্জেছে মাধববাবু।

দাসজীর কথায় বলে—ওদের জুলুম এ সব! আমার খাস হালের জমি নিজে চাষ করবো। তাকে কেড়ে নেবার মত কোন আইনই নেই। রূপেনরা কি ভেবেছে!

নবীন ভটচায বলে—তাই বলতে গেলাম, তা আমার ভাগচাষী এখন বর্গাদারী পেয়ে বলে তুমি না যাও, আমিও জমির মালিক হে, আমি যাবো উদের সমবায়ে। আমি কেউ লই?

এককড়ি পালও সঙ্গতিপন্ন চাষী। তার নিজের হাল-এর চাষের বাইরেও কিছু জমি ভাগচাষীরা করে। এককড়ি বলে—এখন লোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলছে ছোট হুজুর। শুনেছি বড়বাবুও ওদের দলে। তিনিও জমিজায়গা দিচ্ছেন সমবায়ে।

দাসজী এর মধ্যে একটা কাজ করে ফেলেছে। এতদিন কাউকে

জানায় নি। কেশব মিত্তির মারা যাবার পর তার ছেলে গোবিন্দ দুর্গাপুরে চাকরী করে। স্ত্রীও সেখানেই কোন স্কুলের মিসট্রেস। দুদিনের জন্য গ্রামে এসেছিল গোবিন্দ। ধীরাকে ও নিয়ে যায় নি, বরং স্ত্রীর পরামর্শে গোপনে ওই শ্রীধর দাসকে তাদের বেশ কিছু জমি বিক্রীকওলা করে কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

দাসজী যেন তুরুপের তাস হাতে করে বসে আছে।

মাধববাবু বলে—ওরা যা করছে করুক। আমাদের খাস হালের জমিতে এলে এবার ঠাণ্ডা করে দেব দাসজী। আমার ধানকলের দারোয়ানদেরও বলা আছে! আপনারা নিজের জমিতে যে যেমন পারেন বালি তুলে চাষ করুন, তারপর দেখা যাক কি হয়। আর দ্বিজেনকে দেখা করতে বলুন। দরকার হয় তাকে দিয়েই আমরাও ওই রকম সমিতি ফমিতি গড়বো।

দাসজী নির্ভয় হয়েছে। নবীন ভটচায বলে—তাহলে খুব ভালো হয়!

—আপনার আশ্রয়েই আছি ছোটবাবু, যা হয় একটা বিহিত করেন। ধূর্ত এককড়ি এর মধ্যে ছোটবাবুর পায়ে হাত দিয়ে পদধূলি নিয়ে মুখে বুকে ঠেকিয়েছে পরম ভক্তিভরে। দাসজীও দ্বিজেনকে সামনে রেখে একটা কিছু করার মতটাকে সমর্থন করে। বলে সে—ঠিক বলেছেন ছোটবাবু। দ্বিজেনই পারবে এসব!

হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনে চাইল। চমকে ওঠে মাধববাবু। রাধাকে এখানে আসতে দেখে অবাক হয় সে, খুশিও হয়েছে মনে মনে। তবু মাধববাবু বলে—এসব মেয়েছেলের ব্যাপারটা এখানে নয় কলবাড়িতেই চলে। দাসজীও খুশি হয়। সে যে মেয়েটার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেনি এটা ছোটবাবুও বুঝেছে। দাসজীই আপ্যায়নের সুরে বলে—আয়। ভেতরে আয়! বোস!

মাধববাবু দেখছে মেয়েটাকে!

আবছা আলোয় ওর নিটোল দেহে যেন জোয়ার উপছে ওঠে।

ডাগর দুচোখের চাহনিতে নেশা লাগে। সরু কোমর, উন্নত বুক, নিটোল নিতম্ব মাধববাবুর নেশালাগা চোখে কি সাড়া আনে।

মাধববাবু বুঝেছে গ্রামের জমি জায়গাই নয়, আরও অনেক সম্পদই সে ছিনিয়ে নেবে এবার। মাধববাবু বলে

—তাহলে এই শনিবার রাত্রে আসছিস কলবাড়িতে, বেশ ভাব নিয়ে গাইবি—নামীদামী লোকজন আসবেন।

দাসজী বলে—আখের খুলে যাবে তোর। যা রূপের চটক তাতে গানের ভাব মিশলে—

ব্যাপারটা মনে মনে কল্পনা করে যেন ওর জিব দিয়ে জল ঝরে। এমন সময় রাধা খুঁট থেকে সেই দলা পাকানো নোটগুলো বের করে মাধববাবুর সামনে নামিয়ে দিয়ে বলে—অপরাধ নেবেন না ছোট কত্তা, শুক্রবার থেকে আমি একটানা তিনদিনের বায়না পেয়েছি বর্ধমানে!

বাবা খবর দিয়েছে আজ সকালে। ওখানে বাঁধা আসরে যেতেই হবে গো, তাই উদিন তোমাদের উখানে আসা হবে না। ট্যাকাটা ফেরত দে গেলাম।

সারা ঘরখানায় স্তব্ধতা নামে। মাধববাবু ওর দিয়ে চেয়ে শূন্য গ্লাসটা নামিয়ে কঠিনস্বরে বলে—তাহলে আসবি না আমাদের ওখানে?

রাধা জানতো এর পরে ব্যাপারের জেরটা চলবে। তবু আজ সে কঠিন, স্পষ্ট ভাবে জানায়—বল্লামতো বাবু, বাবা আগাম কথা দে ফেলেছে। বাইরের নামী আসর—যেতেই হবে গো। চলি দাসজী মশায়, পেন্নাম হই ছোটবাবু!

মেয়েটা টাকাটা ফেরত দিয়ে বেশ সতেজ ভঙ্গীতে বের হয়ে গেল। মাধববাবুর সারা শরীর রাগে অপমানে কাঁপছে। গোলাবী নেশাটা ছুটে গেছে। মুখটা সিন্দুর বরণ হয়ে ওঠে। দাসজীও বুঝেছে ব্যাপারটা। মুখের গ্রাস হারিয়ে গেছে তার, শিকারী বাঘের সামনে থেকে শিকার চলে গেলে বোধহয় তারা এমনি রাগে গরগর করে।

দাসজী বলে—সাহস দেখ্লেন ছুঁড়িটার? এঁ্যা—মুখের ওপর বায়নার টাকা ফেরত দিয়ে গেল।

নবীন বলে ওঠে—হুকনি গাইতে পারিস তাই এত ডাঁট! যুবরাজপুরের পটল ঢপওয়ালীকেই বলে দিই ছোটবাবু। খাসা গাইছে আজকাল আর তেমনি ভাব, যেন শ্রীরাধিকেই মান ভঞ্জনে বসেছে।

এককড়িও সায় দেয়—দেখতেও তেমনি গো, বেশ ডব্‌কা।

মাধববাবুর জ্বালাটা অন্যখা ন। এসব তার ভালো লাগে না। ওই মেয়েটা এসে তাকে অপমানই করে গেল। চারিদিক থেকে যেন অদৃশ্য কতকগুলো শক্ত হাত তাদের এতদিনের মৌরসী মোক্‌বারী পাট্টায় দখলকরা জমি-প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সবকিছুকে ছিনিয়ে নিতে চায় ঘরে বাইরে। তারই প্রতিবাদ করবে এবার।

মাধববাবু বলে—ওসব কথা থাক এককড়ি! কীর্তনে দরকার নাই। তোমরা এখন যাও—রাত হয়েছে। যা বল্লাম তাই করোগে! আর দাসজী কাল সকালেই দ্বিজকে নিয়ে আসবে। দাসজী ছোটবাবুর চাপা রাগটাকে আরও উস্‌কে দেবার জন্য বলে

এসবের মূলে ওই রূপেন সন্তোষের দল! আর ছোটবাবু—মেয়েটা ওদের দুজনকেই নাচাচ্ছে। তাহলে আজ চলি ছাটবাবু। কাল সকালে দেখা হবে। প্রাতঃপ্রণাম।

প্রণামটা আগামই সেরে রাখে সে। আর দাসজীও এবার তৈরী হয়েছে। মাধববাবুকে সামনে রেখে এবার ওই দ্বিজেনকে নিয়ে গ্রামের ছেলেদের মধ্যেও বিভেদ-এর ব্যাপারটাকে বড় করে তুলবে।

রূপেনের প্রাধান্যকে ছেঁটে ফেলতেই হবে। আর ওই উট্‌কো সন্তোষকেও সে দেখে নেবে। আজই মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেতো কলগাড়িতে কিন্তু নেহাৎ দয়া করেই সেটা করে নি। ভবিষ্যৎএ দরকার হলে তাই করবে।

ধীরা অনেক ভেবেছে। এতকাল যে স্বপ্নটাকে আঁকড়ে ধরে এখানে পড়েছিল, আজ নিজের চোখেই দেখেছে সেটা মিথ্যা। কোন

সত্তা নেই। আজ হারিয়ে গেছে তার সবকিছু। লজ্জায়-রাগে অপমানে ধীরা আজ যেন ফেটে পড়তে চায়!

দ্বিজেন দুর্গাপুরে দু'একটা চাকরীর চেষ্টা করেছিল, এছাড়া মাধববাবুর ব্যাপারটা এখনও রয়েছে। দ্বিজেন তাই হীরার আশা এখনও ছাড়ে নি। আর রূপেনের সঙ্গে হীরার ঘনিষ্ঠতায় দ্বিজেন যেন নীতিগতভাবে রূপেনকে সহ্য করতে পারে না।

দাসজী মশায়-এর গদিতে বসেই কথাগুলো হচ্ছিল। দ্বিজেনও দেখেছে সেদিন গ্রামের আটচালার মিটিংএ রূপেন নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার মত সাহস পেয়েছে, দ্বিজেনের কোন ঠাঁই সেখানে নেই!

দাসজী বলে—ও যেন ধাপে ধাপে এগোচ্ছে দ্বিজভাই। কেন? গ্রামে কি মানুষ নেই? আমরাও ওসব বুঝি! দরকার হয় আমরাও সমবায় করবো।

দ্বিজেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না।

বাকীটা মাধববাবুই পরিষ্কার করে দেয়।

—ওদের সমবায়ের পাশাপাশি আমরা চাষ করবো। যে ভাবে হোক ওই সমবায় যে রূপেনের একটা ধাপ্পা—লোক ঠকানোর মতলব সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে। দরকার হয় অন্যপথও নেব। এসবের ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে।

দ্বিজেন চুপ করে শুনছে কথাগুলো। একটা প্রকাশ্য লড়াই-এর ময়দানে যেন দুপক্ষ তাঁবু ফেলেছে। দ্বিজেন আজ নিজের স্বার্থই গুছিয়ে নিতে চায়। বসে সে।

—দিনকতক গ্রামের বাইরে থেকে ওদের দৌড়টা দেখতে চাই তারপর দরকার মত পথ নেওয়া যাবে।

মাধববাবুও ভাবছে কথাটা। ওদের পথগুলো দেখা দরকার। তাছাড়া নিজেরও কাজ আছে। দুর্গাপুর ছাড়াও ঠিকেদারীর বিভিন্ন কাজে এখন থেকে নিজের বিশ্বাসী লোক দিয়ে দেখাশোনা করার

দরকার। তাই দ্বিজেনের কথায় বলে।

—দুর্গাপুরেই গিয়ে থাকোগে, এই মাস থেকেই। পরে যা করার দরকার বলবো।

খুশী মনে দ্বিজেন ফিরছে। শরতের শেষ রোদ এবার জ্বালা করা ভাবটাকে হারিয়ে হিম হিম হয়ে আসছে। মাঠে বালির বিস্তীর্ণ চরে ঘুরছে রূপেন-নিরু ঘোষ-সন্তোষ। আমিন এনে ওদের এদিকটায় মাপ জোপ করে জমির নিশানা বের করছে, এরপর আসবে বুলডোজার। রূপেন এর মধ্যে সদরে গিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরে এগ্রিকালচার অফিসারকে বলে কয়ে বুলডোজারের ব্যবস্থা করেছে। ওটাকে এমাঠে নামিয়ে কয়েকদিন কাজ করাতে পারলেই বালি তুলে মাটি বের করে নিজেরা চাষ শুরু করতে পারবে।

রূপেন দ্বিজুকে দেখে চাইল। রূপেন জেনেছে এর মধ্যে দ্বিজেন শ্রীধর দাস মাধববাবুদের সঙ্গে ভিড়েছে, গোপনে পরামর্শও হচ্ছে। রূপেন তবু ওকে দেখে এগিয়ে যায়। বটগাছটার নীচে ছায়াঘন একটু পরিবেশ। চারিদিকের রুক্ষতার মাঝে ওই ঠাণ্ডা জায়গাতে দাঁড়িয়ে রূপেন দ্বিজুকে বলে—তুই সঙ্গে আয় দ্বিজু। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সত্যিকার বড় কিছু গড়ে ওঠে। ভুল যদি থাকে এই পথে তাও দেখিয়ে দে! তবু বলবো ওদের দলে মিশে বাধার সৃষ্টি করিস নে!

• দ্বিজু দেখছে রূপেনকে! এই কাজের জন্য রূপেন দিনরাত চেষ্টা করছে। কিন্তু কি পাবে সে? হয়তো তার জনপ্রিয়তার জন্য এম-এল-এ হবার চেষ্টাই করবে। দ্বিজুর পিছনে তার চেয়ে অনেক বড় শক্তি আছে। দ্বিজু হিসাব করে চলতে চায়।

প্রকাশ্যে দ্বিজু বলে—বাধা কেন দেব। তোর সঙ্গেই আছি রূপেন!

রূপেন বলে—তোকেও কাজে নামতে হবে রে। একা কতদিক সামলাবো? সমবায় রেজেস্ট্রী করিয়েছি। এবার ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে একটা ছোট টিলার পাম্প কিনতে হবে। ক'টা মাস কষ্ট হবে। বোরো ধান-এর চাষ করবো। একট ফসল উঠলে তবু এরা খেতে

পাবে।

—ছ্যাখ চেষ্টা করে।

দ্বিজ্ কোন রকমে বের হয়ে এল! মনে মনে আজ দ্বিজেন রূপেনের ওই স্বপ্নকে ব্যর্থ করার শপথই নিয়েছে। তবু মুখে সে কথা জানাতে চায় না।

সন্তোষকে দেখছে দ্বিজ্। সন্তোষ-এর কথাগুলো কানে আসে। রূপেন ওদিকে যেতে সন্তোষ বলে—ওর কাছে সবকথা না বলাই ভালো রুপুদা। ওকে ঠিক ভরসা করা যায় না।

আলপথ দিয়ে চলেছিল দ্বিজেন বাড়ির দিকে। সন্তোষের কথাটা শুনে সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে। ওই ছেলেটার কাছে যেন দ্বিজেনের মনের অতলের সব পাপটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। দ্বিজেনও তত কঠিন আঘাত হানার জন্য তৈরী হয়।

বেলা পড়ে আসছে। দ্বিজেনের মনে কোথায় যেন একটা শূন্যতা জাগে। চারিদিকে চলেছে ওই জমিগুলোকে ঘিরে কি কর্মব্যস্ততা। সারা গ্রামের কিছু মানুষের মনে সাড়া জেগেছে। দ্বিজেন সেই কর্মকাণ্ডের কেউ নয়। যেন সাবধানী নজর রেখে চলেছে কোন দুর্বলতম মুহূর্তে সে চরম আঘাত দিয়ে ওদের সাজানো স্বপ্নরাজ্যকে চুরমার করে দেবে।

দুর্গাপুরেই চলে যাবে সে এখান থেকে

হঠাৎ ধীরাকে দেখে চাইল।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে, আবছা আলো আঁধার ঘনিয়ে আসে আকাশে, গ্রামের পথে পথে। ধ্বংসপুরীতে এখানে ওখানে ঝুপড়ি বেঁধে মানুষগুলো টোন যাযাবরের মত যেন আস্তানা ফেলেছে।

তবু স্বপ্ন দেখে আগামী ভবিষ্যৎ-এর।

রূপেন সন্তোষরাও সেই ভবিষ্যৎ-এর হিসাব নিকাশ করছে। দ্বিজেন ঘরে ধীরাকে ঢুকতে দেখে চাইল। অবাক হয়েছে সে।

—তুমি!

ধীরা দেখছে দ্বিজেনকে। দু'দিনেই মেয়েটার দেহ মনের উপর ঝড় বয়ে গেছে। ধীরার সারা মনে আজ দুঃসহ জ্বালা। সামনে কোন পথ তার নেই। রূপেনের কাছে গেছল অনেক আশা নিয়ে, কিন্তু সেই আশা কোথায় হারিয়ে গেছে। প্রত্যাখ্যানের বেদনায় অপমানে ধীরা আজ চোট-খাওয়া সাপের মত ফুঁসছে।

—বসো! দ্বিজেন দেখছে ধীরাকে।

ধীরা বলে—দুর্গাপুরে চাকরীর কথা বলেছিলে, সেটা করে দিতে পারো?

দ্বিজেনের মনে একটা সরীসৃপ যেন ধীরে ধীরে মাথা তুলছে, ওর দেহটায় বাতাসের স্পর্শ মাখা কাঠিন্য জাগে। মাথা তুলছে একটা লোভী সত্তা, যে অনেক কিছুই পেতে চায়, তার জন্য যে কোন পথই নিতে প্রস্তুত সে। তবু দ্বিজেন বলে।

—কিন্তু এখান থেকে চলে যেতে হবে, জানোই তো নানা কথা উঠবে! আর ফেরার পথ নাও থাকতে পারে।

ধীরা কি অভিমান ভরে বলে—কি আছে এখানে যে ফিরতে হবে? কয়েক বিঘে জমি তাও বালিতে ঢাকা, আর ওই ভিটে পুরী! এসবের কোন দামই নেই। তাহলে আমাকে এ ভাবে বাঁচার পথ খুঁজতে হতো না। পারো না তুমি সেই পথ দেখাতে?

দ্বিজেন দেখছে ধীরাকে। একফালি আলোয় ধীরার কোমল মুখে কি কাঠিন্য ফুটে ওঠে। দ্বিজেনের সারা মনে কি ব্যাকুলতা জাগে।

—ধীরা! চাকরীর ব্যবস্থা হয়ে যাবে? তুমি যাবে?

ধীরা চাইল ওর দিকে! আজ যেন ধীরা অনেক পথ পার হয়ে একটা আশ্রয়ের সন্ধান পায়। ধীরা বলে।

—আজ আমার কোন বাধাই নেই। আমি সবকিছুর জন্য তৈরী দ্বিজু! যে ভাবে হোক বাঁচতে আমাকে হবে। এই অপমান অবহেলা সহ্য করে নয়, আমিও নিজের পরিচয়ে বাঁচতে চাই।

দ্বিজেনের হাতে ধীরার হাতটা। ওই স্পর্শটুকু দ্বিজেন সারা মন দিয়ে

অনুভব করতে চায়। রাত্রি নামে—ঝকঝকে আকাশের তারাগুলো জ্বলছে।

ভোরের শুকতারা সেদিনও ওঠে আকাশের সীমান্তে নদীর ধারে আমবাগানে চিরোল গাছের মাথায়। ভোরের প্রথম বাসটা কুয়াশার মাঝে হেডলাইট জেলে এসে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে।

তখন গ্রাম বসতের মানুষের ঘুম ভাঙ্গে নি। ওই কুয়াশার চাদর মোড়া গ্রামের দিক থেকে দুটি ছায়ামূর্তি এসে উঠলো বাসে। ঘণ্টা বাজিয়ে বাসটা চলেছে অজয়ের ব্রিজের দিকে। ভোরের পাখীর কলরব ওঠে শালবনে। শিশিরমাখা ভিজে বনভূমি পার হয়ে বাসটা চলেছে জি-টি রোডের দিকে।

ধীরা গ্রাম থেকে এর আগে এভাবে বের হয় নি। পিছনে পড়ে রইল তার এত দিনের জগৎ, সব ছেড়ে আজ চরম দুঃসাহসীর মত চলেছে মেয়েটা নোতুন এক জগতের সন্ধানে। এতদিনের সেই গ্রাম তাকে শূন্য হাতে বিদায় দিয়েছে। বন্যা তার সব কেড়ে নিয়ে আজ পথেই ঠেলে দিয়েছে।

—ধীরা! ধীরা বাইরের দিকে চেয়েছিল। শাল ইউক্যালিপটাসের পাতা চুঁইয়ে বিন্দু বিন্দু শিশির ঝরছে লাল মাটিতে, বাতাসে শাল ফুলের উদাস করা সুবাস ওঠে। কোথায় পিছনে হারিয়ে গেছে তার এতদিনের গ্রাম। সেই পরিচয়, সবকিছু!

দ্বিজেনের ডাকে চাইল ধীরা। দ্বিজেন শুধোয়—কি ভাবছো?

ধীরার মনে অনেক ভয় অনেক ভাবনা এবার ভিড় করে আসে। জানেনা সে কি জবাব দেবে। মনে হয় সামনে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

তবু গ্রামের কথা মনে পড়ে। সেই এতকালের বাড়িটা—রূপেনের কথা। কেন জানেনা ধীরার মনে হয় একটা ভুলই করেছে সে। কিন্তু আর ফেরার পথ নেই।

ধীরা দ্বিজেনের কথায় বলে—কই না তো।

দ্বিজেন বলে—আর এসে গেছি দুর্গাপুর।

দূর দিগন্তে দেখা যায় পাংশু পিঙ্গল ধূলি ধূসর মেঘ-এর দল, কালচে একটা দাগ নির্মল আকাশকে কি কালিমায় ভরে তুলেছে। দুর্গাপুরের আকাশ বাতাসে সেই কালোর দাগ, ধীরাও সেখানে আসছে।

গ্রামে কদম বুড়িই খবরটা আগে পায়, সকালে মিত্তির বাড়ির কুলদেবতাকে প্রণাম করতে যায় বুড়ি। নবীন ভটচায এখন ওখানের সেবাইত। মাঠের এদিক ওদিকে ছড়ানো শিব মন্দিরের অনেকগুলোই বানের তোড়ে ভেঙ্গে গেছে, কোথায় শিবলিঙ্গও ফেরার, না হয় বালি চাপা পড়ে দেবতা অন্তর্ধান করেছে। তাই নবীন ভটচায এখন মিত্তিরদের এই ঠাকুরের ভার নিয়েছে, অবশ্য কয়েক বিঘা জমিও পেয়েছে।

কদম ঠাকরুণ হাঁক পাড়ে—সে ছুঁড়ি কই লা? অ মানদা—

মানদা বুড়িই ব্যাপারটা জানায়—ডানা গজালো মেয়ের, দুর্গাপুরে চাকরী করতে গেছে। বলে ইখানে থাকবো নাই।

কদম বুড়ি যেন রসালো কিছু খোরাক পায়—দুর্গাপুরে গেল তা একা না আর কেউ ছেল র‍্যা?

খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এমন মুখরোচক খবর চাপা থাকে না। ধীরা চলে গেছে আর দ্বিজেনকেও পাওয়া যাচ্ছে না। সেই নাকি ধীরার চাকরীর ব্যবস্থা করে তাকে এখান থেকে নিয়ে গেছে।

প্রতিমা কথাটা শুনে অবাক হয়। ভবতোষবাবু খবরের কাগজটা পড়ছেন। কলকাতার খবরগুলো তখনও পুরনো হয় নি।

প্রতিমার হাঁকডাকে চাইলেন—কি বলছো?

প্রতিমা কথাটা জানাতে তিনিও অবাক হন—ধীরা এমনি করে চলে গেল? বেচারা—

প্রতিমার চাপা রাগটা ফেটে পড়ে! জানে সে ধীরা কেন রূপেনের কাছে এসেছিল, আর ধীরার এই ভাবে চলে যাওয়ায় সেই ব্যর্থ অভিমানটাই বড় হয়ে ওঠে! রূপেন বের হচ্ছিল সদরে। তার সামনে অনেক কাজ।

এবার মাঠে বুলডোজার নামবে। বালি তোলার কাজ শুরু হয়েছে। পাম্প বসাতে হবে। বীজধান সার এর দরকার। এদিকে এর আগে বোরো জয়া পদ্মা জাতের জলদি ধানের চাষ শুরু হয় নি, উচ্চ ফলনশীল ধান-এর চাষ দিয়েই তারা শুরু করবে।

মায়ের কথাগুলো শুনে একটু অবাক হয় রূপেন। ধীরা চলে গেল এ ভাবে?

দ্বিজেন যে এমনি একটা কিছু করবে তা ভাবতে পারেনি রূপেন। মনে হয় দ্বিজেন এবার তাদের উপর নানা ভাবেই আঘাত হানবে, আর তার জন্যে উৎসাহ সাহায্য যোগাবে ওই শ্রীধর দাস মাধববাবুর দল।

খবরটা নীরু আনে।

মাঠের সীমানা দাবী করা হচ্ছে। নীরু বলে—দ্বিজুকে ও ধীরাদিকে চাকরী দিয়েছে মাধববাবু। পিতমের ভাইপোকেও বলেছে।

অর্থাৎ নানাভাবে তাদের এই কর্মকাণ্ডে বাধার সৃষ্টিই করবে এরা।

রূপেন বলে—যে চায় তাকে চলে যেতে দে নীরু। আজ পথ দেখে নেবার দিন এসেছে। দেখবি ক্রমশঃ এই পথের নিশানা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন পথ চলা সহজই হবে রে।

তবু রূপেন ভুলতে পারে না ধীরার কথা।

বাঁধ এর উপর দিয়ে চলেছে, সদরে যাবে বাস ধরতে। ভজনদাসের আশ্রমের সামনে হঠাৎ গুপী-গিরিধারীদের দেখে দাঁড়ালো। গিরিধারী দাসজীর অনুগত লোক। গিরিধারী জানায়

—গরু বের হলেই খোয়াড়ে দিব হ্যাঁ। দাসজীর হুকুম। এসব এলাকা দাসজীর, তোদের গরু চরাবার জায়গা নয়।

ব্যাং চুপ করে ওর ধমক শুনছে। রূপেন বলে ওঠে।

—মাঠে কোন ফসল আছে গিরিধারী যে গরু খোঁয়াড়ে দেবে? সবতো ধূ ধূ বালুচর!

গিরিধারী রূপেনকে দেখে একটু থেমে যায়। রাধাই বের হয়ে এসেছে। সে বলে—রাগে জ্বলছে যে দাসজী। ওর ছোটবাবুর আসরে গান গাইতে যাবো না, বায়নার টাকা ফেরত দিয়েছি, তাই গোঁসা হয়েছে।

গিরিধারী বেগতিক দেখে সরে গেছে। রূপেন রাধার কথায় অবাক হয়।

রূপেন বলে—সে কি ওদের কলবাড়ির বায়না ফেরত দিলে? ছোটবাবুর কথাও রাখলেনা? তোমার সাহস তো কম নয় রাধা?

রাধা বলে—গান শুনবে ওই ওরা? রাধা ওখানে গান গায় না। তাতে যা হবার হোক। আমি ডরাই না গ!

রূপেন দেখছে ওই তেজস্বিনী মেয়েটিকে।

ও জীবনের যে আবিলতার মাঝে রুখে দাঁড়াতে পেরেছে ধীরা সেই লোভ আর দুর্বলতার মাঝে নিজেকে যেন বিক্রী করে দিয়েছে।

ধীরা রুখে দাঁড়াতে পারেনি।

রূপেন যেন আজ ওই রাধাকে কি এক নোতুন চোখে দেখে।

বেলা হয়ে আসছে। সদরে তার অনেক কাজ!

রূপেন বলে—একটু সাবধানে থেকো। চলি!

রাধাও জানে ওই লোভী মানুষগুলোর মুখের উপর জবাব দিলে তারা ক্ষেপে ওঠে। সে যেন আজ ওদের পরোয়া করেনা। বলে সে—ধীরাদির মত নরম মাটি আমাকে ভেবো না রূপুদা। আমি তো চপওয়ালি, অমন মরদদেরও নাচাতে পারি। আমার মান ইজ্জতের কি দাম বলো?

ওর কথায় কি যেন একটা ব্যর্থতার সুর ফুটে ওঠে। সেটা রূপেনের নজর এড়ায় না। পায়ে পায়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায় সে। বাসের সময় হয়ে গেছে।

মাধববাবুও এসেছে সদরে। এর মধ্যে নানা ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করে বেশ কিছু জরুরী রাস্তা বানানোর কনট্রাক্ট বের করে কাজে নেমেছে। রাস্তা ভেঙ্গে গেছে, বালি ঠেলে রাস্তা বের করতে হবে, তাই বুলডোজারের দরকার। কম খরচে তাড়াতাড়ি কাজ করানো যাবে। তাই মাধববাবু চেষ্টা চরিত্র করে বুলডোজার বের করার অর্ডার নিতে এসেছে। অনেক টাকার কাজ, শেষ করতে পারলে টাকাটা হাতে আসবে আর বুলডোজার পেলে কম খর্চায় সে কাজ শেষ করা যাবে। দরকার হয় কিছু প্রণামীও দেবে সে এই সুবিধা পাবার জন্য। কিন্তু এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সেন বলেন।

—বুলডোজার এখন পাবেন না মাধববাবু, আমার হাত নেই। ডি-এম সাহেব নিজে রিকুইজিসন করেছেন।

মাধববাবু অবাক হয়—সেকি স্যার। অন্যদিকের ব্যবস্থা করবো, আপনি পাঁচ সাত দিনের জন্য আমাকে দেন। রাস্তাগুলো সেরে ফেলি।

ইন্‌জিনিয়ার বলেন—ওসব ম্যানুয়েল লেবার দিয়ে করান। বেশী লোকেও কাজ পাবে, রাস্তাও হবে। রেট তো ম্যানুয়েল লেবারের জন্য বেশীই দেওয়া আছে।

মাধববাবু হিসেবী ব্যক্তি। সে জানে তাতে খরচ বাড়বে অনেক। দিয়ে থুয়ে লাভও তত বেশী থাকবে না। তাই বলে

—এতে তাড়াতাড়ি কাজ হবে স্যার, আমি আপনাদের খুশী করবো অবশ্যি!

হাসেন ইন্‌জিনিয়ার সাহেব বলেন

—আপনাদের গ্রামের দিকেই বুলডোজার ট্রাকটার পাঠানো হচ্ছে, সেখানের লোকজন এসে ধরেছে ডি-এম সাহেবকে। এ তাঁরই অর্ডার। ওখানেই যাবে ওসব আগে। আপনার জন্য কিছু করতে পারছি না।

অবাক হয় মাধববাবু—আমার গ্রামের লোকজন এসেছিল?

—ওই তো ভিড় দেখছেন না! ডি এম সাহেবকে ওরা এসে ধরেছে।

ইন্‌জিনিয়ার সাহেবের অপিসের জানলা দিয়ে মাধববাবু চেনামুখের ভিড় দেখে একটু ভাবনায় পড়ে। তার অঞ্চলের লোকদের এনেছে রূপেন, কদম ঠাকরুণকেও দেখা যায়। বুড়ির সাদা চুল উড়ছে শন নুড়ির মত। নীরু ঘোষ-শীতল আশপাশের গ্রামের অনেকেই রয়েছে। ওদের মুখে ফুটে উঠেছে জয়ের হাসি। সন্তোষও রয়েছে। সে যেন জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

মাধববাবু গুম হয়ে দেখছে। আজ তাদের বাদ দিয়েই ওরা এসেছে এখানে আর তার হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে ওই বুলডোজার বের করে নিয়ে গেল, হাজার হাজার টাকা লোকসান হয়ে গেল ওদের জন্য।

মাধববাবুর মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। চুপ করে বের হয়ে গেল নিজের জিপটার দিকে। দূরে কোথায় মফঃস্বলের ওয়ার্ক সাইটে তাকে ফিরতে হবে। রূপেন-সন্তোষ-এর দৃপ্ত মুখগুলো মনে পড়ে।

ওই সন্তোষ ছেলেটাই এসব পরামর্শ দিয়ে ওদের আন্দোলন করাতে নিয়ে এসেছিল এখানে। এর জবাব দেবেই মাধববাবু। ওদের নজর এড়িয়ে অন্যপথে জিপ নিয়ে বের হয়ে গেল সে।

সারা গ্রামের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এসেছে নোতুন প্রাণের সাড়া। লোকজন ছেলেমেয়ে বৌঝিরাও বের হয়ে এসেছে। বুলডোজারের কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ ওঠে বাতাসে।

ড্রাইভার কদম ঠাকরুণকে তুলে নিয়েছে সিটে, বলে,

—চলো দিদিমা।

কদম ঠাকরুণও খুশীতে বাচ্চামেয়ের মত চীৎকার করছে। আর বালির পাহাড় ঠেলে নিয়ে চলেছে বুলডোজারের প্লেটটা। ঠেলে ঠেলে বালিগুলোকে নদীর হানা মুখের খাদে ফেলছে। পেছনে এতদিনের চাপাপড়া সরস মাটি বের হচ্ছে, মিষ্টি সোঁদা ভিজে ভিজে

গন্ধ ওঠে বাতাসে। পলিমাখা ক্ষীরধারা যেন জমে রয়েছে।

নিরু ঘোষ একখাবলা মাটি তুলে নিয়ে চীৎকার করে।

—ছ্যাখগো রূপুদা—ই মাটিতে সোনা ফলবেক গ! চন্দন পারা মাটি আর তেমনি বাস! পলিতে মাখো মাখো হয়ে গেছেক গ।

ফটিক নামোপাড়ার শীতল দাস অনেকেই আবার খুশিতে উপছে ওঠে। রতন ভাবতে পারে নি তাদের বালিচাপা জমির মাটি কোনদিন আলোর মুখ দেখবে। সে চীৎকার করে,

—অই বাপ ছ্যাখগো, মাটির ক্যামন বতর হইছে।

বুড়ো যতীন এতদিন গুম হয়ে বসেছিল। ঘর গেছে, একমাত্র বংশধরও বন্যার তাণ্ডবে মরেছে। শঙ্করী সেই কচি বাচ্চাটাকে হারাবার পর দেখেছে কেবল হতাশার ছবিটাই! আজ ওই হারানো মাটিকে ফিরে পেয়ে উদভ্রান্ত দিশাহারা মেয়েটা মাঠে নেমে ওই ঠাণ্ডা মাটিতে মুখ ঘসে চলেছে। ওই স্পর্শে যেন মিশে আছে তার হারানো খোকনের গায়ের সেই গন্ধ। হঠাৎ তার কথাই মনে পড়ে, কি অঝোর আর্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শঙ্করী।

এগিয়ে আসে রতন—বৌ! এ্যাই বৌ! ই মাটিকে ফিরে পেয়েছি রে, আবার সব ফিরে পাবো!

শঙ্করী চাইল ওর দিকে। ফিসফিসিয়ে ওঠে মেয়েটা।

—বলছো আবার সব ফিরে পাবো?

—হ্যাঁরে।

শঙ্করী শূন্য দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চেয়ে থাকে, দুচোখ কি বেদনায় টলমল হয়ে ওঠে। রতন খুশিতে চীৎকার করে—সাবাস কল গ!

শ্রীধর দাস আগেই খবর পেয়েছে, রাতের অন্ধকারে লোক এসেছিল মাধববাবুর কাছ থেকে, আর তার পরই ভোর থেকেই শ্রীধর দাসও বেশকিছু লোকজন জুটিয়ে মাঠে নামিয়েছে ঝুড়ি কোদাল নিয়ে। তাদের জমিতেই তারা নিজেরাই বালি তুলছে।

পানু ঘোষ রয়েছে সামনে। সেই হাঁক ডাক করিয়ে কাজ

করানোর ভান করছে। বালি তুলছে তারা। দাসজীও ছাতি মাথায় এসেছে, সঙ্গে রয়েছে সনাতন আরও অনেকে। পানু ঘোষ-গিরিধারী-শম্ভু আরও অনেকে কাজ করছে এ মাঠে।

দাসজী ওদের বুলডোজার এ মাঠে নামাতে দেখে হেঁকে ওঠে!

—ইদিকে নয় হে। ই সব আমার জমি। ওসব যন্ত্রপাতি হঠাও বাবু ইদিক থেকে।

এগিয়ে আসে রূপেন। ধীরাদের জমি চাষ করে মদন। সেও কথাটা শুনে চমকে ওঠে।

—আপনার জমি! বলছেন কি দাসজী? এসব জমি মিত্তিরবাবুদের, বর্গাদার আমি।

দাসজী এসে পড়েছে। রূপেন-দ্বিজেন-সন্তোষ এসে পড়ে। মদনের কথায় দাসজী বগল থেকে জড়ানো কাগজ বের করে বলে,

—এ জমিতো কওলা নিয়েছি গোবিন্দবাবুর কাছ থেকে। তিনি তো সব সম্পত্তি বিচে দিয়ে গেছেন আমাকে। মায় ওই বাস্তু বাড়ি অবধি।

—কি বলছেন?

রূপেনও অবাক হয়। দাসজী এবার ওদের কোণঠাসা করেছে। বলে সে।

—যথার্থ বলছি রূপেনবাবু। এই সব দলিল। ওদের যন্ত্রপতি ওঠাতে বলুন এখান থেকে। নাহলে ফৌজদারী সোপরদ্দ করতে বাধ্য হবো।

···বুলডোজারের গর্জন থেমে গেছে। দাসজীর খ্যানখ্যানে গলার শব্দটাই ঠেলে উঠেছে। এতলোকের সব আশা স্বপ্নকে যেন চুরমার করে দিয়েছে লোকটা। মদনও চমকে ওঠে।

—কি হবে রূপুদা?

রাধাও এসেছিল মাঠে। সে ধীরাদির এই চরম দুর্ভাগ্যের সমব্যাথী। কিন্তু করার কিছু নেই। সব হারাবার দুঃখ সে বোঝে।

তাই রাধাও এগিয়ে এসেছে। মনে হয় তার এ সব দাসজীর চক্রান্তই।

ধীরাকে তারা এইভাবে কৌশলে সরিয়ে তাদের কাজে বাধা দিতে এসেছে। এখানে ওর যেন আর কোন দাবী নেই। আনন্দও নেই। সরে যাচ্ছে সে। দাসজী হাঁক পাড়ে বিজয়ীর মত

—পানু, এদিকের বালি তোল আগে! এই মাঠের বালি।

হঠাৎ সন্তোষ এগিয়ে আসে। সতেজ স্বরে বলে সে,

—দাসজী ওই বিক্রী কওলায় ধীরাদি কি সই করেছেন? তার সই তো নেই। বর্গাদারের সইও নেই।

দাসজী একটু অবাক হয় ওর জেরায়। সন্তোষ বলে।
—জবাব দিন!

দাসজী বিরক্ত হয়ে উঠেছে। একটা আইনগত প্রশ্ন তুলেছে সন্তোষ।

দাসজী বলে—না। ওর দাদা সই করেছে!

সন্তোষ বলে ওঠে—এ্যতো মামলা করেন এটা জানেন না যে পৈত্রিক সম্পত্তিতে এখন মেয়েরও সমান অধিকার আছে। গোবিন্দবাবু তার অংশ বিক্রী করতে পারেন, ধীরাদির অংশ এখনও তাঁরই। ওই সম্পত্তির কোন পার্টিশানও হয়নি। গোবিন্দবাবুকে এনে পার্টিশান করিয়ে তবে দখল নিতে আসবেন, নাহলে আসবেন না। তারপর বর্গাদার ওই মদনেরও মত চাই।

দাসজী ভেবেছিল অসহায় মেয়েটাকে ধমকে ধাপ্পা দিয়ে সবটাই দখল করে নেবে সে। একবার দখল পেলে আর হঠাতে পারবেনা কেউ তাকে। কিন্তু এই ভাবে ব্যাপারটা মোড় নেবে তা ভাবেনি।

মদন ওর দিকে চাইল। রাধাও সন্তোষকে এভাবে এগিয়ে এসে দাসজীর মত ধূর্ত লোককে থামিয়ে দিতে দেখে মনে মনে খুশীই হয়েছে।

শ্রীধর দাস আইনজ্ঞ লোক। বুঝেছে এরপর ফৌজদারী করাও

চলবে না। তাই উঠে গেল জমি থেকে মুখ কালো করে।

রূপেন বলে—একজন মালিক রাজী হয়েছেন, তিনি এ জমি সমবায়-কে দিয়েছেন, আপনাকেও দিতে হবে দাসজী। নাহলে বালি তুলে আমরা চাষ করবো বর্গাদার আর ধীরার হয়ে। আপনি ফসলের ভাগ নিয়েই খুশী থাকবেন।

দাসজী ফুঁসে ওঠে—এ অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়! আইন নেই?

রূপেন বলে—জমি ফেলে রাখার আইন নেই। ফসলের ভাগ নিয়ে এ জমি আপনাকে ছাড়তে হবে, নাহলে ল্যাণ্ড সিলিং-এর আওতায় এ জমিও ভেষ্টেড হয়ে যাবে। আপনার লুকোনো জমির সব খবরই নিয়েছি।

চমকে ওঠে দাসজী। মনে হয় এরা তাকে কোণঠাসাই করে এনেছে।

রূপেন বলে—বুলডোজার চালু করো!

দাসজী চাইল রূপেনের দিকে। কদম বুড়ি বলে,

—লোভের আর শেষ নাই তুর হ্যাঁরে চৌধর! ধম্মোকেও গুলে খাবি? এঁ্যা! ভয় ডর নাই গ!

…দাসজী ফণা গুটিয়ে তখনকার মত সরে এসেছে, কিন্তু গজরানি থামেনি তার। পানু ঘোষও গর্জাচ্ছে।

—শালা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে দাসমশাই, নেহাত আপনি ছিলেন তাই। নাহলে দিতাম শালা সন্তোষকে খতম করে! ওই তো বখেরা বাধালে গ? বলে আইনে বর্গাদারের কথাও মানতে হবেক।

দাসজীও ভাবছে কথাটা। সে প্রকাশ্যে হট্ করে কিছু বলে না, করেও না। তাই দাসজী বলে

—ও বেলায় আসিস, কথা হবে। যা পানু—ওপাশের জমির বালি তোল গে! তার পর দেখা যাবে।

দাসজী হন্ হন্ করে গ্রামের দিকে চলে গেল।

তখনও কানে আসে তার বুলডোজারের কর্কশ শব্দটা, ওটা যেন

ওই হতভাগার দল তার বুকের উপর দিয়েই চালাচ্ছে। ওদের সে একহাত দেখে নেবে।

···আজ সব মানুষ দুটো দিকে বিভক্ত হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষগুলো, যাদের এতদিন লুটপাট করে এসেছে দাসজী, মাধববাবুর দল তাদের আজ চোখ বের হয়েছে। আর তাদের এই ভাবে মরীয়া হয়ে ওঠার জন্য বন্যাই দায়ী। ওই বন্যার প্রবল স্রোত এদের মনের দুর্বলতা লোভ সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে জাগিয়ে তুলেছে কাঠিন্য ঋজুতা আর সাহসও।

দাসজীদের তাই এবার লড়তে হবে ওদের সঙ্গে। মধ্যস্বত্ব গেছে, সাজা খাজনা আদায়ের পালা পত্তনিদারের দিনও ফুরিয়েছে। তাদের জমির পরিমাণও সীমিত। সব কিছুতেই একটা অদৃশ্য হাত থাবা মেরে তছনছ করে দিয়েছে। এই বাধার লড়াই-এ পরাজয় মানেই তাদের অবলুপ্তি। পুরোনো জীর্ণ সমাজের অনেকেই এই পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছে। বাধা দেবার সাহস ওই ব্রজদুলালবাবুদের নেই, কেশব মিত্তির শুধু হতাশা আর হাহাকার নিয়েই প্রাণ দিয়েছে।

কিন্তু বৈশ্যতন্ত্রের যুগের মানুষ, দাসজী-মাধববাবু। তারা এখনও পরাজিত হয় নি। তারাও দেখে নেবে। তাদের বুদ্ধিতে বালিশান দিচ্ছে— অন্তরের সব নীচতাকে অস্ত্র করে নিয়েছে।

সকালের আলো ভরা মাঠে বুলডোজার-এর শব্দ ওঠে। রাশিকৃত বালির পাহাড় জমেছে দু'এক জায়গায়, বাকী ক্ষেতের মাটি বের হয়েছে, সবুজ সরস মাটি। পাওয়ার টিলার-এর ধারালো ফলার দুদিকে ছিটকে পড়ে মাটি, বাতাসে ওঠে মিষ্টি ভিজে ভিজে সুবাস।

আবার আশা জেগেছে, স্বপ্ন জেগেছে ওই সর্বহারা মানুষগুলোর মনে। এখানে জমির মালিক-শ্রমিক আর কিছু নেই। ওরা সমবেতভাবে কাজে নেমেছে, এই সমবায় সমিতি ওদেরই। এ জমিকে ফলবতী করে তোলার সাধনা ওদের সবাকার।

··রূপেন চেয়ে থাকে ওই উল্লাসমুখর কর্মরত জনতার দিকে।

মনে হয় ওদের সমবেত আগ্রহ আর শ্রমদান বৃথা যাবে না। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত ওরাও দেখেছে, তাই দ্বিধাহীন চিত্তে এরা এগিয়ে এসেছে এই কাজে।

…বিস্তীর্ণ জমির চারিদিকে ওই বালিগুলো ঠেলে ঠেলে বাধাপ্রাচীর রচনা করা হচ্ছে, বালির সেই বাঁধ এদের সমবায়ের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রকে সব বাধা বিঘ্ন থেকে বাঁচাতে পারবে।

ব্লক এগ্রিকালচার অফিসারও এসেছেন। তিনি বলেন—ওই বাঁধের উপর ক্রমশঃ মাটি জন্মাবে, ঘাস হবে। কিছু গাছপালা লাগিয়ে দিলে ওগুলো বাঁধের কাজই করবে। রূপেনও তাই ভাবছে।

ব্রজদুলালবাবুও এসেছেন! এতদিন এই বিস্তীর্ণ এলাকা ধূ ধূ মরুভূমির মত পড়েছিল। ক'দিনেই এখানের রূপ বদলেছে। ব্রজদুলালবাবু বলেন—সুন্দর হয়েছে রূপেন! এমাটিতে আবার সোনার ফসল ফলবে।

ওদিকে একটা ডিপ টিউবওয়েল বসানোর জন্য কাজ চলেছে সেচবিভাগ থেকে। ওটা বসলে জলের অভাব হবে না।

ব্রজবাবু বলেন—বারোমাসই ফসল হবে এখানে।

এগ্রিকালচারাল অফিসার জানান—অত্যন্ত ভালো মাটি, সেচের ব্যবস্থা হয়ে গেলে এর রূপ বদলে যাবে। এই এলাকার মধ্যে এইটাই হচ্ছে প্রথম কোঅপারেটিভ প্রজেক্ট। তাই চেষ্টা করছি সাকসেসফুল হতেই হবে।

ব্রজদুলালবাবুরও মনে হয় এইটাই সঠিক পথ। তিনি বলেন।

—শুধু ভাগচাষী বর্গাদারীতে নাম বসালেই সমস্যার সমাধান হবে না। তারপর এই সমবায়ের ভূমিকাতে আসতেই হবে।

অন্যান্য উন্নতিশীল সমাজতান্ত্রিক দেশে এই ভাবেই যৌথ খামারের পত্তন হয়েছে। আর সেই পথে কৃষি সমস্যা ভূমি সমস্যা এমন কি গ্রামের বেকার সমস্যার সমাধান করা গেছে। আমরা তেমনি একটা

কঠিন পরীক্ষায় নেমেছি রূপেন। এর সার্থকতার উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু!

রূপেন বলে—সব গ্রামেই এমনি চেষ্টা করা যেতে পারে!

ব্রজবাবু বলেন—বাধা তো অনেক। শ্রীধর-মাধবের দল তো সর্বত্রই আছে। তাছাড়া পরস্পরকে বিশ্বাস না করতে পারলে, নিষ্ঠাবান কর্মী না পেলে এত বড় কাজ সার্থক হতে পারে না।

রূপেনও সেটা বুঝেছে। এই সর্বনাশা বন্যা বোধহয় সমাজের বুকে এই ভাবে একটা পরীক্ষার সুযোগ এনে দিয়েছে। সব হারিয়ে মানুষ নিজেদের এমনি অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে কিছু গড়ার কাজে এগোতে চায়। এই দায়িত্ব তাকেই তুলে দিয়েছে ওরা।

দুপুরের রোদে তাতালো ভাব ফুটে উঠেছে। ওই মানুষগুলো তবু খেটে চলেছে। সরকার থেকেও সাহায্য এসেছে। কিছু গম আর মজুরির কিছু টাকা এসেছে। পর্য্যাপ্ত নয়, কিন্তু নিজের ঊষর মাঠে কাজ করার উৎসাহ এনেছে।

রূপেনের মনে হয় মানুষ মাত্রেই অসৎ নয়, সে চায় খেটে খুটে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে। তার জন্যই সুবিধাবাদী কিছু শ্রেণী নানা মত-দল-রাজনীতির উর্দি পরিয়ে তাদের এই একত্রে মহৎ কিছু গড়ার কাজে বাধার সৃষ্টিই করেছে বার বার।

গ্রামের এই রাজনীতি সেদিনও ছিল, ছিল সমাজের নানা অনুশাসন, বাধা কুসংস্কার! সেদিন গ্রাম্য দলাদলিও ছিল। ধোপা নাপিত বন্ধ, হুকো বন্ধ এসব ছিল। কিন্তু আজ বাইরের রাজনীতির আবর্ত এসে গ্রামজীবনের সব পথগুলোকে কাঁটায় ভরে দিয়েছে। এর জ্বালা তার চেয়েও অনেক বেশী।

দাসজী মাধববাবুর দলও অন্তরালে ছুরি শানায় নীতির লড়াই-এর দোহাই দিয়ে, প্রতিপক্ষও এতকাল অত্যাচার জুলুম সহ্য করে এবার মাথা তুলছে। ওই জাগরণকে, মানবিক অধিকারকে সহজভাবে মেনে নিয়ে আপোষ রফার কোন পথই নেই, আছে তাই জমাট

বাধার স্তূপ।

রূপেন জানে না, কত শক্তি অপচয়িত হবে ওই বাধা ঠেলে পথ করে নিতে।

তবু থেমে নেই তারা। বালির পাহাড় তুলে বিস্তীর্ণ জমিগুলোর চারিদিকে বাঁধ দিয়ে চলেছে। এর মধ্যে কয়েকটা স্যালো পাম্পও বসানো হচ্ছে। ওদিকে নোতুন পাওয়ার টিলার এসেছে, চাষ শুরু হয়েছে।

কদম বুড়ি, রাধা, গ্রামের অনেক মেয়েরাও আসে ওই বিচিত্র কর্মকাণ্ড দেখতে। মনে হয় ওই জমিগুলোয় এবার সোনা ফসলই ফলবে।

কিন্তু আপাততঃ কিছু চালের দরকার। রাধার আশ্রমের ঘর ক'খানা ছাউনি দিতে হবে। মজুররা বলে—কাজ করে দিব, ভাত খেতে দিবা কিন্তু। ভাতের উপর সহজাত লোভ ওদের। গম খাটা খেয়ে পেট ভরে, মন ভরে না।

ব্যাং বলে—ভাত কুথাকে পাবো হে?

রাধা শোনায়—ঠিক আছে। দেখছি।

...রাধার মনে হয় কাজটা সেই দিন ভুলই করেছে মাধববাবুদের মুখের উপর বায়নার টাকা ফেলে দিয়ে এসে। বাবার কোন খবর পায় নি। টাকাও আসেনি। ভেবেছিল বাবা কিছু টাকা পাঠাবে। কিন্তু কোন খবর নেই। মাঠে ফসল উঠতে দেরী আছে। কোন পথই পায়নি রাধা।

ব্যাং বলে—ভাত তো খাওয়াবা তা চাল পাবা কুথায়? ইদিকে মাধববাবুকেও চটালা।

রাধা কথাটা ভাবছে। ধীরাদির কথা মনে পড়ে। সেও রূপেনের পায়ে মাথা ঠুকে ফিরে গেছে, তার জীবনেও তেমনি একটা ব্যর্থতার জ্বালা রয়েছে। রাধার মনে হয় সামনে পথ তাকে পেতেই হবে। শেষ চেষ্টা করবে যদি চাল কিছু মেলে।

তাই চলেছে মেয়েটা রাত্রির আবছা অন্ধকারে।

দাসজী দেখেছে সবই যেন হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছে। জমিজায়গা মান সম্মান অবধি। এতকাল মেয়েদের দেহটাও ছিল তার কাছে কেনা বেচার সামগ্রী। সেটাও হাতছাড়া হতে চলেছে। মাধববাবুও এবার নিজের ব্যবসা নিয়ে ডুবে থাকতে চায়। দাসজী আজকের অপমানটা ভুলতে পারেনা। দুর্গাপুরে ধীরাকেও সই করিয়ে এনে সে জমির দখল নেবে। তার আগে সন্তোষকে দেখে নেবে সে।

গিরিধারী জানে কত্তার মেজাজ খুশী করার ব্যাপারটা। গুপী-শম্ভু-গিরিধারীদেরও ডেকেছে কত্তা। দাসজী বলে,

—এবার ওটার বিহিত করতেই হবে।

গিরিধারী জানায়—সন্তোষটাকে তাহলে গুমই করে দিব গো!

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল ওরা। দাসজীও চুপ করে যায়। তার ভিতরের ঘরে দুচার জন বিশেষ অতিথির আগমন ঘটে। এসময় রাধাকে দেখে অবাক হয় সে। রাগ করতে গিয়েও পারেনা। মেয়েটা হাসছে—কি গো! অসময় এলাম নাকি? তাহলে যাই?

রাধার মুখে মাতাল করা হাসি। কাপড়টা ওর উথলে ওঠা যৌবনকে বশ মানাতে পারেনি। শ্রীধর বলে,

—তোরা যা গিরিধারী, পরে কথা হবে।

ওদের বিদায় করে চাইল শ্রীধর মেয়েটার দিকে। রাধার অভিনয় করার ক্ষমতা আছে, নাহলে আসরে এত লোকের মাঝে গান গায় কি করে ভাব দিয়ে। রাধা বলে,

—রাগ করেছো দাসজী এলাম বলে?

দাসজীর বুকের জমাট পাথরটা গলছে। একটু আগেই ও ষড়যন্ত্র করছিল একজনকে রাতের অন্ধকারে শেষ করে দেবার। রক্তলোভী সেই মানুষটা এখন মাংসলোভী একটা প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। শুক্‌নো ঠোঁটটায় জিভ ঝুলিয়ে নেয় মাংসাশী প্রাণীর মত। দাসজী বলে,

—বারে ! রাগ করবো কেন ?

রাধা বলে—তুমি এত বড় কারবারী, কিন্তু ব্যবসা বোঝনা গ ?

দাসজী চাইল মেয়েটার দিকে। রাধা বলে—নিজের জিনিষ নিয়ে পরের হাতে তুলে দিতে মন চাইল তোমার ? তোমার কাছে আসি হাসিমসকরা করি, তাই বলে ওই মাধববাবুর কলবাড়িতে যেতে বললা তুমি ? রাগে দুঃখে টাকা ফেরত দিলাম। আর তাই এলাম কথাটা তুমাকে শুধোতে।

অবাক হবার পালা এবার দাসজীর। তবে নিজের পুঁজিতে রাধার মন যে এমনি ভাবে জমা হয়েছিল তা জানেনা। আজ তাই কি অজানা খুশিতে তার সারা মন ভরে ওঠে। বলে দাসজী

—রাধা ! সত্যিই ভুল হয়েছিল রে !

রাধা দেখছে মানুষটাকে ! একটু আগেই শুনেছে নিজের কানে ওই লোকটার গভীর ষড়যন্ত্রের কথা। পরক্ষণেই ওর লোভী এই নোতুন রূপটা দেখে সেও অবাক হয় ! ওকে ঘৃণা করে সারা মন দিয়ে। রাধা বলে,

—ট্যাকা কটা রাখো। দশ কেজি চাল দাও বাপু। গম ঘাঁটা খেয়ে জিবে তার আর নাই !

দাসজী বলে—আগে জানাবি তো। দিনরাত তেরিয়া হয়ে আছিস ওই রূপেনদের দলে মিশে !

বলে রাধা—মিশতে হয় গো ! শোন নি ? রাধা সুর করে গেয়ে ওঠে—যাইবি পশ্চিমে

বলিবি দক্ষিণে

দাঁড়াবি পূরব মুখে।

গোপন পিরিতি

গোপনে রাখিবি

তবে তো রহিবি সুখে॥

দাসজী বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বলে সে—চাল পাঠিয়ে

দিচ্ছি! একদিন কীর্তন কিন্তু শোনাতে হবে রাধা!

রাধার সামনে যেন একটা সাপ ঝাঁপি থেকে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে।

রাধা বলে—আজ যাই গো। পরে একদিন শোনাবো!

কোন রকমে বের হয়ে এল রাধা।

বাইরে তখনও গিরিধারী দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মুখচোখে কি হিংসার জ্বালা ফুটে ওঠে সেটা নজর এড়ায় নি রাধার। রাধা চিনেছে দাসজীদের। এবার তারও ভয় হয়, যেন গোখরো সাপ নিয়েই খেলায় মেতে উঠেছে সে।

রাধার মনে পড়ে সন্তোষের কথা। আজ নিজের কানে শুনেছে সে ওই গিরিধারীদের কথা! একটা পথ তাকে নিতেই হবে।

আশ্রমের দিকে এগিয়ে যায় সে! মনে হয় সন্তোষ-এর সঙ্গে আর কোন সম্পর্কও তার নেই, সেও পুরোনো সম্পর্কটা নিয়ে কোন কথাই তোলেনি, রাধাও এগিয়ে যাবে না। আশ্রমের দিকে চলেছে।

ফিকে জ্যোৎস্নার আলো ভরা বালুচর, ওদিকের মাঠে পাম্প-এ জল উঠছে, সবুজ বীজধানগুলো মাথা তুলেছে। ব্যাং রাধাকে দেখে চাইল।

—কি গো! শম্ভু চাল দিই গেল। তুমি ছিলা কুথায়? ইদিকে কাজোরা থেকে মূলগায়েন চিঠি পাঠিয়েছে! লোক এসেছিল। তাকে বলে দিলাম যাবো, সামনের পূন্নিমায় দু'পালা গান গাইতে হবে তোমাকে বর্দ্ধমানে! মূলগায়েন যাবে উখান থেকে!

রাধা চুপ করে শুনছে কথাটা। সেদিন মাধববাবুকে মিথ্যে বায়নার কথা বলেছিল। বাবার চিঠিখানা তুলে নেয় সে। রাধার মনে হয় বর্দ্ধমানের বড় আসরের ডাক সে নেবে, আজ তাকে বাঁচার জন্য নোতুন পথই নিতে হবে। ওই দাসজীর হাতটাকে এড়িয়ে পালাবার এমনি পথই সে খুঁজেছিল। ঠাকুরই এই গানের আমন্ত্রণ এনে দিয়েছে।

ব্যাং বলে—এতো ভাবছো কি গো? এ্যাঁ! আমি তো বলে দিলাম যাবো বর্দ্ধমানে। তাহলে ক'দিন পালা দুটো ঝালিয়ে লাও,

মান ভঞ্জন আর মাথুর। এ্যাঁ!

রাধাও এমনি পথই পাবার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব হয়েছিল।

বলে সে—তাই ভালো রে। মানভঞ্জন করাবার কেউ যখন নেই তখন মথুরা থেকে চলেই যাবো, মান-মাথুর সব একাকার হয়ে গেছে রে!

ওর কথায় কি হতাশার সুর ফুটে ওঠে। মীরাও এমনি শূন্য হাতে কি জ্বালা নিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। একটি মেয়ের সেই সব-হারানোর বেদনাটাকে নিজের জীবনে আজ অনুভব করতে পারে রাধা। ব্যাং এসব বোঝে না! সে বলে ওঠে।

—কি যে বলো! চলো খেয়ে দেয়ে লাও। কাল পরশু তুদিনেই ঘর ছাইয়ে নে বেরুতে হবে।

রাত্রি নেমেছে। চারিদিক নীরব-নিস্তব্ধ। রাধার ঘুম আসে না। আজ সামনে তার জীবনের ওই কীর্তন গাওয়ার পথটাই দেখছে সে। পথে পথে ঘোরার জীবন। বিলাসী চন্দনবালা আরও কতো ঢপ কীর্তনীয়াদের দেখেছে, রাধাও জীবনে অন্য পথ না পেয়ে ওই পথেই যেতে বাধ্য হয়েছে।

···সন্তোষের কথা মনে পড়ে। গিরিধারী-চোরাশম্ভু-দাসজীদের কথাটা শুনেছে। একটা মানুষের জন্য মন কেমন করে। রাধা উঠে বের হয়ে গেল। আজ তার সামনে একটা কাজ রয়ে গেছে। বাঁধের নীচেকার রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় সে।

ইস্কুলবাড়ির এদিকের একটা ঘরে সন্তোষ বাসা বেঁধেছে। ওদিকে কো-অপারেটিভের অপিস। মাটির দেওয়াল, ছিটে বেড়ার বেষ্টনী তাতে খড়ের চাল! তুটো ঘরের একটায় অপিস—অন্যটায় সন্তোষ থাকে।

সন্তোষ হঠাৎ দরজায় কার শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কে টোকা দিচ্ছে। বোধ হয় রূপেন-নিরু-হবে। সন্তোষ বের হয়ে এল। আবছা আলো আঁধারিতে সামনে রাধাকে দেখে অবাক হয় সে—তুমি!

রাধা কি ভেবে বলে—একটু আসতে হবে। রূপুদা ডেকে পাঠিয়েছে। জরুরী দরকার!

সন্তোষ ওকে দেখছে। রাধার মুখে চোখে কি চাপা উত্তেজনা ফুটে ওঠে। সন্তোষ ওকে বিশ্বাস করতে পারে না। রাধা বলে

—আমার সঙ্গে না যাও, নিজেই চলে যাও। দেরী করোনা।

সন্তোষ একটু লজ্জা পায়। নিজের স্ত্রীকে আজ ভরসা করতে পারে না। এটা স্বীকার করতে বাধে তার। তাই বলে সন্তোষ,

—না, চলো। হঠাৎ কি দরকার তাই ভাবছি।

দুজনে চলেছে গাছগাছালির নীচে দিয়ে। মেঘগুলো ভেসে ভেসে চলেছে। চাঁদের আলোটুকু ঢেকে যায় কি অন্ধকারে। রাধা এদিক ওদিকে চাইছে। উঁচু বালিয়াড়ির ওদিক থেকে ছায়ামূর্তিগুলোকে দেখতে ভুল করেনা সে। সন্তোষও দেখেছে তাদের। তার ওই ঘরটার দিকে চলেছে তারা। সন্তোষ কি বলতে যাবে।

রাধার হাতটা ওকে ইশারায় থামতে বলে তাকে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইছে সে ওদিকে। অন্ধকারে হঠাৎ ওই ঘর দুটোয় আগুন জ্বলে ওঠে, রাতের অন্ধকারে সেই আগুনটা চকিতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে। ছায়ামূর্তিগুলো মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। চমকে ওঠে সন্তোষ।

—রাধা! আগুন!

রাধার দুচোখে ওই আগুনের আভা। রাধা বলে,

—ওই আগুনে তোমাকেই আজ শেষ করে দিতো ওরা।

—কি বলছো? চমকে ওঠে সন্তোষ।

রাধা বলে—এরপর সাবধানে থেকো। হয়তো এখানে কোন আকর্ষণই নেই তোমার, তাই বলছিলাম বেঘোরে প্রাণ দিয়ে লাভ কি?

রূপেন-নিরু-গ্রামের-অনেকেই এসে পড়ে। সন্তোষও এসে পড়েছে। রূপেন বলে—একি কাণ্ড হয়ে গেল সন্তোষ, বরাত জোরে

বেঁচে গেছো।

নিরু গর্জায়—শালাদের চিনেছি রূপুদা! এবার পেলে হয়!

কোন রকমে কিছু কাগজপত্র বাঁচিয়েছে। সন্তোষের ঘরখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সব কিছুই গেছে। সন্তোষ তখনও ভাবছে রাধার কথা।

ও বোধহয় কোন খবর পেয়ে রাতের অন্ধকারেই ছুটে এসেছিল তাকে বাঁচাবার জন্য। নাহলে আজ ওই আগুনেই সেও পুড়ে শেষ হয়ে যেতো।

রাধা চলে গেছে—সন্তোষ তাকে ধন্যবাদ দেবারও সময় পায়নি।

কথাটা সে গোপনই রেখে দেয়। তবু ভুলতে পারেনা ওই রাধার কথা; মনে হয় সন্তোষের একটা মিথ্যা মুখোশ পরে সে প্রতিষ্ঠার মোহে এগিয়ে চলেছে, জীবনের কঠিন সত্যের মুখোমুখি হবার সাহস তার নেই। সে ভীরু কাপুরুষই।

শম্ভু আর গিরিধারী এসেছিল ওই পুণ্যকর্মটি সারতে। শম্ভুর পায়ে রবারের জুতো, হঠাৎ আগুনটা জ্বলে উঠতেই ওদিক থেকে নীরু-ভূষণ দৌড়ে আসছে। গিরিধারী বাঁধের দিকে পালিয়েছে, শম্ভুর জুতো পরে দৌড়নো অভ্যাস নেই, সে ছিটকে পড়ছে ওদিকে একটা পানাপুকুরের জলে, একপাটি জুতো খুলে গেছে ডাঙ্গায়।

...আগুনের আভায় চারিদিক ভরে গেছে। চাঁদনী রাত। লোকজন তখনও দৌড়াদৌড়ি করছে ওদের সন্ধানে। হঠাৎ ভূষণ বলে—জুতোটা কার গো! ইদিকেই একশ্লা দৌড়েছিল, গেল কুথাকে?

ঘন কচুরীপানা এসে জমেছিল বন্যার সময় সেগুলো বদ্ধ জলে লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে। নজর চলে না। তবু টর্চ জ্বেলে খুঁজছে তারা! কে বলে।

—শালো ইখানেই আছে মনে লয়! পালাতে পারে নি।

নবীন ভটচাযও এসে পড়েছে। খগেনবাবু বলেন—ফায়ার! সর্বনাশ হতো! দ্যাখ খুঁজে!

এদিক ওদিক খুঁজছে তারা। কিন্তু নীরু ভূষণের নজর রয়েছে পুকুরের দিকে। ভোর হয়ে আসছে। লোকজন সরে গেছে অনেকে। শম্ভু প্রাণের দায়ে কচুরিপানার জঙ্গলে মাথা লুকিয়ে বসে আছে। শীতে জমে আসছে, আর হালুস-এর চুলকানিতে প্রাণ যাবার উপক্রম, তবু নড়েনি সে। এদিক ওদিকে নজর করে তেমন কাউকে না দেখে এবার পালাবার চেষ্টা করে। মনে মনে বাপান্ত করছে দাসজীর। ধেনো মদের নেশাও তার ছুটে গেছে, কাঁপছে ঠকঠক করে।

কোনরকমে উঠে এসেছে ধারে, হঠাৎ ওদিকের ঝোপ থেকে ভূষণ লাফ দিয়ে এসে এবার শম্ভুর টুঁটিটা টিপে ধরে চীৎকার করে,

—শালোকে ধরেছি রে! দৌড়বি! এক শালোকে ধরেছি!

ছুটে আসে অনেকে। শম্ভুর তখন নড়ার কায়দা নেই। হিমে জমে যাবার মত অবস্থা। দাঁত কত্তাল বাজছে। সন্তোষও ছুটে আসে। উদ্যত জনতার মুষ্টিযোগ থেকে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে সে।

—কাঠ কুঠো জেলে আগুন করে সেঁক আগে, শীতে জমে যাবে! পরে ওসব জেরা করবি!

দৌড়ে আসে রূপেন, গ্রামের লোকও। হাওয়ায় কথাটা রটে যায়। আগুন লাগানো দলের একটাকে ধরেছে ওরা। সারা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ে।

রাধা আজ এদের যেন কেউ নয়। ব্যাং খবরটা শুনে এসে বলে—হাতে নাতে ধরেছে গো! এাঁ—জতুগৃহ দাহ করেছিল আর একটুন হলে। ওই সন্তোষকে পুড়িয়ে মারত গ। তা পারে নি?

রাধা বলে—কে রইল কে গেল ওসব খবরে কি দরকার? আজই বর্দ্ধমান যেতে হবে মনে নাই! সন্ধ্যায় গান!

ব্যাং-এর খেয়াল হয়। এতক্ষণ এই নিবিড় উত্তেজনায় মেতে ছিল সে। বলে তাই তো গ! লাও তৈরী হয়ে লাও! দুগগা দুগগা

বলে বেইরে পড়ি। জমিয়ে গাইবে—ব্যাস, দেখবা বিলাসী ঢপ-ওয়ালীর থেকে ডবল রেট আদায় করতে পারবা !

রাধা আজ সব হারিয়ে যেন ওই ঢপকীর্তনীয়াদের দলেই চলেছে।

বেলা হয়েছে। সকালের গিনিগলা রোদ গেরুয়া হয়ে আসে। রাধা বের হয়েছে গ্রাম থেকে।

ওদিকে কলরব কোলাহল ওঠে। রাধা ভেবেছিল সন্তোষ হয়তো আসবে, কিন্তু সেও আসেনি। রূপেনদার নানা কাজ। তার বৃহৎ কর্ম-কাণ্ডের জগতে রাধা নামে একটি মেয়ের কোন অস্তিত্বই নেই, অন্ততঃ সেই স্বীকৃতি তারা কেউ দেয় নি। রাধাকে নিজের পরিচয় খুঁজে নিতে হবে নোতুন কোন জগতে। তারই সন্ধানে চলেছে সে।

বাসস্ট্যাণ্ড-এ দাঁড়িয়ে আছে ব্যাং-রাধার দলের দোহার দুজন। ব্যাং বলে—এত কি ভাবছো গো ? ডরাছো নাকি ? এ্যাঁ—

রাধা ওর দিকে চাইল। রাধার ওই ব্যর্থতার বেদনাকে বোঝার সাধ্য ব্যাং-এর নেই। রাধা বলে—না রে ! চল ! বাস এসে গেছে।

বাসটা ধুলো উড়িয়ে এসে থামলো, ওরা উঠে পড়ে।

মাধববাবু ক্রমশঃ বুঝেছে দিন বদলে যাচ্ছে। দুর্গাপুরের কারখানার সামান্য কাজ-এর চাহিদাও কমে গেছে, এখন বন্যার পর শুরু হয়েছে রিলিফ, আর ওয়ার্ক ফর ফুড-এর ব্যাপার।

ওদিকে রাস্তা-বাঁধের কাজগুলোর টেণ্ডারও দিয়েছে কিন্তু দেখেছে মাধববাবু ওসব কাজ তুলে বিশেষ লাভ হবে না। সেই লাভের পথে বাধা দিয়েছে রূপেনদের দল, ওদের দেখাদেখি আরও দুচার খানা গ্রামে সমবায়-এর কাজ শুরু হয়েছে। তারাই বুলডোজার-ডাম্পারগুলোকে দখল করে নিয়েছে। ফলে বেশী মজুরি দিয়ে লেবার লাগিয়ে কাজ তুলতে হচ্ছে।

দ্বিজেনও দেখেছে মাধববাবুকে। গ্রামের সেই মানুষটি দুর্গাপুরে এসে বদলে যায়। বাংলোর ওদিকের ঘরে তার অপিস, দ্বিজেন ঢুকে

চেয়ারে বসতে গিয়ে থামলো মাধববাবুর কঠিন চাহনিতে বাধা পেয়ে। আরও দু'চারজন লোক বসেছিল। কি যেন আলোচনা হচ্ছিল তাদের সঙ্গে, দ্বিজেন ঢুকতে সেই সব কথা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিজেন সেখানে কর্মচারী মাত্র, বসার অধিকারও তার নেই।

মাধববাবু ওকে কয়েকটা বিল দিয়ে বলেন—সাইকেলে করে ওয়ার্ক সাইট দুটোয় গিয়ে ওভারসিয়ারের সই করিয়ে ওখান থেকে চার পাঁচজন কামিনকে আনবে এখানে, কাজ আছে আজ রাত্রেই আনতে হবে।

অর্থাৎ ভাঙ্গা রাস্তায় প্রায় আঠারো মাইল সাইকেল করে কাজ সেরে সদরে গিয়ে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে, আর ওই মেয়েদের আনতে হবে। এর আগেও ক'দিন বৃষ্টির মধ্যে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তার কাজ করাতে হয়েছে তাকে। তাছাড়া দ্বিজেন দেখেছে এখানের অন্ধকারের নোংরামিটাকে।

দ্বিজেন এবার চাকরীর ব্যাপারটা বুঝে বিরক্ত আর হতাশই হয়েছে। এমনি চাকরীর ইঙ্গিত গ্রামে মাধববাবু তাকে দেয়নি। আজ গ্রাম থেকে রাতের অন্ধকারে ধীরাকে নিয়ে কি এক মিথ্যা মোহের জগতে এসে আটকে পড়েছে। ওকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাধববাবু ড্রয়ার খুলে দুটো দশটাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলে—রাহা খর্চার দরকার, বল্লেই তো পারো। যাও।

আসল কথাটা বলতে পারে না দ্বিজেন। রাগে অপমানে মুখ কালো করে বের হয়ে গেল। আজ বুঝেছে দ্বিজেন তাকে এভাবে সরিয়ে এনে যেন তিলে তিলে হত্যা করতে চায় এরা। রূপেনকে পারে নি। দ্বিজেনকে লোভ দেখিয়ে তার সত্যিকার পথ থেকে বিভ্রান্ত করে সরিয়ে এনে তার কর্মজীবনের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় দ্বিজেনের অসহায় রাগে যেন ফেটে পড়বে সে। কিন্তু নিষ্ফল সেই প্রতিবাদ। সাইকেলটা প্যাডেল করতে করতে বানভাসি রাস্তা দিয়ে চলেছে। সারা মাঠে তখনও ছড়ানো বন্যার

অবক্ষয়ের নিষ্ঠুর চিহ্ন !

মাধববাবু তবু চেষ্টা করছে আবার সব গুছিয়ে নিতে।

যত পরিবর্তনই আসুক—বিরাট শাসন যন্ত্রটার মাঝে অনেক নাট বল্টুই ঢিলে থাকে, সেই ছিদ্রপথগুলোর সন্ধান রাখে এরা, আর সেই পথেই এদের কাজ হাসিল করতে হয়।

মাধববাবুর বাংলোয় আজ ভূরিভোজের আয়োজনই হচ্ছে। তুচারজন কর্তাব্যক্তি আছেন, কোন মাতব্বরকে খুশি করার দরকার। তারই আয়োজন চলেছে।

ধীরা অনেক আশা নিয়েই গ্রাম ছেড়ে এসেছিল এখানে !

শহরের বাইরে উঁচু ডাঙ্গা—ওদিকে শালবন। এককালে তুর্গাপুরের এদিকটা পুরো শালবনে ঢাকা ছিল। মানুষ দখল নিয়ে এখানে শহর কারখানা বানিয়েছে। তবু এদিকটা এখনও জনহীন। শহরের ছড়ানো ছিটোনো বিস্তৃতি চলে গেছে দূর অবধি।

ধীরা আশা করেছিল একটা কাজ পেয়ে যাবে সে এখানে।

মাধববাবু ওকে বাংলোয় ডাকিয়ে এনেছিলো পরদিনই। এ যেন অন্য মানুষ। সামনে বড় টেবিল, ওদিকে রিভলভিং চেয়ার, ঘরটায় ফ্লোরেসেন্ট আলোর আভা ফুটে ওঠে। ধীরা দেখছে নোতুন মাধব ঠাকুরকে, গ্রামের সেই লোকটার সাদামাটা ভাব এখানে মুছে গিয়ে নোতুন একটি সত্বা ফুটে ওঠে।

—বসো ! ধীরা ভয়ে ভয়ে বসলো।

মাধববাবু বলে—চাকরী আপাততঃ তেমন কিছু দেখছি না। ততদিন বরং রিসেপশনেই কাজ করো। টেলিফোন ধরা—কেউ এলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। তবে কি জানো—একটু কেতা-তুরস্ত হয়ে থাকতে হবে। মানে গ্রামের সেই জড়তা ফড়তাগুলো চলবে না। বি স্মার্ট—হাসি টাসি দিয়ে কথা বলতে হবে। কাজকর্ম পিক্ আপ করে নাও। ততদিন মাসে তিনশো টাকা করে পাবে।

এখানেই থাকবে টাকবে।

ধীরার সেই স্বপ্নটা মন মুছে যাচ্ছে। এক নোতুন জগতে এসে পড়েছে সে। বুঝেছে গ্রামের সেই পরিচয়টাও এখানে অর্থহীন।

দ্বিজেনের ঘরটা ধীরার ঘর থেকে একটু ওদিকে। বাংলোর লাগোয়া একটা ঘরে ধীরা থাকে। দ্বিজেনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে কারখানার ওদিকে বাবুদের মেসের একটা ঘর। সেখানে বিশ পচিশ জন কর্মচারীর ভিড়ে মিশে থাকতে হয় দ্বিজেনকে।

তবু দ্বিজেন ধীরার খবর নেবার চেষ্টা করে।

সামনে বাগান, ধীরার ঘরের সামনে এসে সেদিন ধীরাকে দেখে অবাক হয় দ্বিজেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ধীরাও বদলে গেছে।

—একি! একেবারে বদলে গেছো?

দ্বিজেন যেন সেই গ্রামের মেয়েটিকেও চিনতে পারে না। পরনে হালকা মেরুণ রং-এর শিল্কের শাড়ি, ব্লাউজটার পরিসরও খুবই সীমিত, নিটোল বুকের রেখাটাকে সোচ্চার করে তুলেছে, কাঁধ পেটের মাখন রং-এর মাংসগুলো দেহের পূর্ণতাকে লাস্যময় করে তুলেছে। দুচোখে মদির চাহনি।

হেসে ধীরা বলে—মাধববাবু বলেন রিসেপসনিষ্টের চাকরীতে এসব দরকার!

ধীরা ফোনটা ধরেছে—হ্যাল্লো! আপনি—প্লিজ একমিনিট!

নিপুণ হাতে পি বি এক্স-এর ফোন লাইনে মাধববাবুকে কোন মহাজনের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিজেন অবাক হয়ে দেখছে ধীরাকে। নোতুন এক বিচিত্র জীবনের মোহে ধীরা জড়িয়ে গেছে। মেয়েরা বোধহয় জলের মতই, যখন যে পাত্রে রাখা যায় সহজেই সেই আকার নিতে পারে। দ্বিজেনের অতীত আদর্শের বোঝাটা এখনও তার বিবেককে মাঝে মাঝে চাপ দিয়ে দম বন্ধ করে তোলে।

হঠাৎ ওদিকের ঘর থেকে কি মাধববাবুকে বের হয়ে আসতে দেখে চাইল দ্বিজেন। মাধবঠাকুর একবার কঠিন চাহনি মেলে তাকে দেখে মাত্র।

বলে সে—তোমাকে তিন নম্বর সাইটে যেতে হবে আজই। সেখানে তিন চারদিন থেকে কাজ-এর রিপোর্ট পাঠাবে।

ধীরার দিকে চেয়ে বলে—চলো, ক্লাব থেকে লাঞ্চ সেরে ওদের ফ্যাক্টরীতে যেতে হবে, চারটেয় মিটিং!

বৃষ্টি নেমেছে। ধীরা গিয়ে গাড়িতে উঠলো। দ্বিজেনকে যেতে হবে এই মেঘবৃষ্টির মধ্যে দশবারো মাইল দূরের কোন বাঁধের ওয়ার্ক সাইটে! সেখানে তালপাতা বাঁশ দিয়ে আশ্রয় বানানো হয়েছে। সেখানে পড়ে থাকতে হবে কুলি মজুরদের কাজ-এর তদারকির জন্য।

দ্বিজেন আজও চলেছে সাইকেল ঠেলে দূরের ওয়ার্ক সাইটের দিকে মাধবঠাকুরের লাভের কড়ির অঙ্ক বাড়াতে। দ্বিজেন মনে মনে আজ কঠিন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে।

ধীরাও দেখেছে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই বিচিত্র জীবনের রূপটাকে। তিনশো টাকা মাইনে, কিন্তু দেখেছে শাড়ি-পোষাক এমনিতেই এসে যায়। গ্রামের সেই বঞ্চিত নিঃস্ব জীবনের তুলনায় এখানের সম্ভাবনা অনেক। দেখেছে ধীরা নিজের যৌবনমদির দেহের প্রতি ওদের আকর্ষণ।

এই মাধববাবুও সেটার মূল্য বোঝে।

বাংলোর বাবুর্চিখানায় প্রেসার কুকারে সেদ্ধ হচ্ছে মাংস, মশলাদার কাবাবের সুগন্ধ ওঠে। গাড়ির বুট থেকে কয়েকটা বিদেশী মদের বোতল, ফল মূল-এর ঝুড়ি বের করছে লতিফ বেয়ারা। ধীরাও ওই পার্টির মাদকতাটাকে ক্রমশঃ যেন অনুভব করে।

…মাধববাবুও আজ ব্যস্ত।

মাধববাবু এক ফাঁকে বলে—মিঃ সিংদেওজী আসছেন—ওদের

বিরাট কোয়ারী, ওকে একটু খাতির করবে ধীরা।

ধীরা চুপ করে কথাটা শোনে।

দ্বিজেনও নেই। তাকে আজই ওইসব কাজের ভার দিয়ে ওয়ার্কসাইটে পাঠিয়েছে। বাঁচার সংগ্রামে ওরা ওই সেনাপতিদের হাতের পুতুলমাত্র।

দ্বিজেন কোথায় তাঁবুতে পড়ে আছে হিমরাতে, আর সেজেগুজে ধীরাকে পার্টিতে থাকতে হয় বৃদ্ধ সিংদেওজীর পাশে। গলিত নখদন্ত সিংহই। বয়স হয়েছে—তবু লোকটার চোখে নেশার মাদকতা ছাপিয়ে ফুটে ওঠে লোলুপ চাইনি, ওর হাতটা ধীরার সারা গায়ে, অনাবৃত পেটের মাংসে যেন চেপে বসতে চায়। রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

লোকটার তুহাত ওকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

মাধববাবু দেখছে দূর থেকে, তার বিরাট ঠিকাদারীর প্রধান উপকরণ ষ্টোন চিপস্। লাখ লাখ টন মাল কি ভাবে আমদানী করবে তারই দাঁও কসে মাধববাবু।

ধীরা চমকে ওঠে!

রাত্রি ঘনিয়ে আসে। শালবন সীমায় অতীতে কোন হায়নার থাবায় এখানে লুটিয়ে পড়তো খরগোস রক্তাক্ত দেহ নিয়ে, তেমনি আদিম হিংসার করাল ছায়া ওই লোকটার তুচোখে, কঠিন তুহাত দিয়ে ধীরার কোমল দেহটাকে ওই পাথরের কারবারী যেন পাথরে পরিণত করতে চায়।

অস্ফুট স্বরে কি বলতে চায় ধীরা! টেবিলে টাকার বাণ্ডিলটা উড়ছে। বিড় বিড় করে ছায়ামূর্তিটা—টাকার ভাবনা নেই।

ধীরা কোন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামের সবুজ ধানক্ষেত, অজয়ের গেরুয়া বিস্তার, পাখী-ডাকা বনভূমি সব কোথায় হারিয়ে যায়! ধীরা সেই কাশফুল ফোটা ফুল-গন্ধময় জগৎ-এর ছবিটাকে স্মরণ করতে পারেনা। চেতনাহীন কোন

তমসার অতলে হারিয়ে যায়। তার অতীতকে সে অনেক মূল্যে বেচে দিয়েছে।

মাধববাবু যেন রাজ্য জয় করে গ্রামে ফিরছে।. ধানকলের কাজ এখন দিনরাত চলেছে। মাধববাবু বুঝেছে যেভাবে হোক তাদের সাম্রাজ্য বজায় থাকবেই। ওদিককার কাজগুলো দেখে জিপ নিয়ে গ্রামের দিকে ফিরছে সে। জানে তার আসল শিকড় এখানেই। দুদিকই বজায় রাখতে হবে তাকে।

দ্বিজেন-ধীরাকে এ মাটি থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে সে ঠকেনি। দরকার হয় এদের ওই নেতাদের সে নানা ভাবে কিনে নেবে। মনে পড়ে রাধার কথা।

তেজী মেয়েটা সেই রাত্রে এসে তার ঘরে ঢুকে তার মুখের উপর টাকাটা ফেলে দিয়ে তার কলবাড়ির অনুষ্ঠানের বায়না নেয় নি। অবশ্য পার্টি দুর্গাপুরে দিয়ে লাভবানই হয়েছে মাধববাবু! তবু সেই রাগটাকে ভোলেনি সে।

...রাধারাণী আজ নোতুন জীবনের মুখোমুখি হয়ে দেখেছে তার একটি বিচিত্র সত্তাকে। বর্দ্ধমানের আসরে এতদিন ভজন দাসই গেয়েছে, এবার সে নায়েক পক্ষকে বলে কয়ে নিজের মেয়েকেই আসর দিয়েছে।

বলে ভজন দাস—মুখ রাখতে হবে মা!

রাধারাণীও আজ বাবার মুখ রেখেছে।

...খবরের কাগজ থেকে অনেকে এসেছেন, রয়েছে শহরের গণ্যমান্য অনেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরাও এসেছেন, আর আসরে এসেছে অগণিত সাধারণ শ্রোতা।

...রাধার সুরেলা গলায় মনোহারশাহী ঘরাণার কীর্তনের সুর মায়াজাল গড়ে তোলে, তেমনি দুরূহ তালে গেয়ে চলেছে রাধারাণী। ব্যাংও খোলে রূপক-ঝম্পক-ষোলকুশী তালে নিপুণ ভাবে বোল পড়ন

র্ততুলে রাধারাণীর কীনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

ভজন দাসও ভাবতে পারেনি রাধারাণী এভাবে আসর জমিয়ে তুলবে, তার সতেজ গলার তাল—ভাবময় আখর ব্যঞ্জনা তার কীর্তনের ভাবটিকে মনোগ্রাহী করে তুলেছে।

আসরে প্রশংসার গুঞ্জরণ ওঠে। ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলছে, ছবি উঠছে। ডাইনের দোহার রামলাল ও অন্যান্য দোহাররা কীর্তন জমিয়ে তুলেছে।

প্রবীণ অধ্যাপক একজন কীর্তন শেষে এগিয়ে আসেন।

—অপূর্ব গেয়েছো মা। আরও উন্নতি করো আশীর্বাদ করি।

…রাধারাণী অন্য এক জগতে হারিয়ে গেছে। বন্যাবিধ্বস্ত কোন ধ্বংসের জগৎ থেকে তারা এসেছে, ঘর বাড়ি-আশ্রয় সব মুছে নিয়ে গেছে দুর্বার বন্যার প্রবাহ, তবু এই ধ্বংসও মানুষকে শেষ করতে পারে নি। সে তার রূপ রস বর্ণ সুর সব নিয়েই এখনও বাঁচার সাধনা করে চলেছে। কোন নিষ্ঠুরতা ধ্বংসের সামনে সে হার মানে নি।

প্রবীণ আচার্য বলেন—কাল আশাকরি আরও ভালো গাইবে মা। রাধারাণী এই জগৎকে চেনেনি।

এখানে গ্রামীণ সেই সংকীর্ণতা নেই, হীন স্বার্থপর লালসার প্রকট রূপ নেই, দাসজী মাধববাবু এককড়িদের শ্রেণীর লোভী হাতের নগ্ন স্পর্শটা এগিয়ে আসে না। গুণগ্রাহিতাও আছে। আছে প্রতিভার স্বীকৃতি।

কোন সাংবাদিক বলে—রাঢ় বাংলার কীর্তনের শুদ্ধ ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আপনারাই।

ভজন দাস বিনীতভাবে জানায়—আপনাদের আশীর্বাদে তা সম্ভব হয়েছে বাবু! নালে বানে—অনাহারে অভাবে আমরা তো মরে গেছি বাবু!

রাধারাণী ওই কথাটা মানতে রাজী নয়! দেখেছে গ্রামের বুকে রূপেনবাবু, সন্তোষ—আরও কতো মানুষের বাঁচার সংগ্রাম,

ব্রজবাবুর সহযোগিতা। সর্বত্রই মানুষ সেই পরাজয়কে মেনে নিয়ে থেমে নেই। রাধারাণীও মনে মনে সেই সংগ্রামের সৈনিক বলেই ভাবে নিজেকে। সেও অন্যদিকে বাঁচার কথাই ঘোষণা করে যাবে। হার মানবে না। এই অচেনা বৈভবময় জগতে সেও তার স্বীকৃতি কায়েম করবে।

দাসজী-এককড়ি-পানু দাসরা বিপদে পড়েছে।

পানু দাস ওই রাতে কোনমতে আগুনটা লাগিয়েই পালাতে পেরেছিল, চারিদিক থেকে লোক ছুটে এসেছে। আগুনটা জ্বলছে, দূর থেকে দেখে মনে হয় পানুর কাজ শেষ। সন্তোষের ঘরে শিকল তুলে দিয়েই আগুন লাগিয়েছে, ওই ঘরের মধ্যে বন্দী অবস্থায় পুড়েই শেষ হবে সন্তোষ।

দলের অন্য দুজনকে দেখে না। চোরা শম্ভু পিছনে পড়ে গেছে। পানু কোনমতে দৌড়ে এসে দাসজীর খামার বাড়িতে ঢুকে ভেতর দিয়ে দাসজীর বাড়িতে এসে খবরটা দেয়।

দাসজীও ছাদ থেকে দেখেছে ওই আগুনটাকে। পানু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে—কাম ফতে দাসজী মশায়, দিইচি লালঘোড়া ছুটিয়ে। শ্লা সন্তোষের দফা শেষ!

সাবধানী দাসজী শুধোয়—সব ক'টা ফিরেছিস তো? কেউ টের পায় নি?

কিন্তু গোল বাধে তার থেকেই।

সকাল হবার আগেই খবরটা পাকাপাকি ভাবে আসে—শম্ভুকে ওরা ওই আগুন-লাগা বাড়িটার পাশের পানাপুকুর থেকে তুলেছে, সে পালাবার পথ পায় নি। তারপর দুচার ঘাও দিয়েছে। ব্রজবাবুও ওখানে গিয়ে পড়ায় মারধোরটা আপাততঃ বন্ধ আছে।

চমকে ওঠে দাসজী—ব্যাটা কিছু বলেনি তো?

পানুও ভয়ে কাঁপছে। সত্যি যদি শম্ভু ওদের নামগুলো ফাঁস

করে দেয় তাহলে গ্রামের লোক যা ক্ষেপেছে তাকে ছেড়ে দেবেনা। দাসজীরও সেই তোড় আটকাবার সাধ্য নেই।

সন্তোষকে ওরা কায়দা করতে পারে নি। সে ওই রাতের অন্ধকারে ঘরেই ছিল না। গর্জে ওঠে দাসজী,

—কোন কম্মের নোস্ তোরা। কাজ তো হোল কাঁচকলা, ধরা পড়ে এবার কি হয় ছাখ।

দাসজীর নিজেরও ভয় হয়।

নবীন ভটচাযও সকালেই গিয়ে হাজির হয়েছিল অকুস্থলে। বানের পর বাঁধ আর রাস্তায় সরকার থেকে শ' দরুণে মজুর লাগিয়ে মেরামত করা হচ্ছে।

সন্তোষ-রূপেনরাই এসব কাজের তদারক করছে। তাদের চেষ্টাতে এই দুর্দিনে ওই মানুষগুলো কাজ পেয়েছে, বিনিময়ে খাবার, কিছু পয়সাও পাচ্ছে।

দাসজী-মাধববাবু-এককড়িদের হিসাবটা এবার গোলমাল হয়ে গেছে। এর আগে দেখেছে বন্যার পর ওই মানুষগুলো এসে মাধববাবু-দাসজীর হাতে পায়ে ধরেছে। কিছু টাকা—ধান চাল দিতে হবে, আর বিনিময়ে তারা ওদের বাড়ি জমিও লিখিয়ে নিয়েছে, নাহয় চড়া স্থদে টাকা ধার দিয়ে ওদের ফসলের সিংহভাগ নিজেদের ঘরে তুলেছে। এমনি করে তারা ফুলে উঠেছে।

কিন্তু এবার ওই মানুষগুলো বিশেষ কেউ আসেনি, তারা কাজ পেয়েছে অন্যত্র। খাদ্য পেয়েছে। আর তাই বোধহয় দাসজী-মাধববাবুদের তারা তোয়াক্কা করে না।

নবীন ভটচায বলে—দিন বদলে গেছে গো দাসজী। এখন মরণ আমাদের মত বাবু কসমের লোকদের। সব বন্ধক নাহয় বিক্রমপুর হয়ে গেল, আর ওই যতনা-ভূষণ-মতিদের ছাখ গে, বাবা ব্যাটা-বৌ-ছেলে ইস্তক বাঁধে খাটছে, জনাকি দুসের করে গম দুটাকা লগদ। কতো হোল? আট সের গম—আট টাকা লগদ! চোপা

ছ্যাখো গে !

সত্যিই তাই। দাসজীও বুঝেছে সেটা।

নবীন আজ ভোরবেলাতেই গোলমাল শুনে মাঠ থেকে কানে পৈতাটা জড়ানো অবস্থাতেই দৌড়েছে। চোরা শম্ভুকে ওরা কচুরি-পানার জঙ্গল থেকে তুলে দুচার ঘা দিতে ছিটকে পড়ে সে। কাঁপছে ঠকঠকিয়ে।

সন্তোষ-রূপেনের কথায় ওরা মার বন্ধ করে খড়কুটো জ্বেলে সেঁকছে শম্ভুকে। আর শম্ভুর মা তখন গলা ফেড়ে চীৎকার করছে।

—আমার ছেলেটাকে খামোকাই মারছো গ ! এ বাবা।

নিরু বলে—শালোর জুতো পড়ে রইছে হ' ছ্যাখো পোড়া ঘরের দাওয়ায়, যেখানে আগুন ধরিয়েছিল ! উখানে কেনে গেইছিলি রে ?

গর্জন করছে নিরু—বল শালা আর কে ছিল ? কে বলেছিল ছামু চালে আগুন দিতে ? মুখ বুজে থাকলে শালোর মুখ পাঁচনের বাড়িতে ফাটিয়ে দুব।

শম্ভু বুঝেছে এতদিন ধরে অনেক অকাজ কুকাজ করে এবার সত্যি হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে সে। মুখ খুললে অনেক রুই কাতলা জড়িয়ে যাবে।

এদিকে চুপ করে থাকলে এরা আজ তাকে বোধহয় খতম করেই দেবে। শম্ভু বোকার মত চেয়ে থাকে। যেন ওদের কোন কথাই সে শুনতে পাচ্ছে না।

…দাসজী এককড়ি বন্ধ ঘরে দাপাচ্ছে। নবীন ভটচায বলে,

—সারা আশেপাশের গাঁয়ের লোক, বাঁধের সব মজুর, গাঁয়ের লোক ক্ষেপে গেইছে। কাজ বন্ধ করেছে তারা। শম্ভুকে ফড়ে ছেঁড়া করে ছিঁড়ে দেবে, প্যাঁদানির চোটে বোধহয় নামটামও বলে দেবে ইবার।

দাসজী চমকে ওঠে। এইবার ছাদ থেকে দেখেছে সে ওই

হাজারো মানুষদের। আজ তারা গভীর একটা ষড়যন্ত্র—খুনের চেষ্টাকেই ধরে ফেলেছে। ওদিকে সমবায়ের কাজ এগিয়ে চলেছে। বালুর বিস্তীর্ণ বাধা দূর করে তারা নোতুন ধানের বীজ ফলিয়েছে, এসেছে সবুজের ইশারা। এত মানুষের মুখের গ্রাস যোগাচ্ছে ওই সন্তোষ-রূপেনের দল। তাদের উপর এই আক্রমণে তারাও ক্ষেপে গেছে।

দাসজী এবার ভয় পেয়েছে। হয়তো ওই জনতা এবার তার গদি-গুদামেই চড়াও হবে। যদি তেমন কিছু করে ঠেকাবার কেউ নেই।

দাসজী বলে—গিরিধারী, শীঘঘীর থানায় চলে যা। বলগে বড়বাবুকে একটা লোককে খামোকাই ধরে ওরা মেরে শেষ করে দিচ্ছে। বাধা দিলে আমাদের উপরও চড়াও হবে। যেন ফোর্স টোর্স নিয়ে আসেন।

গিরিধারী দৌড়ালো। তারও প্রাণে এবার ভয় জেগেছে।

কে জানে শম্ভু কিছু যদি বলে ফেলে। দাসজী বলে নবীনকে।

—আপনারা পাঁচজন গে ব্রজবাবুকে বলো খুড়ো, দোষী হয় পুলিশে দেক। নাহলে বেচারাকে খামোকাই মারবে?

হঠাৎ দেখা যায় মাধববাবুর গাড়িটা আসছে।

দাসজী যেন এবার আশ্বাস পায়। নবীন বলে,

—ছোটবাবুও এসে গেছেন।

—চলো দিকি! দাসজী-এককড়ির দল এবার ওই দিকেই দৌড়লো।

মাধববাবু ঘরে ঢুকতে লাবণ্য স্বামীকে দেখছে। মাধববাবু সিন্দুক খুলে কয়েক তাড়া নোট ভিতরে রেখে বলে—দেখছো কি? আরে বাবা, এসব বন্যা টন্যা একটু হওয়া ভালো। আমাদের বন্যাত্রাণে কিছু দান খয়রাত করে যাহোক রোজকার হয়। গরম জল দিতে বলো।

স্নান করি।

লাবণ্য দেখছে স্বামীর জামায় পানের দাগ, পার্টির চিহ্নও ফুটে ওঠে। লাবণ্য শুধোয়—ধীরা-দ্বিজেনকে নাকি চাকরী দিয়েছো দুর্গাপুরে? গ্রামের লোকদের লোভ দেখিয়ে কি এদের আন্দোলনকে থামাবে এইভাবে সবাইকে কিনে নিয়ে!

হাসছে মাধববাবু।

মাধববাবু দেখছে স্ত্রীকে। লাবণ্য এককালে কলেজে পড়েছে। কলকাতায় ওর ভাইরা নামকরা লোক। আজও যেন লাবণ্যের মনে আগেকার সেই কলেজের মুহূর্তগুলো, সেই সোচ্চার প্রতিবাদমুখর মিছিলগুলোর কথা মনে পড়ে।

লাবণ্য এই সংসারে এসে দেখেছে ওই মানুষটার নগ্ন স্বার্থপর রূপটাকে। শুধু জমিয়েই চলেছে সে। সেই পাপেই বোধহয় লাবণ্য মা হতে পারে নি। ধীরা-দ্বিজেনের ব্যাপারটাকে সেও ভালো চোখে দেখেনি।

মাধববাবু বলে—ওসব আন্দোলন টান্দোলনের দাম কি? সেই দ্বিজেন এখন মুখ বুজে কাজ করছে। আর ধীরাকেও কিছুদিন পর চিনতে পারবেনা। টাকা-আরাম কে না চায় বলো?

লাবণ্যের মনে হয় সেই-ই এই কথাটার জবাব দেবে। বলতে ইচ্ছে হয় এসব মিথ্যা।

হাসছে মাধব—কোথায় সব সিকেয় উঠে যাবে। রূপেনকেও দেখবে, নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে।

হঠাৎ বাইরে কাদের সাড়া পেয়ে বের হয়ে যায় মাধববাবু।

মাধববাবু দাসজীদের দেখে অবাক হয়। লাবণ্য কথাটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দাসজীদের দেখে ওঘরে চলে গেল মাধববাবু।

কথাটা শুনে অবাক হয় মাধববাবু।

—ব্যাটা ধরা পড়ে গেল? তার আগে গিরিধারী শম্ভুটাকে

শেষ করে ফেলে রেখে এলে ওই রূপেন-সন্তোষদের কায়দায় ফেলা যেতো। তা না করে এই কাণ্ড বাধালো? ব্যাটা কিছু বলেনি তো?

দাসজী বলে—যা মারধোর করছে এবার বোধহয় বলে ফেলবে। ওটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়াই ভালো। আর নির্দোষ একটা লোককে খুন করবে ওরা? ও যে আগুন দিয়েছে তার প্রমাণ কি?

মাধববাবুও ব্যাপারটা অনুমান করে নিজেই গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায় থানার দিকে।

…জনতা হঠাৎ ফাঁকা আওয়াজে চমকে ওঠে। পুলিশের ভ্যান এসে থেমেছে, সশস্ত্র কনেষ্টবল কয়েকজন এগিয়ে আসে। বড় দারোগাবাবু ছোট দারোগাও এসেছে। রূপেন-সন্তোষ-নিরু ঘোষ অন্যান্য লোকজন অবাক হয়। শম্ভু এতক্ষণ মুখ বুজে ছিল। মারধোর হয়েছে কিন্তু শম্ভুর এসব সহ্য করা অভ্যাস আছে। তবু মুখ বুজে ছিল। জানে সে একটা পথ বের করবেই দাসজী। আর পুলিশ আসতে দেখে এবার শম্ভু কাতর স্বরে অর্তনাদ করে ওঠে,

—মরে গেলাম বাবু গ! কিছু জানিনা আমি। খামোকাই খুন করে দিলেন গ! বাঁচান আজ্ঞা!

আছাড়ি বিছাড়ি খেয়ে চোরা শম্ভু এবার মালসাট দিয়ে দারোগাবাবুর অভয় চরণ দুহাত দিয়ে জাপটে বক্ষে ধারণ করে কাতরাচ্ছে।

কদম গর্জে ওঠে—মরণ! হাজার জুতো গুণে খায়
ফুলের ঘায়ে মূচ্ছো যায়।

কে তুকে মেরেছে রে? তুই মুখপোড়া ছামু চালে আগুন লাগাতে এলি!

কাৎরাচ্ছে শম্ভু—আমি জানিনা কিছু! বাহ্যি বসতে এসেছিলাম—ওরা তাড়া করে ধরে জলে ফেলালেক গ।

মাধববাবু, দাসজী অনেকেই এসেছে। দারোগাবাবু বলেন,

রূপেনবাবু, সন্তোষবাবু আপনাদের থানায় যেতে হবে। এজাহার দিতে লাগবে। একটা লোক দোষী কিনা প্রমাণ নেই তাকে এভাবে মারতে পারলেন?

দাসজী বলে—আগে বিচার করুন—তবে তো সাজা। তা নয় এসব কি?

জনতা গর্জে ওঠে—ওরা থানায় কেন যাবে? এজাহার নিতে হয় এখানেই লেন। নাহলে—

গর্জে ওঠে জনতা। দাসজী-মাধববাবুরা চমকে ওঠে। দারোগা-বাবুও এবার নিজের এলেম দেখাবার জন্য বলেন,

—আপনারা শান্ত হয়ে কাজ করতে দেন। নাহলে আমিও ভিড় হঠাতে বাধ্য হবো।

কনেষ্টবলদের হাতের রাইফেলও তৈরী।

ওই জনতাও এবার রুখে উঠতে চায়। রূপেনই বাধা দেয়।

—না! তোমরা শান্ত হয়ে যে যার কাজে যাও। আমরা আসছি থানা থেকে ফিরে।

জনতা কথাটা ঠিক যেন মানতে পারে না। মাধববাবু, দাসজীদের তারা চেনে। আজ ওই আগুন লাগানোর মূলে যে ওরা—আর ওদের নিরাপত্তার জন্য, সুনামের জন্যই চোরা শম্ভুকে বাঁচানো দরকার সেটা বুঝেছে ওরা। তার জন্য রূপেনদের এই অপবাদ দিতে ছাড়বেনা তারা। ওই জনতা কি যেন বলতে চায়।

পুলিশও তৈরী। রূপেন চমকে ওঠে। রক্তপাতই ঘটবে। তাদের সব কাজ পিছিয়ে যাবে, এই শক্তিমানরা তাই চায়। রূপেন-সন্তোষ বলে—তোমরা চুপ করো। যে যার কাজে যাও।

ক্ষুব্ধ জনতার সামনে দিয়ে ওদের নিয়ে চলেছে পুলিশ বাহিনী।

প্রতিমাও খবরটা পেয়ে এসে পড়েছে। ভবতোষবাবু ওদিকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আজ ওই হাজারো মানুষের মুখেচোখে কি কাঠিন্য বেদনার আভাস ফুটে ওঠে।

—রূপেন ! একি হ'ল রূপেন ?

রূপেন মায়ের ডাকে চাইল। মা এগিয়ে আসে। তার একমাত্র সন্তানকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন, কিন্তু ঘরের স্বপ্ন সার্থক হয়নি। যাঁরা হারিয়ে গেছে, আজ রূপেনকেও এভাবে মিথ্যা অপরাধে পুলিশে যেতে হবে তা ভাবেনি প্রতিমা। মায়ের বুক হাহাকার করে ওঠে।

রূপেন বলে,

—কেঁদোনা মা ! এতটুকু মিথ্যা দিয়ে একটা বড় সত্যকে আটকানো যাবে না। নিরু-শশীপদ তোরা রইলি, যদি আমাদের ফিরতে দেরী হয় কাজ যেন বন্ধ না থাকে।

দারোগাবাবু চারিদিকে স্তব্ধ জনতার বেষ্টনী থেকে তাড়াতাড়ি বের হবার জন্য তাড়া দেয়—চলুন রূপেনবাবু। ষ্টেটমেণ্ট দিয়েই ওরা ফিরে আসবেন।

জনতাকে যেন স্তোকবাক্য দিচ্ছে ওরা।

জয়ধ্বনি ওঠে হাজার কণ্ঠে। জয়ধ্বনির শব্দে শান্ত জনপদের আকাশ বাতাস গম গম করে ওঠে। নোতুন এক জীবন যেন তাদের স্বীকৃতিকে সোচ্চার ধ্বনি তুলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

লাবণ্যও পায়ে পায়ে বড় বাড়ির দেউড়ি পার হয়ে বের হয়ে এসেছিল, ওই মহলের কুলবধূদের রীতি নেই প্রকাশ্যে বের হবার। আজ ব্রজদুলালবাবুর স্ত্রী—এই বাড়ির রাণীমা বের হন নি। কিন্তু লাবণ্য আজ থাকতে পারেনি।

প্রতিমা অবাক হয় লাবণ্যকে দেখে—বৌমা ! তুমি ?

লাবণ্য বলে—এতবড় মিথ্যার খেলা যেখানে সেখানে সব বাধাও মিথ্যা হয়ে যায় ! তাই দেখতে এসেছিলাম ব্যাপারটা কাকীমা।

মাধববাবু, দাসজী-এককড়ি দে আরও অনেকে বেশ খুশি হয়েই ফিরছে। লাবণ্যকে দেখে দাঁড়ালো মাধববাবু।

—তুমি !

লাবণ্য বলে ওঠে—তোমাদের এমনি জয়ের মুহূর্তে ঘরে বসে

থাকতে পারলাম না। তাই এসেছিলাম।

মাধববাবু বলে—কাজটা ঠিক করো নি! এটা কলকাতা নয়!

লাবণ্য জানায়—তার উত্তর পরে দেব। তবে সাবধান করে যাই এই জয়টাকে টিকিয়ে রাখতে না পারলে বিপদই বাড়বে। সেই বিপদ রোখবার জন্য তৈরী থাকো।

লাবণ্য দাঁড়ালো না। দেউড়ির ওদিকে চলে গেল ঘোমটা টেনে। ব্যাপারটা ব্রজদুলালবাবুরও নজর এড়ায় নি। কথাটা তিনিও শুনেছেন। আজ মাধবদের এই কাজটাকে তিনিও সমর্থন করতে পারেন নি। বলেন,

—বোধ হয় ভুল করলে মাধব। বৌমা ঠিকই বলেছেন।

দাসজী ব্যাপারটাকে হাল্কা করার জন্য বলে।

—তাই বলে আজ ওকে খুন করবে, কাল তাকে মারবে, এসব সহ্য করা ঠিক? আপনিই বলুন বড়বাবু! আইন শৃঙ্খলা নেই? তারা দেখুক কে দোষী কে নির্দোষ, তোরা কে বাপু?

ব্রজবাবু বলেন—আইন ন্যায়নীতি যখন কেনা বেচার পশরায় পরিণত হয় তখন বিপদ ঘনিয়ে আসে শ্রীধর। ভয় সেইখানেই।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মত। থানাতে এজাহার নেবার পর শম্ভুকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আর পুলিশের গাড়িতে রূপেন-সন্তোষকে পাঠানো হয়েছে সদরের পুলিশ হেপাজতে।

আটচালায় গ্রামের লোকজন জমেছে। আজ এতদিনের চেষ্টায় তারা গড়ে তুলেছে একটা প্রতিষ্ঠান, সাধারণ মানুষ দেখেছে আশার আলো। ভাঙ্গা বাঁধের বুক আবার ভরাট হচ্ছে, বিস্তীর্ণ বালুঢাকা জমির বালি সরানোর কাজ শেষ, তাকে রক্ষা করার জন্য বাঁধও হচ্ছে। আর ওই হাজারো মানুষ দাসজী-এককড়ি মহাজনদের দ্বারস্থ হয় নি, সবকিছু সম্ভব করেছে রূপেনের মত একটি তরুণ, সন্তোষের মত সর্বহারা একজন।

বুড়ো যতনের চোখের সামনে বন্যার সেই দুঃসহ যন্ত্রণাময়

দিনগুলোর ছবি ফুটে ওঠে। নিশ্চিত অনাহার আর মৃত্যুর মুখ থেকে সেদিন বাঁচিয়েছে গ্রামের বিপন্ন মানুষকে ওই রূপেন সন্তোষরা। বন্যার পর যেভাবে হোক খাবার, আশ্রয় দিয়েছে। সামনের বালুঢাকা মাঠকে আবার বালি তুলে নোতুন ধানের সবুজে ভরে তুলেছে ওই তরুণের দল।

শঙ্করী কেন গ্রামের অনেক মেয়েরা কদম ঠাকরুণ অবধি দেখেছে তাদের বিপদে কারা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, নিঃস্বার্থ সেবায় তাদের মান সম্মান বাঁচিয়েছে। ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচিয়ে আজ কাজের সন্ধান দিয়েছে।

দাসজী-মাধববাবুরা কোনদিনই তাদের জন্য এসব করে নি, রাতের অন্ধকারে দাসজীর বাহন ওই গিরিধারী পানু চোরা শম্ভুরা তাদের মান সম্মান নিয়ে কেনা বেচার চেষ্টা করতো।

শঙ্করীর মনে পড়ে রাতের অন্ধকারে রতন বাইরে কাজে ব্যস্ত, ওরাই ঘুর ঘুর করতো। ইশারায় ডাকতো মেয়েদের।

আজ সেই উৎপাত থেকে বেঁচেছিল তারা সদ্য জাগ্রত একটি সমাজের আশ্রয়ে এসে। রূপেন-সন্তোষরা ছিল সেই সমাজের নেতা। বাঁচার আশ্বাস পেয়েছিল তারা।

আজ তাই যেন লোভী মানুষগুলো চরম অপবাদ দিয়ে ওদের সরিয়ে দিয়েছে। জেলের পাঁচীলের আড়ালে বন্দী করে রাখতে চায়, যাতে তাদের সেই শোষণ আর অত্যাচারটাকে আবার কায়েম করতে পারে এ মাটিতে।

শঙ্করীর চোখে ওই শয়তানদের ছবিগুলো ভেসে ওঠে।

—কি হবে পিসী ?

কদম বুড়ি গর্জে ওঠে—থানায় যাবো। দরকার হয় সদরে যাবো সব্বাই। এ্যামন করে অনাচার করবেক, পুড়িয়ে মারতে যাবেক সোনার চাঁদদের, আবার উল্টে বলে চোর আগুন খেকোকে কেনে মারবেক ? কি বলছিস তুরা ? হ্যারে মরদের দল ? মায়ের দুধ

খাসনি তুরা? মুখ বুজে থাকবি ইয়ার পরও?

বারুদের স্তুপে যেন আগুন ধরিয়েছে ওই শীর্ণ কদমবুড়ি।

এতদিনের সঞ্চিত বিক্ষোভ অপমান বঞ্চনা আজ ওদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক সহ্য করেছে তারা, পথ তবু পায়নি।

আজ দেখেছে দুটি মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে, নিঃশেষ ত্যাগে তারা বাঁচার দাবী ফিরে পেয়েছে। আদিগন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বালুচর, প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে তারা ওই বন্দী মাটিকে মুক্ত করে সকলের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে ধানসবুজ করে তুলেছে।

ওই মাধববাবু, দাসজীদের তাই আক্রোশ। তাদের এতদিনের সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরিয়েছে। তাই তারাও শেষ আঘাত হেনেছে। মিথ্যা অভিযোগে তাদের বন্দী করেছে।

গর্জন করে ওঠে জনসমুদ্র—মাধববাবু, দাসজীকে এর জবাব দিতে হবেক। তারা না ছাড়িয়ে আনে আমরা সব্বাই পাঁচগায়ের লুক মিলে সদরে যাবো।

নিরু ঘোষ, শীতল আজ এগিয়ে এসেছে। তারাও মত দেয়।

—তাই যাবো। এর জবাব চাই হে!

দিকে দিকে ওই খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

সবুজ ধানের চারায় হাওয়া কাঁপে। ওদিকে মাধববাবু, দাসজী এককড়িদের জমির অনেকটাই এখনও বালির নীচে, তাদের সমবায়ের কাছে পৃথক পৃথক জোতদাররাও কোণঠাসা হয়ে গেছে।

আজ প্রতিটি মানুষ যেন বুঝেছে কে তাদের আপন কে তাদের পর। তাই জেগে উঠেছে ওরা।

—দাসজী-মাধববাবুর জুলুম চলবে না। জবাব চাই!

নীরব কণ্ঠস্বর আজ কি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ব্রজদুলালবাবু হতাশ হয়ে উঠে এসেছিলেন আটচালার মিটিং

থেকে। মনে হয়েছে ওই দাসজী-মাধবরা নয়, সমাজের বুকে চিরন্তন একটা অশুভ শক্তি বার বার চেয়েছে সামগ্রিক কল্যাণকে পায়ে দলে মাড়িয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখতে।

তাই এবারও এত চেষ্টা, এত আন্তরিকতা দিয়ে গড়ে ওঠা এই সমবায়কে ওরা শেষ করে দেবে।

রূপেন-সন্তোষদের থানা থেকে সদরে চালান করেছে। শম্ভুর মত একটা লোককে তাদের প্ররোচনাতে নাকি খুন করে ফেলার আয়োজন হয়েছিল।

দাসজী-এককড়ি-নবীন-আরও অনেকে এসেছে মাধববাবুর প্রাসাদে, ওরা নিশ্চিন্ত হয়েছে। আকাশের বুকে জমা সব মেঘ কেটে গেছে, এসেছে ওদের কাছে ঝকঝকে রোদের আভা নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠার স্বাদ।

ব্রজদুলালবাবুকে দেখে চুপ করে গেল দাসজী।

মাধববাবুও অবাক হয়। বড়কর্তা বিশেষ এখানে আসেন না। মাধববাবু বেনামীতে তার জমি জায়গা দুর্গাপুরের সব এলাকা কিনে নেবার পর থেকে বড়বাবু দূরেই থাকেন। আজ তাই ওকে আসতে দেখে মাধববাবুও অবাক হয়!

—বসুন কাকা!

লাবণ্যও খবর পেয়েছে বড়কর্তার আসার। সেও বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, হঠাৎ কিছুদিন থেকে লাবণ্য দেখেছে গ্রামের বুকে সাধারণ মানুষের মনে পরিবর্তনের সাড়া। চাতরের সেই ঘটনাটা তুমুল আলোড়ন এনেছে।

ব্রজবাবু বলেন—একটা জরুরী কথা ছিল মাধব!

অর্থাৎ তিনি সেই কথাটা বোধহয় দাসজীদের সামনে বলতে চান না।

মাধববাবু বলেন—কি এমন জরুরী কথা? এখানেই সেটা বলতে পারেন।

ব্রজবাবু একটু অবাক হন। আজ তাঁর এই ইঙ্গিতও বুঝতে চায় না মাধব। নিজেদের মধ্যে সেই সম্পর্কটুকুকেও অস্বীকার করে ওই স্বার্থান্ধ মানুষগুলোকেই বেশী স্বীকৃতি দিতে চায়। ব্রজদুলালবাবু উঠে পড়েছেন।

—চললেন? কি যেন বলতে এসেছিলেন!

মাধববাবুর কথায় ব্রজদুলালবাবু জানান—সে কথার কোন গুরুত্ব তুমি দেবে না, তবে বলবো মাধব ওই চোরা শম্ভু যে বদ্ধ ঘরে একজনকে পুড়িয়ে মারার জন্য গেছল সেটা তোমাকে জানানো হয়নি। যারা সেই ষড়যন্ত্র করেছিলেন তারা তোমাকেও জানায় নি। অথচ তাকে মারার অপরাধে মিথ্যা করে রূপেন সন্তোষকে জড়িয়ে পুলিশ হেপাজতে পাঠালে—কেস করে। এটা ঠিক হয় নি!

দাসজী চমকে ওঠে। এককড়িও চাইল দাসজীর দিকে।

মাধববাবু বলেন—আইন সেটা দেখবে, বিচারে দোষী হলে সাজা পেতেই হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে।

ব্রজদুলালবাবু বলেন—কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী দিতে কাউকে পাবে না মাধব। আগ বাড়িয়ে জোর করে ঘা দিতে গিয়ে যদি নিজেদের ঘা খেয়ে ফিরে আসতে হয় সেই পরাজয়ের দাম দিতে হবে অনেক বেশী। এতবড় পরিবর্তনকে রুখতে পারবেনা, মেনে নিয়ে এগিয়ে এসো—সুস্থ পরিবেশে কিছু করা যাবে।

মাধববাবু দেখছে ওই বৃদ্ধকে। আজ সব হারিয়ে ওই লোকটা যেন বাধ্য হয়ে ওই পরিবর্তনকে মেনে আপোস করে বাঁচার শেষ চেষ্টা করছে। তার এ দৈন্য আসে নি। মাধববাবু জানে উপবের সমাজে তার প্রতিপত্তি আর কেরামতির খবর। তাই এখানে বসেই ওদের সদরে আটকাবার ব্যবস্থা করেছে। এবার গিয়ে ওখানে কায়েমী ব্যবস্থা করবে। এই প্রতিষ্ঠাকে সে হারাতে চায় না, আপোষ নয়, সেও প্রতিঘাতই হানবে।

মাধববাবু বলে—অন্যায়কে মেনে নিতে পারবোনা। দিন

বদলের ধমকানিকে আমিও ভয় করি না কাকা। এ আপনিই ভুল করছেন।

ব্রজবাবু উঠে পড়েন। মুখে চোখে হতাশার মালিন্য। বের হয়ে আসতে সামনে লাবণ্যকে দেখে চাইলেন। বিরাট প্রাসাদ আজ স্তব্ধ। এককালে গমগম করতো। কতো মানুষের সাড়া উঠতো। আশ্রিত-অতিথিদের সমাগম ছিল।

আজ পায়রাগুলোর শব্দ ওঠে।

—কাকাবাবু! লাবণ্যের ডাকে দাঁড়ালেন ব্রজবাবু।

—উনি কি বললেন? লাবণ্য এগিয়ে আসে। সে সবকথাই শুনেছে।

ব্রজবাবু বলেন—এসব কথা ও শুনবে না মা। কিন্তু আমি ভুল বলছি না। এত ছিল, সব গেছে। এতো যাবারই পালা। চাকা ঘোরে—মাটি থেকে উৎখাত হয়ে বেনিয়া হয়ে বাঁচার নেশায় ওরা সব ভুলেছে মা। তাই কোন আপোষ ওরা করবে না।

লাবণ্য দেখছে মানুষটাকে। চলে গেলেন তিনি।

লাবণ্য কলকাতার-দুর্গাপুরের অতি আধুনিক জীবনকেও দেখেছে। বিকৃতির গরলে ভরা টাকার নেশায় হতবুদ্ধি সেই জীবন থেকে সে সরে এসেছিল পল্লীর নিভৃত সবুজ শান্তির মাঝে।

কিন্তু এ জীবনকেও ওরা লোভ আর পাপের গরলে নীল করে দিতে চায়, আর ওই সহজ মানুষগুলো চায় সহজ ভাবে বাঁচতে। তাই এই সংঘাত।

হাসির শব্দে থামল লাবণ্য। ঘরের ভিতর থেকে দাসজীর খ্যাঁক খ্যাঁকে গলার হাসির শব্দ ওঠে।

ও বলে—ঠিক বলেছেন ছোট কত্তা। বড়বাবু এখন ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে চায়। সব গেছে কিনা—

এককড়ি বলে—আপনি সঙ্গে আছেন জেনেই তো ওই রাতে সন্তোষটাকে ফর্সা করতে চেয়েছিলাম। তা ফস্‌কে গেল।

মাধববাবু বলে—এখন কিছু দিন ঘানি টানুক। ততদিনে সমবায়ের এই চাষীদের এক একটার নামে বাকীকর, ঋণের মামলা জুড়ে বসো। গরু বাছুর বের হলেই আমাদের জায়গায় নামবে, ধরে ধরে খোঁয়াড়ে দাও।

দাসজীও মাথা নাড়ে। ক্রমশঃ সব টিট হয়ে যাবে। শিকেয় উঠবে ওসব।

দাসজী বলে—বাঁধের কাজ শেষ হলে বাঁচি। তখন কাজও থাকবে না, আসতে হবে এখানেই। বর্গাদারীতে যে যে ব্যাটা নাম বসিয়েছে তাদের একছটাক ধান, টাকা কর্জ দেবে না।

নবীন ভটচায মাথা নাড়ে—ঠিক কথা। দেখবেন সব দফ রফ খতম হয়ে যাবে।

মাধববাবুর দুর্গাপুরের কারখানায় কি জরুরী কাজ আছে। তিনিও বের হয়ে যাবার আগে ওদের সাহস দিয়ে গেলেন।

—এসে ব্যবস্থা করছি দাসজী।

দুর্গাপুরের এই বিচিত্র কর্মব্যস্ত পরিবেশে অনেক আশা নিয়ে এসেছিল দ্বিজেন। কিন্তু দ্বিজেন ক্রমশঃ বুঝেছে সে মাধববাবুর কাছে ঠকেছে, ওই জল কাদায় ঘুরিয়ে আর কুলির হিসাব ঠকিয়ে কর্তাদের নানা উপায়ে খুশী করার জন্যই তাকে রেখেছে।

কুলি মেয়েরা তাকে আড়ালে বলে—মাগীর দালাল!

সেদিন খয়রামারি ক্যাম্পে কুলিরা রুখে ওঠে—মেয়েছেলেদের লিয়ে যেতে দিবনাই হে। মাগীর দালালি করে কতো পাও তুমি?

ঈশানসর্দার বলে—তুমি মাষ্টারী করতে না হে! এ্যা—সি ছিল মানুষের চাকরী, তা ছেড়ে . পয়সার লেগে ইসব কেনে করতে আইছো?

কথাটা দ্বিজেনও ভেবেছে। লজ্জায় অপমানে মুখ কালো হয়ে ওঠে। এর মধ্যে মাধববাবু মাইনেও কিছু দেয়নি। ইঙ্গিতে বলেছে

—লাড্ডু নাড়লেই গুঁড়ো পড়ে দ্বিজু, এত টাকার কাজ হচ্ছে, এদিক ওদিক করে নাও কিছু।

সেদিন পার্টিতে দ্বিজেন কোন মেয়েদের নিয়ে যেতে পারেনি। খালি জিপটা নিয়ে ফিরেছে। মাধববাবু এগিয়ে এসেছে আশা নিয়ে। জানে মাননীয় অতিথিদের নেশা চাপলে তখন দিশেবিশে থাকবে না। মদের নেশার ঘোরে সব মেয়েই তখন এক হয়ে যায়। পরিণত হয় তাদের মত মাংসাশী প্রাণীদের কাছে শুধুমাত্র নারী মাংসে। তখন ওই কামিনদের দিয়েই এতকাল চালিয়েছে সে। পার্টি জমে উঠেছে।

ধীরা তখন নোতুন কর্তাদের সঙ্গে হাসির তুফানে ভেসে চলেছে।

দ্বিজেনের ওই আলো ঝলমল স্বপ্নজগতে প্রবেশাধিকার নেই। সে অন্ত্যজ। আর দ্বিজেনের ওখানে যাবারও কোন ইচ্ছে নেই।

বার বার মনে হয় সে অন্যায়ই করেছে। ভুলই করেছে এখানে এসে, আর ধীরার বেশবাস তার ওই জীবনে সেও ভাবিত। গ্রামের কথাও কিছু কিছু শোনে।

ছায়াময় গ্রাম, রূপেন সন্তোষ তাদের এগিয়ে যাবার কথা এতদূরেও ভেসে আসে। নিজেকে অপরাধীই মনে করে দ্বিজেন। আর এই অপরাধবোধ আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে মাধববাবুর ব্যবহারে।

মাধব এগিয়ে এসে খালি জিপ থেকে দ্বিজেনকে নামতে দেখে বলে—কয়েকজন শক্ত সমর্থ কামিনকে আনতে বলেছিলাম ওদের আদি-বাসী নাচ দেখাবো বলে। তাদের আনোনি?

দ্বিজেন জানে ওই নাচের নাম করে এর আগেও কয়েকজনকে ভুলিয়ে এনে কি সর্বনাশ করেছে তাদের এই মাধববাবুই।

আজ দ্বিজেন বলে—ওরা জেনে গেছে সব। তাই জবাব দিল, আসবে না।

মাধববাবু গর্জে ওঠে—আর তুমিও অমনি চলে এলে? কেন? মেয়েছেলের এত অভাব? ইডিয়ট কোথাকার। যাও—যেখান

থেকে পারো কয়েকজনকে আনো।

দ্বিজেন চুপ করে থাকে। তার সব মনুষ্যত্ব বিবেক যেন চীৎকার করে ওই ঘৃণ্য লোকটার কথায় প্রতিবাদ করতে চায়। গর্জে ওঠে মাধববাবু।

—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও—

প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে দ্বিজেন—না। আমি যাবো না। এ কাজ আমি করবো না।

—এঁ্যা! মাধববাবুও মদের নেশায় রঙ্গীন হয়েছিল। এবার দ্বিজেনের গালেই চড় কসেছে—অপদার্থ কোথাকার।

টলছে মাধববাবু। দ্বিজেনের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। হয়তো জবাব সেও দেবে। তার আগেই মাধববাবুর ম্যানেজার এসে পড়ে। সে এসব কাজে পটু! ব্যাপারটা সেইই সামাল দেয়।

—আপনি যান। আমি ব্যবস্থা করছি।

ম্যানেজার মাধববাবুকে ভিতরে নিয়ে এসে একটা বড় পেগ ধরিয়ে দিয়ে নিজেই এবার সব ভার তুলে নেয়।

বাইরের অন্ধকারে তখনও দ্বিজেন ফুঁসছে। আজ মনে হয়, তার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে। প্রাচুর্য নয়, আজ সে সেই দারিদ্রকে মেনে নিয়েই মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। এখানে নয়, ফিরে যাবে সে সেই সবুজ গ্রামেই। প্রতিরোধ গড়বে সেখানেই। ভুল করেছে—সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে সে।

উৎসব শেষ।

সকালেই মাধববাবু কর্তাদের খুশী করে তাদের নিয়ে চলে গেছে। সারা বাংলোয় ছড়ানো শূন্য বোতল, ভাঙ্গা গ্লাস, প্লেটের টুকরো, ফুল আর ম্লান ফুলের তোড়া। কাল ওই দিয়ে সম্মানিত করেছিল অতিথিদের, আজ সেই সম্মানের চিহ্নগুলোকে গরু ছাগলে খেয়ে চলেছে। মনে হয় ওদের দেওয়া সম্মানও এমনি অর্থহীন

অন্তঃসারশূন্য।

দ্বিজেন কাল রাতে কিছুই খায় নি। আজ সে মনস্থির করে ফেলেছে, ফিরেই যাবে এখান থেকে।

কেরানীবাবু হরিশ রায় বলে,

—খামোকাই মাথা গরম করছেন দ্বিজবাবু, লেগে থাকলে গতি একটা হবেই। লেখাপড়া, জানা লোক আপনি।

দ্বিজেন বলে—তাই বিবেকে বাধছে হরিশবাবু! যেতেই হবে।

ধীরার চোখে তখনও সেই রাত্রির ঘোর রয়ে গেছে। দেহটা ক্লান্ত। তবু মনে তখনও রঙ্গীন স্বপ্ন রেশ। আজ টাকাও সে পেয়েছে। সামনে আরও অনেক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত। কাল মিঃ ঘোষও কথা দিয়েছেন তাদের কোম্পানীতেই নিয়ে যাবেন কলকাতায়।

মাধববাবুর ওই অপিস থেকেই সে এবার বৃহত্তর জগতে এগোবে। কলকাতায় যাবে—গাড়ি, সাজানো ফ্ল্যাট, ফোন সবই পাবে।

হঠাৎ দ্বিজেনকে ঢুকতে দেখে চাইল।

দ্বিজেন দেখছে ওকে। পরণে হালকা নাইটি ধীরার যৌবন মত্ত দেহের এই আকর্ষণ তাকে সেদিন ঘরছাড়া করেছিল, দুজনে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়েই স্বার্থপরের মত মাধববাবুর আশ্রয়ে এসেছিল। আজ সব কেমন বিকৃত হয়ে গেছে।

ধীরা বিছানায় উঠে বসল। কাঁধ—বুকের মাংসল প্রকাশটাকে ঢাকার তেমন প্রয়োজনও বোধ করেনা সে। ধীরা বলে,

—কি ব্যাপার? হাঁ করে কি দেখছো?

দ্বিজেন বলে—তোমাকে।

—আগে দেখোনি, না? অবশ্য দেখার চোখও ছিলনা তোমার!

ধীরা হাসছে। নিজের দেহটাকে সে আজ সাজিয়ে পশরা করে তুলেছে।

দ্বিজেন বলে—আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে! তাই বলছিলাম

এখানে তোমার থাকাও ঠিক হবে না।

—তাই নাকি! চলে যাচ্ছো? ধীরা হাল্‌কা স্বরে বলে—অন্য কোথায় চাকরী পেলে? অবশ্য যদি বলো তোমাকেও যেতে হবে, আমার জবাব কিন্তু এখনই পাবে না। তা চল্লে কোথায়?

—গ্রামে! গ্রামেই ফিরে যাবো। সেখানে অভাব থাক তবু সম্মানের সঙ্গে বাঁচার চেষ্টা করবো।

দ্বিজেনের কথায় হেসে ওঠে ধীরা! সাবা শরীর বুক ওর নিটোল দেহ কাঁপছে হাসির তোড়ে—ফুল! রাবিশ! পিছনে ফেরার পথ আমি জানিনা দ্বিজু। তোমাকেও বলবো—বড় হতে গেলে এ সমাজে কিছু পেতে গেলে এখানে থেকেই লড়াই করতে হবে। আর নীতি বিবেক সম্মান এগুলো দুর্বলতা। এর কোন দামই নেই।

দ্বিজেন দেখছে মেয়েটিকে।

আজ সেইই যেন গ্রামের একটি সহজ মেয়েকে এনে এই সোনা টাকার জগতের নেশায় মাতাল করে দিয়েছে। ওদের লোভী হাত তাদের সব কিছুই কেড়ে নিয়েছে আর কোথাও কোন আশ্বাস কোন ভবিষ্যৎকে রাখেনি।

দ্বিজেন বের হয়ে এল। আজ নিঃস্ব হয়েই ফিরছে সে। ধীরাও তার কাছে আজ অচেনা। তাকেও হারিয়েছে দ্বিজেন! দ্বিজেনের মনে হয় ওই লুটেরার দল তার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে আজ পথেই বের করে দিয়েছে তাকে। এ যুগের এই নিঃস্বতার যন্ত্রণা নিয়েই বাঁচতে হবে তাকে। এই তার বিশ্বাসঘাতকার পুরস্কার। চলেছে সে যদি অন্যত্র বাঁচার আশ্বাস মেলে, তারই সন্ধানে।

রূপেনও বুঝতে পারেনি যে গ্রামের অন্ধকারে তারা যে আন্দোলন যে সমবায়ের কাজ চালিয়েছে তার পিছনে বেশকিছু মানুষের নীরব স্বীকৃতি রয়েছে।

থানা থেকে সদরে পাঠানোর ব্যাপারে অবাক হয়েছে রূপেন।

সন্তোষও ব্যাপারটা দেখেছে। বুঝেছে এক মিথ্যা চক্রান্তেই জড়ানো হয়েছে তাদের। সন্তোষ বলে,

—আমি স্বীকার করে নিই সব কিছু, আপনাকে ছেড়ে দেবে এরা। এদেব নজর আমার উপরই।

রূপেন বলে—তার কোন গ্যারান্টি নেই সন্তোষ। ওরা যা পারে করুক। সদরেই চলো। তবু সেখানে দেখা যাক্ কি হয়।

দারোগাবাবু বলেন—হাসপাতালের খবরটাও ওখানেই পেলে কোর্টে পেশ করা হবে।

সদরে মনোহর বসন্ত উকিলকে দেখে অবাক হয় রূপেন। সহপাঠী বন্ধু ওবা। সহরে প্রায়ই আসতে হয় রূপেনদের। সব খবরই পেয়ে থাকে এবা।

মনোহর বলে—তোদেব এত খবব বাখি আব এটুকু খবব পাবো না? তাহলে এতদিনে একটা কেসে জড়িয়েছে বল?

রূপেন বলে—তাই দেখছি।

মনোহর বসন্তই নয়, সহরের অনেকেই এসেছে কোর্টে। এখানেই তাদের এত বন্ধ সমর্থক ছিল জানে না। মনোহবই ওদের হয়ে তখুনিই জামিনের ব্যবস্থা করে।

বসন্ত বলে—এব পর দেখা যাক ওদেব মামলা কোথায় দাঁড়ায়। তবে জেনে রাখ এই শুরু হ'ল। কোর্টকাছারি থানাপুলিশ এবার অনেক হবে।

রূপেন বলে—তবু থামবো না বসন্ত। ভরসা পেলাম—এসব সামলাতে তোরা তো রয়েছিস।

যেন বারুদের স্তূপে আগুন লেগেছে। এতদিন ধরে তিল তিল করে জমে উঠেছিল অনেক বিক্ষোভ, প্রতিবাদের মৌনতা। গ্রামের ওই মানুষগুলো অবাক হয়েছিল সেদিন ওই আগুন দেবার ব্যাপারে। 'লোকটাকে হাতেনাতে ধরার পরও দেখেছে বিচার তো

হয়ই নি, উল্টে সন্তোষ-রূপেনকেই মাধববাবুর দল এ্যারেষ্ট করিয়ে সদরে পাঠিয়েছে।

ভবতোষবাবু আরও দু-একজন সদরে গেছেন ওদের জামিনের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু আজ গুমরে ওঠে মানুষগুলো নীরু, রতন, হরিপদ, কালোশশী, অনেকেই জমা হয়েছে, মাঠে এসেছে সবুজ ধানে সোনা রং—এসেছে আখ ক্ষেতে সবুজ পূর্ণতা। যারা এই বালির পাহাড় তুলে তাদের জন্যে এনেছে এই সবুজ আশ্বাস সেই লোকদের দাসজী-মাধববাবুর দল আজ ছিনিয়ে নিতে চায় তাদের মাঝ থেকে। যাতে এসব বানচাল হয়ে যায়।

কদম ঠাকরুণও ফুঁসে ওঠে।

—অতো বড় অন্যায় করবেক—তুরা রা কাড়বি নাই? তুরা মরদ!

নিরু গর্জে ওঠে—জবাব দে তুরা! চুপ করে থাকবি?

...মাধববাবুর জিপটাকে আসতে দেখা যায়, দুদিন পায় নি ওরা তাকে। আজ দেখছে বড় রাস্তা থেকে মাঠের সড়ক ধরে ধুলো উড়িয়ে বিজয়গর্বে হর্ণের হুঙ্কার তুলে ফিরছে মাধববাবু!

দাসজীও খবর রেখেছিল, তাছাড়া ভয়ে ভয়েই ছিল দাসজী। গিরিধারী গুপী তার অনুচরদের পাহারায় রেখেছিল। শুনেছে আজকের জমায়েতের কথা। তাই মাধববাবুকে ছাদ থেকে গ্রামের দিকে আসতে দেখে দাসজী কি ভরসা নিয়ে এগিয়ে যায় ওই বড় বাড়ির দিকে।

একদিনের মধ্যেই শ্রীধরদাস দেখেছে গ্রামের সেই মানুষগুলোকে বদলে যেতে, যেন ঝড় ওঠার আগে কি স্তব্ধতা নেমেছে!

এতদিনের চাপা পড়া সেই বিক্ষোভ হাজার কণ্ঠে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। মুখরিত হয়ে ওঠে জনপদ, ধ্বংসস্তূপের বুক থেকে একটা নোতুন সত্তা কি তেজদৃপ্ত রূপ নিয়ে ঠেলে উঠেছে, রুদ্র সন্ন্যাসীর রুক্ষতা আর কাঠিন্য তাকে সোচ্চার করে তুলেছে। গ্রামের আশ-

পাশের গ্রামের মানুষগুলো মাঠ ছেড়ে সামিল হয়েছে ওই মিছিলে, এগিয়ে চলেছে কদম বুড়ি

নীরু ঘোষ চীৎকার করে—মাধববাবু জবাব দাও!

কে চীৎকার করে—জুলুমবাজী চলবেনা।

লোকজন ছেলে মেয়েদের ভিড়ও বাড়তে থাকে।

এতদিন পর ওরা আজ তাদের ঘৃণ্য প্রতিবাদের ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে ওই মাধববাবুর সামন্ততান্ত্রিক আমলের পুরোনো প্রাসাদের দিকে।

চারিদিকে তখনও মাধববাবু, দাসজী, পানুদাস, গুপীনাথদের জমিতে ঠাঁই ঠাঁই বালির পাহাড় রয়ে গেছে। রুক্ষ বালির ওই বন্ধ্যা মাটির উপর দিয়ে হাজারো মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে এগিয়ে আসছে এই দিকে।

এ দৃশ্য মাধববাবু, শ্রীধর দাসরা দেখেনি। দেখেনি ওদের নুইয়ে পড়া মাথা—জীর্ণ বুক টান করে এমনিভাবে প্রতিবাদ জানাতে। দাসজীর বাহন গিরিধারী গুপীনাথ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জানায়।

—ওরা এখানে চড়াও হবে ছোটবাবু! সন্তোষ-রূপেনদের ধরিয়ে দিয়েছেন তাই।

চমকে ওঠে দাসজী—তাই নাকি! চড়াও হবে, বাড়ি লুট করবে?

মাধববাবুও দেখছেন ওই জনতাকে। রোদে পুড়ে ওরা এগিয়ে আসছে, চীৎকার শোনা যায় তাদের। মাধববাবু গর্জে ওঠেন।

—এতবড় সাহস ওদের? দারোয়ান মাধো সিং দেউড়ি বনধ করো। দরকার হলে লাঠি চালাবে, আমার বন্দুক—

দাসজী বলে—দেউড়ি বন্ধ করে দিন, তারপর লাঠি বন্দুকের কথা ভাবা যাবে! গুপীনাথ, পিছনের বাগান দিয়ে তুই দৌড়ে থানায় চলে যা!

গুপীনাথ বাইরে ওদের মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছে। তাই ইতিউতি করে—যদি ধরতে পারে গ?

—চেঁচিয়ে ওঠে মাধববাবু—ধরতে পারবে না। তুই চলে যা, যা।

গুপী ধমকের চোটে পিছনের খামারবাড়ি দিয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে দৌড়লো। বাইরে তখন জনতা এসে হাজির হচ্ছে বন্ধ দেউড়ির সামনে।

এতকাল এই শক্ত পাথরের দেউড়ির সামনে ওই কাছারিবাড়িতে তাদের পূর্বপুরুষ, তারাও এসে মাথা নুইয়েছে, মুখ বুজে সহ্য করেছে অনেক অত্যাচার। মেয়েদের অনেকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে রাতের অন্ধকারে অনেক অপমান অত্যাচারের কাহিনী। এখান থেকে সব হারিয়ে ফিরেছে তারা এতকাল।

আজ সেই পাথরের শেওলাপড়া প্রাচীরের সামনে ওরা এসে দাঁড়িয়েছে পুঞ্জীভূত প্রতিবাদের ঢেউ-এর মত। চীৎকার করে ওঠে।

—জুলুমবাজী নিপাত যাক। মাধববাবু জবাব দাও! শ্রীধর দাস জবাব দাও!

সেই জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর যেন মহাকালের গর্জনের মত আজকের সব স্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে আকাশ বাতাস ভরে তুলেছে। জেগে উঠেছে নোতুন মানুষের ভবিষ্যৎ। মাধববাবু, দাসজীর দল ওই শেষ দুর্গের কোণে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সেই দুর্গও আজ আক্রান্ত!

রাধারাণী ক'দিন গ্রামে ছিল না। নিজের অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিল বর্দ্ধমান শহরে। ক'দিনেই রাধারাণী নিজেকে নোতুন করে চিনেছে। আজ সে জেলার একটি পরিচিত নাম। কাগজে ছবি আর কীর্তনের অকুণ্ঠ প্রশংসা বের হয়েছে।

আরও বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়েছে। জীবন শুধু সবকিছু ছিনিয়েই নেয় না—দেয়ও অনেক কিছু।

ভজন দাসও তৃপ্ত। তার ঘরাণীর কীর্তনের আজ পরিচিতি হয়েছে। রাধারাণী যে এত ভালো গাইবে তা ভাবেনি সে।

ব্যাং, দোহার হরিচরণ, অন্যান্য সকলেই বেশ খুশি। এবার গান

গেয়ে তারাও ভালো পয়সা-নাম-যশ পেয়েছে। আরও অনেক বায়না এসেছে। কয়েকদিন পর থেকে আবার বের হবে।

রাধারাণীর মনেও খুশীর সুর জাগে!

তাকে আরও নাম করতে হবে। ঘর বাঁধবে সে। আজ বাবাকেও বলতে তার বাধা নেই। এতদিন যে পরিচয়টাকে রাধারাণী প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে পারে নি, আজ সে তা পারবে।

ভজন দাসও খুশী হবে। মেয়েকে শুধু প্রতিষ্ঠিত নয় ঘরবাসী হতে দেখলে সেও শান্তি পাবে।

বাসটা এসে থেমেছে বড় রাস্তায়। চায়ের দোকানে কিছু লোকজন উত্তেজিত ভাবে কি আলোচনা করছে। সামনেই সমবায়ের মাঠে সবুজ ধান মাথা তুলছে। নোতুন ভাবে এই ধানের চাষ হচ্ছে এদিকে। লোকজন সকলেই সন্ত্রস্ত।

ব্যাং শুধোয়—কি ব্যাপাব গো?

স্তব্ধ গ্রামের দিক থেকে আসছে হাজারো কণ্ঠের চীৎকার। কোলাহল। সারা গ্রাম যেন একটা প্রচণ্ড কিছুর জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

চায়ের দোকানদারই বলে—রূপেনবাবু সন্তোষদেব সদরে পুলিশ এ্যারেষ্ট করে রেখেছে। তাই সারা গেবাম আশপাশের গেবামের লোক গিয়ে আটক করেছে মাধববাবুর বাড়ি। দাসজী-এককড়ি-পতো-যেতো সবাই ওখানে সেধিয়েছে গো।

চায়ের দোকানের বাচ্চা ছেলেটা এর মধ্যে গ্রামের দিক থেকে একটা কঞ্চি আশমানে তুলে নিশানের মত করে দৌড়ে এসে খবর দেয়—জগঝম্প কাণ্ড বাধবেক লাগছে। ছোটকত্তা দারোয়ান দিকে হুকুম দিচ্ছে দরজা ভাঙ্গতে এলে গুঁলাই দিবি।

ইয়ারাও হাঁকাড়ি যা পাড়ছে গ! বাস্ রে!

—তাই নাকি! চমকে ওঠে রাধা। এ্যারেষ্ট করেছে ওদের!

রাধারাণীর কানে আসে সমবেত জনতার চীৎকার। গ্রামের

মেয়েরাও আজ পিছিয়ে নেই। তারাও সামিল হয়েছে ওই অবরোধে।

ভজন দাস অবাক হয়—কোথায় যাচ্ছিস তুই!

রাধারাণী আজ নিজের জগৎকে ফিরে পেয়েছে। সব খ্যাতি, নিজের স্বামী, ঘর, সবকিছু ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখে সে। বঞ্চিত হয়ে ভাগ্যের পরিহাস বলে সব বঞ্চনাকে মেনে নিয়ে বাঁচার কথা সে মেনে নিতে চায় না। সেও চায় নিজের সব অধিকার অর্জন করতে। তাই আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে সরে গিয়ে নয় তার সামিল হয়েই বাঁচবে সে।

ভজন দাস বাধা দেয়—ওখানে যাসনি রাধা!

রাধা বলে—যেতেই হবে বাবা। আমাকেও আজ সব ফিরে পেতে হবে। তাই যেতেই হবে ওখানে।

এ যেন অন্য একটি মেয়ে। জীবনের কোমল সুরকে ও তীব্র মধ্যমের উদাত্ত ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করতে চায়। ওই রোদের মধ্যেই এগিয়ে চলেছে রাধা জনতার মাঝে।

অবাক হয়ে দেখছে রাধা ওই মানুষগুলোকে; নিরু এগিয়ে আসে ওকে দেখে—তুইও এসেছিস রাধা?

—এলাম! তা ওদের কোন খবর পেলে সদরে? রাধা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে। নিরু দেখছে শান্ত মেয়েটির মুখে ফুটে উঠেছে কি ব্যাকুলতা। রাধা আজ এসেছে এখানে সন্তোষের জন্যই। আজ তাকে নোতুন করে চিনেছে রাধা, তাকে আজ তার প্রয়োজন। সন্তোষকে ওই রূপেনদাকে যারা ভালোবাসে আজ তারাও রাধার আপনজন।

গর্জে ওঠে জনতা—ওদের মুক্তি চাই।

মাধববাবুর দেউড়িতে সেই চীৎকার কেঁপে কেঁপে ওঠে। মাধববাবু গর্জে ওঠে দোতলা থেকে—চলে যাও এখান থেকে!

শ্রীধর দাস ওকে টেনে নিয়ে যায় ভিতরে। সাবধান করে।

—ওখানে যাবেন না ছোটবাবু, ওরা ক্ষেপে রয়েছে। পুলিশে খবর গেছে। ওরা এসে পড়বে।

মাধববাবু গর্জন করে—আমিই এর বিহিত করবো। বাড়ি চড়াও হয়ে এসব করবে? দরকার হয় গুলি চালাবো।

লাবণ্য দেখেছে ব্যাপারটা। প্রথমদিন থেকেই সে মাধববাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। দেখেছে এদের অন্যায় জুলুম। এরা কোনদিনই বুঝতে চেষ্টা করেনি যে দিন বদলেছে, এবার তাদেরও রীতিনীতি বদলাতে হবে। আজ ওকে বন্দুক হাতে গজরাতে দেখে লাবণ্য এগিয়ে এসে বলে,

—বন্দুক রাখো! সাধ্য থাকে খালি হাতে ওদের সামনে গিয়ে হাত মেলাও, এসব জুলুম নোংরামি বন্ধ করো।

মাধববাবু চাইল লাবণ্যের ঘৃণাভরা কঠিন মুখের দিকে। লাবণ্য যেন চিরকালই বিদ্রোহ করে এসেছে, আজও লাবণ্য এসেছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে তাকে শাসাতে। মাধববাবু গর্জে ওঠে,

—এসব জুলুম সইতে হবে?

লাবণ্য জবাব দেয়—জুলুম ওদের উপর কম করেছো তোমরা? ওই দাসজী কি সন্তোষকে পুড়িয়ে মারতে যায় নি? কেন আগুন জ্বালিয়েছিলে? একবার আগুন জ্বললে সেই আগুন তোমার ঘরেও এসে লাগতে পারে ভাবোনি?

হঠাৎ চীৎকার শোনা যায়। নবীন ভটচায-গিরিধারী ছাদ থেকে নেমে এসে সুখবর দেয়—পুলিশ! পুলিশ এসে গেছে।

লাবণ্য অবাক হয়—পুলিশকেও ডেকেছো ওদের কথা পর্যন্ত না শুনে!

মাধববাবু বলে—এবার লাঠি চার্জ করুক, গুলি করুক ওরা ওই ডাকাত দলের উপর! দিন দুপুরে বাড়ি চড়াও হয়ে এসব করবে, তার বিচার হবে না? দাসজী, গিরিধারী! দারোয়ান পাইকদের বলো দেউড়ি খুলে বের হয়ে এবার সামনের লোকদিকে মেরে হঠিয়ে দিক।

গোলমাল হলে পুলিশ এবার বাকী কাজটুকু সেরে দেবে ! দারোয়ান—

লাবণ্য অবাক হয়। কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করে,

—না ! ওদের উপর কোন রকম জুলুম তুমি করবে না !

মাধরবাবু এবার পায়ের নীচেকার হারানো মাটি ফিরে পেয়েছেন। দাসজীও এমনি গণ্ডগোল একটা পাকাতে চায়। যাতে পুলিশও ঝাপিয়ে পড়বে ওই জনতার উপর। সেও ইশারা করে গিরিধারীকে।

লাবণ্য চীৎকার করে,

—না। তোমরা যাবে না। আমি বলছি থামো।

মাধববাবুর কঠিন স্বর ধ্বনিত হয়—না ! যা বললাম তাই করগে !

লাবণ্যের দুচোখ জ্বলে ওঠে। চোখের সামনে ফুটে ওঠে কদম ঠাকরুণ, রাধার মুখখানা, আরও অনেকের মুখ। ওরা আজ এসেছিল তাদের প্রতিবাদ জানাতে চিরন্তন কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। লাবণ্যও আজ এদের অন্যায়ের প্রতিবাদই করবে। সেও সহ্য করবে না এই পাশবিকতা।

নেমে যায় লাবণ্য। দাসজী অবাক হয়—ছোটরাণীমা !

লাবণ্য সেই ডাক আজ কানে তোলে না। ওই পরিচয়ও যেন তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেউড়িটা খুলে যায়, লাফিয়ে পড়ে লাঠি হাতে গিরিধারী আর মাধববাবুর দারোয়ান পাইকের দল নিরস্ত্র জনতার উপর, আর্তনাদ কোলাহল ওঠে। চঞ্চল, মারমুখী হয়ে ওঠে জনতা। সারা মাঠের বুকে যেন তাণ্ডব নেমেছে। পুলিশ বাহিনী এবার শান্তিভঙ্গ হতে দেখে লাঠি চার্জ শুরু করেছে।

দেউড়ির চাতালে দেখা যায় লাবণ্যকে ! সেও এসে মিশেছে ওই জনতার মাঝে। পরনে গরদের লাল পাড় শাড়ি, পিঠ ঝাপানো চুল, কপালে সিন্দুরের রক্ত রাগ।

—থামো ! থামো তোমরা ! একি করছো ? লাঠি নামাও।

ওর চীৎকার ছড়িয়ে পড়ে আকাশ বাতাসে। দারোয়ানের দল রাণীমাকে দেখে হতচকিত অবস্থায় লাঠি নামিয়েছে। চমকে ওঠেন ব্রজদুলালবাবু, তিনিও এসে পড়েন।

—বৌমা ! তুমি ! এখানে !

লাবণ্য নেমে আসে—হ্যাঁ। আজ এই বাড়ির বিরুদ্ধে আমার নালিশ জানাতেই এদের সামিল হয়েছি। দরকার হয় আমিও মাথা পেতে দেব ওদের লাঠির সামনে।

পুলিশ অফিসারও এগিয়ে আসেন। লাবণ্য ওই গিরিধারীর দল আর দারোয়ানদের দেখিয়ে বলে—এদেরই এ্যারেষ্ট করুন। কেন লাঠি চালালো এরা ? রাধা !···

এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়েছে দুচার জন আহত হয়ে।

রাধাও ছিটকে পড়েছে। জনতা কলরব করে,

—এর বিহিত হবে না ? কেনে মারবে ওরা ?

ভজন দাস এগিয়ে আসে। কলরব থেমে যায় হঠাৎ। রূপেন সন্তোষের দল ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরছে। দূরে থেকেই কলরব আর্তনাদ আর ওই জনতাকে দেখে চমকে ওঠে !

দৌড়ে আসছে পুলিশ লোকজনের ভিড় দেখে।

সন্তোষও এসে পড়েছে। তাদের মুক্তির জন্য এই জনতাকে সংযত করার জন্যই চীৎকার করে রূপেন। সন্তোষও ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে আহত রাধাকে দেখে চমকে ওঠে।

আজ রাধাও তাদের জন্য এগিয়ে এসেছে, নিজের রক্ত দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেনি। এ যেন নোতুন একটি মেয়ে, দৃপ্ত কঠিন ভাস্বর। এমনি ভাবেই রাধাকে পাশে চেয়েছিল সন্তোষ। আজ কোন বাধা কোন লজ্জা তার নেই রাধাকে স্বীকৃতি দিতে।

—রাধা !

সন্তোষ এগিয়ে এসে রাধার আহত দেহটাকে তুলে নেয়। রাধার কপালে রক্তের দাগ—ওর সিঁথি আজ কি নোতুন রক্তরাগে আরক্তিম হয়ে ওঠে।

চমকে ওঠে ভজন দাস। বৃদ্ধের জীর্ণ চোখের সামনে সন্তোষের বলিষ্ঠ মুখখানা ভেসে ওঠে। মনে পড়ে অতীতের সেই যুবকটির কথা। ভজনদাস ওকে চিনেছে। এতদিন যেন ওরই পথ চেয়ে ছিল সে।

—সন্তোষ! তুমি !

রাধার বেদনাবিধুর মুখে, ওর দুচোখে কি শান্ত তৃপ্ত চাহনি ফুটে ওঠে। নিজের এই রক্তমূল্যে অনেক ত্যাগে সে আজ ফিরে পেয়েছে তার অধিকার !

···লাবণ্যও অবাক হয়।

রূপেন জানায়—শম্ভু কোর্টে নিজের দোষ স্বীকার করেছে। বিচারে তারই সাজা হয়ে গেছে। তোমরা শান্ত হয়ে যে যার কাজে যাও !

জয়ধ্বনি ওঠে। জনতা কি প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ে।

মাধববাবু দেখেছে লাবণ্যের ওই ব্যবহার, রাগে ফুলে উঠেছে সে। তারপরই ওই শম্ভুর মামলার পরিণতি শুনে গর্জে ওঠে।
—বেইমানের দল।

দাসজীও ভয় পেয়ে গেছে। পুলিশের কাছে যদি তার নামও বলে দেয়, দাসজীও ফেঁসে যাবে আগুন দেওয়ার ব্যাপারে। ভীত কণ্ঠে দাসজী বলে—শুনলেন ছোটবাবু, ব্যাটা শম্ভু নাকি সব বলে দিয়েছে। এবার তাহলে—

ক্ষুব্ধ মাধববাবু গর্জে ওঠে—যা হয় হোক্ গে। আমি এ সবে নেই। কে করতে বলেছিল এসব কাজ ! যাও তোমরা—

মাধববাবুও যেন ক্ষেপে গেছে। শ্রীধর দাস, নবীন ভটচায, গুপীনাথের দল চুপ করে থাকে। আজ ওদের শক্ত দুর্গে সত্যিই অদৃশ্য একটা ফাটল ধরেছে। ওরা যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

দাসজী চোরের মত বের হয়ে এল, পিছনে পিছনে আসছে নবীন ভটচায, গুপীনাথ।

উল্লসিত জনতা সরে গেছে এখান থেকে। আবার ওদিকে সমবায়ের বিস্তীর্ণ মাঠে তারা কাজে নেমেছে। পাম্প সচল হয়েছে, পাওয়ার টিলার-এ চাষ চলছে। ওদিকের ক্ষেতগুলোয় এসেছে জয়া পদ্মা ধানে সবুজ হলুদ রং, মঞ্জরীর ভারে নুইয়ে পড়েছে ধান গাছগুলো। এদিকে অন্য চাষ চলেছে।

তার পাশেই পড়ে আছে নবীন ভটচায-গুপীনাথ-এককড়ি দে মায় দাসজীর বিস্তীর্ণ জমি। কোথাও কোথাও বালি উঠেছে, বাকী সবত্র বালির উষর রুক্ষতা। চাষবাস হয় নি।

নবীন ভটচায অনেক আশা নিয়েই বড় গাছে ভেলা বেঁধেছিল, গুপীনাথও যায় নি সমবায়ে। তার জমিগুলোর বুকে বালির এবড়ো খেবড়ো স্তূপ, কাশবন গজিয়েছে। নবীন ভটচায বলে,

—কি হবে দাসজী, বলেছিলেন জমিগুলোর বালি উঠবে, চাষবাষ হবে।

গুপীনাথেরও সেই অনুযোগ। সে বলে,

—কিছুই তো হল নাই গ! অনাবাদী পড়ে রইল। ইবার যা হয় করেন। বাইরের লোকজনকে বল্লাম—তা ওরা বলে সমবায়ের কাজ করে যদি সময় পায় আসবেক। কি হবে তাহলে?

দাসজীর সামনে আজ নানা সমস্যা। সে বুঝেছে এবার আর সেই দর্প, প্রতিষ্ঠা নিয়ে এখানে চলা যাবে না। ওদের সব অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর সেই মানুষগুলোকে আজ দাসজীও ভয় করে। মনে হয় নিদারুণ ভাবে হেরে গেছে সে। দাসজী ওদের কথায় জানায় কঠিন স্বরে।

—যা ভালো বুঝিস কর গে, আমাকে এসব বলা কেন? আমি কি আটকে রেখেছিলাম কাউকে?

—দাসজী! নবীন ভটচায অবাক হয় ওর ওই কথা শুনে। লোকটা যেন একদিনেই বদলে গেছে।

দাসজী হন হন্ করে এগিয়ে চলেছে নিজের বাড়ির দিকে। এদের ডাকে সাড়া দেবার, ফিরে চাইবারও কোন দরকার বোধ করে না।

রোদপোড়া নিঃস্বতাব মাঝে দাঁড়িয়ে আছে নবীন ভটচায, গুপীনাথরা। সামনে কোন পথই নেই। বালিয়াড়ি ঢাকা মাঠগুলোব পাশেই ওদিকে সবুজ সোনা ফসলের ক্ষেত।

গুপীনাথ গর্জে ওঠে—দেখলা ভটচায। শালো চীধর দাসের রকমটা দেখলা?

নবীন ভটচাযও আজ সিদ্ধান্ত নেয়।

—রূপেনের কাছেই চল হে গুপী, বাঁচার পথ এবার নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে।

অসহায় মানুষগুলো ওই রোদের মাঝে নিঃস্ব বালুচরে দাঁড়িয়ে আজ নোতুন করে ভাবছে, চিনেছে ওই লোভী মানুষগুলোকে।

অজয়ের বালুচবে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। বালুচর ভরে গেছে সেই রূপালী ধাবায়, ঘুম নেমেছে ওপারের শালবনে। রূপেন রাধাকে দেখতে এসেছে। এখন সুস্থ আছে অনেকটা। রূপেন বলে,

—চলি সন্তোষ! কাল দেখা হবে।

রাধা শোনায়—কাল আসবে কিন্তু দাদা।

বের হয়ে এল রূপেন।

আজ রাধার দুচোখে কি তৃপ্তির আবেশ জানে! সন্তোষও সেই শান্ত অপরূপ জগতে আজ আশ্রয় ফিরে পেয়েছে, পেয়েছে একটি মনের নিবিড় সান্নিধ্য, বাঁচার আশ্বাস।

বাঁধের উপর আনন্দ লহরীর সুর শুনে চাইল। এগিয়ে আসছে কানাই বাউল।

—কে গ? রূপুদা না?

রূপেন এগিয়ে যায়—ঘরে ফিরলে কানাইদা!

ঘর বলতে নুইয়ে পড়া ঝুপড়ি, আর গাছতলা। গাছের ছায়া অন্ধকারে চলেছে চাঁদের আলোর জাল বোনা। কানাই বাউলের মুখে চোখে তৃপ্তির আস্বাদ। বলে সে,

—ই যে বাহারের কাজ করেছো গ! ভন্নি খরায় সবুজে সবুজ! সোনায় সোনা! বন্যা-হাহাকার ছাপিয়ে কি নোতুন সুর এনেছো গ! ঘর পালানো লুকটাকে ঘরের মায়ায় বেঁধে ফেললে রূপুদা।

রূপেন দেখছে ওকে। ও যেন কি তৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফিরছে।

এমনি স্তব্ধ রাত্রি গভীরে মনে পড়ে রূপেনের আর একজনের কথা। এই পূর্ণতার দিনে ধীরা নেই, সে কোথায় হারিয়ে গেছে। হার মেনে সরে গেছে দ্বিজেনও।

নিঃসঙ্গ রূপেন এগিয়ে চলে বন্ধুর পথ দিয়ে। এ চলার যেন শেষ নেই, বাঁধের উপর দিয়ে চলেছে নিঃসঙ্গ এক পদাতিক, কোন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পথের সন্ধানে, যেখানে মানুষ সুখে বাঁচবে, ঘর বাঁধবে!

———